কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ইসলামী আকীদা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
وأستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش.

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রকাশ কাল : যুলহাজ্জা ১৪২৮ হি, ডিসেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী

হাদিয়া
২৮০ (দুই শত আশি) টাকা মাত্র।

Qur'an-Sunnaher Aloke Islami Aqida (**The Islamic Creed in the Light of the Qur'an and Sunnah**) by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. December 2007.

Price TK 280.00 only.

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয় এবং তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত ও সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান।

বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের মুসলিমদের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে:

প্রথমত, বাংলার মুসলিমগণ ভক্তিপ্রবণ। তাঁরা তাঁদের ধর্ম ইসলামকে খুবই ভালবাসেন। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ) প্রতি তাঁদের ভক্তি খুবই বেশী। তাঁরা সাধারণত ইসলামী আচরণকে মেনে চলতে আগ্রহী।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা সরলপ্রাণ। সাধারণত ইসলামের নামে বা ধর্মের নামে যা বলা হয় তাঁরা সহজেই তা মেনে নেন।

তৃতীয়ত, তারা ভদ্র ও বিনয়ী। কোন বিষয়ে সত্য অবগত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা তা মেনে নেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করেন। অন্যান্য অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতে নিজের ভুল বুঝার পরেও তা আকড়ে ধরার বা তার পক্ষে ওকালতি করার চেষ্টা করেন না।

বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে দাও'আতী কর্মে লিপ্ত বিদেশী সমাজকর্মীরা বাংলার মুসলমানদের এসকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানের বিধিবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন না। অনেক ধর্মভীরু মুসলিমকে ঈমানের আরকান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তিনি ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। রিয়াদে অবস্থানকালে আমি একটি ইসলামী কেন্দ্রে কর্মরত ছিলাম। এ কেন্দ্রে ফরাসী, আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফিলিপিনো, ভারতীয়, শ্রীলংকান, কানাডিয়ান ও অন্যান্য দেশের অনেক অমুসলিম পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন। আমরা প্রথমেই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করতে চান? ইসলাম সম্পর্কে তাঁরা কি জেনেছেন? আমরা তাদেরকে ইসলামী ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ কী? খৃস্টানদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস, পৌত্তলিকদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস এবং মুসলিমদের এক আল্লাহয় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ঈমানের আরকান কি কি? কিসে ঈমান বাতিল হয়? শির্‌ক কাকে বলে? কুফ্‌র কাকে বলে? ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য কি? ইত্যাদি।

তাঁদের মধ্য থেকে অনেকেই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। কারণ সাধারণত তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করার পরেই ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন। যারা এসকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না তাদের আমরা আগে এসকল বিষয় শিক্ষা দিতাম, এরপর তাদের কালিমা পড়ানো হতো। কারণ এ সকল বিষয় না জেনে কালিমা পড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। হয়ত কালিমা পাঠের পরেও এমন কিছু বিশ্বাস তার মধ্যে থেকে যাবে যা এ কালেমার পরিপন্থী অথবা হয়ত কালিমা পাঠের পরেই এমন কিছু কাজ তিনি করবেন যাতে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন মুসলিমদের যখন এসকল বিষয় শেখানো হতো তখন ভাবতাম বাংলাদেশের অনেক ধার্মিক মুসলিমও এসকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না। এর দুঃখজনক পরিণতি হলো তাঁরা প্রতিনিয়ত এমন সব ধারণা, বিশ্বাস বা কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন যা তাদের ঈমানকে নষ্ট বা দুর্বল করে দিচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? যেখানে ঈমানই মূল সেখানে ঈমান সম্পর্কে না জেনে বা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কিভাবে আমরা মুসলমান হতে পারি?

আমার মনে হয়, যে কোন বিবেকবান পাঠক অনুধাবন করবেন যে, আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করা উচিৎ। আমাদের উচিৎ আমাদের দীনের মূল কি তা ভালভাবে জানা। কিসে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে, কিসে ঈমান নষ্ট হবে তা আমাদের জানা উচিৎ।

আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তান সন্ততির দৈহিক সুস্থতার জন্য সচেষ্ট। এক্ষেত্রে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি লোকাচারের উপর নির্ভর করবেন না। বরং কোন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে অথবা এ বিষয়ে সুপরিচিত বিশেষজ্ঞদের লেখা ভাল ও তথ্য নির্ভর বই-পুস্তক-পত্রিকা পড়ে তাঁর স্বাস্থের জন্য সর্বোত্তম নিয়ম জানার ও পালন করার চেষ্টা করবেন। কখনই তিনি অল্প শিক্ষিত বা হাতুড়ে কবিরাজের কথামত নিজেকে পরিচালিত করবেন না।

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই না জেনে বুঝে কোন কাজ করবেন না। তিনি কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের আগে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যে, তার

মূলধন সেখানে নিরাপদ থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে। কারো সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কখনই তিনি কারো হাতে তার অর্থসম্পদ তুলে দেবেন না, যত লাভের লোভই সে দেখাক না কেন। উপরন্তু এরূপ সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষও কোনোভাবে যেন সম্পদ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের শর্ত তিনি আরোপ করবেন এবং মাঝে মাঝেই সম্পদের হিসাব নিবেন।

নিঃসন্দেহে আমাদের সুস্থতা, আমাদের সন্তান-সন্ততির সুস্থতা এবং আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন আমাদের বড় দায়িত্ব এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের ঈমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উন্নয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ঈমান আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, যার উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করছে। ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চূড়ান্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হব। এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের কিছু চেষ্টা করা উচিত নয়? এজন্য কি সামান্য কিছু সময় ব্যয় করা উচিত নয়?

সম্ভবত আমরা অনুভব করছি যে, ঈমানের জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ অনুভবের ভিত্তিতেই এ বই লেখা। বাংলার সরলপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ মুসলিম সমাজের কেউই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা ঈমান সম্পর্কে জানতে অনিচ্ছুক নন। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাদের অনেকের অজ্ঞতা বা জানার কমতির কারণ সম্ভবত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বই এর অভাব। বিভিন্ন বইয়ে ঈমানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের জন্য কর্মজীবনের বাস্তবতার মাঝে বিভিন্ন বইপত্র বিস্তারিত পড়ার সময় হয়ে ওঠে না। ফলে এমন একটি বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করলাম যাতে ইসলামী ঈমান-আকীদার সকল দিক খুটিনাটি আলোচনা করা হবে। এ গ্রন্থে এ প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছি।

১৯৯৮ সালে সৌদি আরবের লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরার পরে আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ) আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাওহীদ, শিরক, জাল হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ-আলোচনা করতে এবং বই-পুস্তক রচনা করতে। তাঁরই উৎসাহে ২০০০ সালে 'কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা' নামে বইটি প্রকাশ করি। তখন তাড়াহুড়া করে 'প্রথম খণ্ড' হিসেবে শুধু তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমান বিষয়ক অধ্যায়গুলি লিখেছিলাম। তখন চিন্তা ছিল 'দ্বিতীয় খণ্ডে' শিরক, কুফর, নিফাক, ফিরকা ইত্যাদি বিষয়ে লিখব। পরবর্তীতে আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হয় নি। এখন পুরো বইটি পুনরায় নতুন করে লিখে সকল বিষয় একত্রে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বইটির আলোচ্য বিষয় ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষাগুলির পরিচিতি, ইসলামী আকীদার গুরুত্ব, উৎস, ভিত্তি ও এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ, প্রকৃতি, শর্ত ও দায়িত্ববালি আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে আরকানুল ঈমানের অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক, কুফর, নিফাক, এগুলির প্রকারভেদ, কারণ, প্রেক্ষাপট, মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী আকীদার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উদ্ভাবিত বিদ'আত ও বিদ'আত ভিত্তিক ফিরকা, দল, উপদল ও আহলুস সুন্নাত ও জামা'আতের পরিচিত ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছি।

উম্মাতের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসগুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলিমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত প্রসিদ্ধ চার ইমামের লেখা পুস্তকাদি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদা এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে- হিজরী ৭ম শতকের পরের- আলিমদের লেখালেখি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আবার এক্ষেত্রে ৭ম শতকের আকীদার সাথে ১৩শ শতকের আকীদার অনেক পার্থক্য, বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সকলেই কুরআন ও হাদীসের 'দলীল' প্রদান করেন। তবে প্রথম ব্যক্তি কুরআন, হাদীস ও প্রথম যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের কথা গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন।

পুরাতন ও নতুনের এ মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা কখনোই গোপন করি না। মানবতার মুক্তির নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে। তাঁর এ নূরে পরিপূর্ণ আলোকিত হয়েছেন সাহাবীগণ। পরবর্তী দু শতাব্দীর মানুষেরা তাঁদের নূর ভালভাবে পেয়েছিলেন। সত্য ও মুক্তি তো পুরাতন সে যুগের পুরাতন মানুষদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। মতভেদীয় বিষয়ে সকল পক্ষের মতই পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পড়তে চেষ্টা করেছি। তবে যারা মূলতই পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা, তাফসীর বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন নি তাঁদের মতামত গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও।

আমাদের বিশ্বাস যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুমিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ। প্রথম তিন মুবারক যুগে বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের যুগে যে সকল হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন সেগুলির উপরেই নির্ভর করতে হবে। পরবর্তী যুগে সংকলিত অপ্রসিদ্ধ, গরীব, যয়ীফ ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা বর্জন করতে হবে। এগুলিকে ফযীলতের বিষয়ে কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি আকীদার উৎস নয়। কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা

ও আকীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা। সহীহ্ সনদে তাঁদের থেকে এ সকল বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তাঁরা যা বলেন নি তা বর্জন করতে হবে।

এজন্য এ বইয়ের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম ও সহীহ্ হাদীস। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সাহাবী, তাবিয়ী ও ঈমামগণের মতামতের উপরে নির্ভর করেছি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য মূলত সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমগণের প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামত এবং চার ইমামের লিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করেছি। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর লেখা 'আল-ফিকহুল আকবার' এবং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবী (রাহ)–এর লেখা 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামক পুস্তকের উপর নির্ভর করেছি।

মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকই আমাদের একমাত্র সম্বল। এ বই লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহর দরবারে কাতর আকুতি জানিয়েছি, যেন তিনি দয়া করে সঠিকভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বুঝার ও বুঝানোর তাওফিক দান করেন। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সঠিক ও সজহবোধ্য আলোচনার। কিন্তু যে কোন মানবীয় কর্মে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আর আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির ভুল ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পরস্পরে নসীহতই দ্বীন।" তাই আমরা একান্তভাবে আশা করব যে, কোনো পাঠক এ বইয়ে কোনো প্রকার ভাষাগত, তথ্যগত বা মতামতের ভুল দেখতে পেলে যেন অনুগ্রহ পূর্বক তা লেখককে বা প্রকাশককে জানান। আমরা আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এবং ভুল সংশোধনে আগ্রহী। এ বইয়ের কোনো বিষয়ে আপনি দ্বিমত পোষণ করলে আমাদেরকে জানান। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের মতের ভুল ধরা পড়লে আমরা তা তাৎক্ষণিক ভাবে স্বীকার করে নেব। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভুল করা স্বাভাবিক, তবে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা অন্যায়। আমরা এরূপ অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আগেই বলেছি, আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার সিদ্দীকী (রাহ)-এর উৎসাহে ও প্রেরণায় এ বই লিখতে শুরু করেছিলাম। আমার সকল লেখালেখির জন্য প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন তিনি। কোনো মানুষের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র মহান আল্লহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে সত্যকে গ্রহণ ও বলার ক্ষেত্রে আপোষহীন হতে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মহান রব্বের ডাকে সাড়া দিয়ে গত বছর এ সময়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন, রহমত করেন, আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন, ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে তাঁকে কবুল করেন এবং তাঁর সন্ত ানগণসহ আমাদের সকলকে তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন।

দু'আ করি, মহান আল্লাহ দয়া করে এ বইটি কবুল করেন, একে লেখকের, তার পিতামাতা ও পরিবারের, পাঠকদের এবং সকল শুভাকাঙ্খীর নাজাতের ওসিলা করে দেন। সকল প্রশংসা তাঁরই। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও অনুসারীগণের জন্য।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছেঃ

১. A Woman From Desert
২. এহইয়াউস সুনান : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. রাহে বেলায়াত : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৪. মুসলমানী নেসাব : আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৫. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৬. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৭. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
১০. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
১২. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৩. **بحوث في علوم الحديث** (বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস)
১৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৫. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৬. ইযহারুল হক্ক (রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৭. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৮. আল-ফিকহুল আকবার (ইমাম আবু হানীফা রচিত): বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৯. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪।

২. আলহাজ্জ মাওলানা মো. ইদ্রিস আলী, মুহতামিম, জামিয়াতুল কুরআনিল কারীম, দারুশ শারীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা। মোবাইল নং ০১৭১৭১৫৩৯২৩।

৩. মাওলানা আ. স. ম. শোয়াইব আহমদ, পেশ ইমাম ও খতীব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩। ফোন ৬২২০১-এক্স: ২৪৩১; মোবাইল, ০১৯৩৯১৮৩২৮।

৩. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন নং ০২-৯০০৯৭৩৮

প্রথম অধ্যায়
পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব

১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: 'ঈমান' ও 'আকীদা'। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। 'আকীদা' বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে 'ধর্ম-বিশ্বাস' বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সহজ, সরল, যৌক্তিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা জানি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি 'গাইব' বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর। স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ফিরিশতা, সৃষ্টিজগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারে স্রষ্টার কর্ম, পরকালীন জীবন, ইত্যাদি সবই মূলত অদৃশ্য বিষয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক এগুলির বাস্তবতা ও সাম্ভ্যবতা অনুভব ও স্বীকার করে। কিন্তু এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। মানুষ বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, পরিধি, গুণাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিতর্ক করা সম্ভব, তবে কোনো সুনির্ধারিত ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় না। এজন্যই মূলত বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর উপরে নির্ভর করতে হয়।

ইসলামের বিশ্বাস বিষয়ক নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ছিল যে, কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এ বিষয়ে যা কিছু তাঁরা শুনেছেন বা জেনেছেন, সেগুলিকে বিনা বাক্যে ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছেন। এগুলির বিষয়ে অকারণ যুক্তিতর্কের আরোপ করেন নি।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য 'ঈমান' ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'আল-আকীদাহ' ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে 'আকীদাহ' পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও 'আকীদা' (عقيدة) শব্দটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। নিম্নে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা করব:

১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম

আরবী 'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আম্‌ন (أمن) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: "হামযা, মীম ও নূন: এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ: বিশস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।"[১]

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।[২]

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বিশ্বাস অর্থে কুরআন ও হাদীসে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস করল' অর্থে 'আ-মানা, আমানূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, 'বিশ্বাস কর' অর্থে তু'মিনু, নু'মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে 'আ-মিন, আ-মিনূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে মুমিন, মুমিনূন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ

"আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল... ।"[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি: 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর'; সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।"[৫]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[৬]

আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ....

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে 'একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের' নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর অবগত আছেন। তিনি বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে,) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ (ইবাদত যোগ্য বা উপাস্য) কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল...।"[৭]

হাদীস শরীফে সর্বদা 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رجل (جِبْرِيلُ) فَقَالَ: يا رسول الله، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ، وتؤمن بالقدر كله. قَالَ: مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"একদিন নবী (ﷺ) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি (জিবরাঈল আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন: (ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে। তিনি প্রশ্ন করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক বানাবে না, সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাদানের সিয়াম পালন করবে।"[৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিত প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবী 'সালাম' (سـلم) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আভিধানিক ভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون بالأعمال. والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالي. فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام. ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع علي الإيمان والإسلام والشرائع كلها

"ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়

না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায়। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয়।"[৯]

বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনায় আমরা দেখব যে, ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ছিল বিভক্তির কারণগুলির অন্যতম। খারিজীগণ ও তাদের সমমনা ফিরকাগুলি আমল বা ইসলামের বিধান মত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেছে। ফলে বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের মতে ঈমানের বিচ্যুতি বা কুফর বলে গণ্য। অপরদিকে মুরজিয়াগণ ঈমানকে আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধিবিধান পালন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদের মতে কোনোরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব। তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। উভয় মতের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নন, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেন নি। তবে এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ইমামগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে।

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমামের মতে আমল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের দাবি ও সম্পূরক। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশি কম হয় না বা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

(২) অন্য তিন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস বা মুখের স্বীকৃতির মত অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও কমতি প্রমাণিত হয়। তাঁর বলেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম। এদের মতে কর্মের কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এ দু মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতের অনুসারিগণই একমত যে,

(১) ঈমান ও আমল দুটিই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে। ঈমান বিহীন ইসলাম বা ইসলাম বিহীন ঈমান অকল্পনীয়।

(২) কর্মের ত্রুটির কারণে বা কবীরা গোনাহের কারণে বান্দা কাফির হয় না, তবে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে।

১. ১. ২. আল-ফিকহুল আকবার

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকীদা' বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।

'ফিক্হ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে 'ফিকহ' বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশ্বাসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতেই সম্ভবত তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'আকবার' বা 'শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান' বা 'মহোত্তর জ্ঞান' বলে অভিহিত করেন।

১. ১. ৩. ইলমুত তাওহীদ

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় 'তাওহীদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ' বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'ইলমুল আকীদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ইলমুল আকীদা বুঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে। এ নামে আকীদা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ'।

১. ১. ৪. আস-সুন্নাহ

তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ বুঝাতে 'আস-সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থঃ মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।[১০] ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম (ﷺ) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।[১১] সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। বিদগ্ধ পাঠককে গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি,

তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলমান। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলিম 'আস-সুন্নাহ' নামে 'আকীদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তিনি 'আস-সুন্নাহ' নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। একই নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর প্রসদ্ধি ছাত্র ইমাম আবূ বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানি আল-আসরাম (২৭৩হি), ইমাম আবূ আলী হাম্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাম্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি), ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস'আস আস-সিজিসতানী (২৭৫ হি), ইমাম আবূ বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহ্হাক আশ-শাইবানী (২৮৭ হি), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৯০ হি), ইমাম আবূ বাক্র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারূন আল-বাগদাদী আল-খাল্লাল (৩১১ হি), ইমাম আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১১ হি), ইমাম তাবারানী আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), ইমাম আবূশ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফার ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি), ইমাম ইবনু শাহীন আবূ হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি), ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি) ও আরো অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

১. ১. ৫. আশ-শারী'আহ

'শারীয়াত' বা 'শারী'আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শরী'আহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ "ধর্ম বিশ্বাস" বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ।[১২] তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম "আশ-শারী'আহ" নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন ইমাম আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্রী (৩৬০ হি) রচিত "আশ-শরী'আহ" গ্রন্থ।

১. ১. ৬. উসূলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ

উসূলুদ্দীন (**أصول الدين**) বা উসূলুদ্দীয়ানাহ (**أصـــول الديانـــة**) অর্থ দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলিম 'ঈমান' বা আকীদা বুঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাঈল আল-আশ'আরী (৩২৪ হি)। 'আল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাহ' নামে এ বিষয়ক তাঁর গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ।

১. ১. ৭. আকীদা

ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ তত প্রসিদ্ধ নয়। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী 'আক্দ (**عقـــد**) ধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: "আইন, ক্বাফ ও দাল: ধাতুটির মূল অর্থ একটিই: দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।[১৩]

'ধর্মবিশ্বাস' বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে বা তাঁর পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় 'বিশ্বাস' অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে 'দৃঢ় হওয়া' বা 'জমাট হওয়া' অর্থে 'ই'তিকাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অন্তরের বিশ্বাস অর্থেও 'ইতিকাদ' শব্দটির প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন:

اعتقد ضيعة ومالا، أي اقتناها، واعتقد الشيء: صلب واشتد، واعتقد كذا بقلبه، وليس له معقود، أي عقد رأي.

"সম্পত্তি বা সম্পদ 'ই'তিকাদ' করেছে, অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সঞ্চয় করেছে। কোনো কিছু 'ই'তিকাদ' হয়েছে অর্থ তা শক্ত, কঠিন বা জমাটবদ্ধ হয়েছে। অন্তর দিয়ে অমুক বিষয় ই'তিকাদ করেছে। তার কোনো মা'কুদ নেই, অর্থাৎ তার মতামতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই।"[১৪]

কুরআন-হাদীসে কোথাও আকীদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। 'ইতিকাদ' শব্দটি দু একটি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে 'বিশ্বাস' অর্থে নয়, বরং সম্পদ, পতাকা ইত্যাদি দ্রব্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, বন্ধন করা বা গ্রহণ করা অর্থে। যেমন এক হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন,

لَقِيْتُ عَمِّيْ رضي الله عنه وقد اعْتَقَدَ رَايَةً

"আমার চাচার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হলো তখন তিনি (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে) একটি ঝাণ্ডা দৃঢ়ভাবে ধারণ

করেছেন।"[১৫]

দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলিমের কথায় 'ই'তিকাদ' বা 'আকীদা' শব্দ সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়।[১৬] পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত প্রাচীন আরবী অভিধানগুলিতে 'আকীদা' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখতে পাই নি। 'আক্দ' ধাতু থেকে গৃহীত আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বিশেষ্য শব্দ এ সকল অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'ইক্দ' (**عِقْـدٌ**), 'উকদাহ' (**عُقْدَةٌ**), 'উকাইদাহ' (**عُقَيْـدَةٌ**), 'আকীদ' (**عَقِيْـد**) ইত্যাদি। কিন্তু 'আকীদাহ' শব্দটি এ সকল অভিধানে দেখতে পাই নি। ইবনু দুরাইদের (৩৩১ হি) জামহারাতুল লুগাহ, জাওহারীর (৩৯৩হি) আস-সিহাহ, ইবনু ফারিসের (৩৯৫হি) মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ, ইবনু মানযূরের (৭১১ হি) লিসানুল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে 'আকীদাহ' শব্দটির উল্লেখ পাই নি। পরবর্তী সময়ের অভিধানবিদগণ এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী (৭৭০হি) তাঁর আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন:

العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك

"মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে 'আকীদা' বলা হয়। বলা হয় 'তার ভাল আকীদা আছে', অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।"[১৭]

আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইবরাহীম আনীস ও তাঁর সঙ্গিগণ সম্পাদিত 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "

العقيدة: الحكم الذي لا يُقْبَلُ الشكُّ فيه لدى معتقده، و(في الدين) ما يقصد به الاعتقاد دون العمل

"আকীদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না .... ধর্মীয় বিশ্বাস যা কর্ম থেকে পৃথক... ।"[১৮]

১. ১. ৮. ইলমুল কালাম

ইসলামী আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' (**علم الكــلام**) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়।

'আল-কালাম' (**الكــلام**) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (**كلام الله**) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে যতটুকু বুঝা যায় গ্রীক লগস (logos) শব্দ থেকে 'কালাম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। এ লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা। সম্ভবত মূল গ্রীক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরবী পণ্ডিতগণ লজিক অর্থ ইলমুল কালাম বা 'কথা-শাস্ত্র' বলেছিলেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে 'ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 'কথা-শাস্ত্র'।

সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুভব করতে পারে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সাহাবীগণের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ ঈমান বা আকীদার বিষয়ে বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ। প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।[১৯] যেমন ইমাম আবূ ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের পণ্ডিত ও মু'তাযিলী আলিম বিশ্‌র আল-মারীসীকে বলেন:

العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل: زنديق.

"কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে।"[২০]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন:

من طلب العلم بالكلام تزندق

"যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীক পরিণত হবে।"[২১]

ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন,

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتـاب والسنة وأقبل على الكلام.

"যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।"[২২]

৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে আহলুস সুন্নাতের কোনোকোনো আলিম ইসলামী আকীদা বা আলহুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যাবহার করেছেন এবং আকীদা শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের একান্ত প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩]

১. ২. ইসলামী আকীদার উৎস

১. ২. ১. বিশ্বাস বনাম জ্ঞান

বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি হলো জ্ঞান। কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে জানতে হবে। বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতে মানবীয় সফলতার মূল চাবিকাঠি সেহেতু ঈমান বিষক জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

"অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই।"[২৪]

বিশুদ্ধ ঈমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ঈমান-আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর পুস্তকটির নামকরণ করেন 'আল-ফিকহুল আকবার', অর্থাৎ "সর্বোত্তম বা মহোত্তম ফিকহ্"।

১. ২. ২. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, দর্শন, ল্যাবরেটরির গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈমান, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী?

আমরা জানি যে, ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ। সকল যুগের মানব সমাজের ইতিহাস ও সভ্যতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল যুগে সকল দেশে সকল জাতির ও সমাজের প্রায় সকল মানুষই এ বিশ্বাস করেছেন বা করেন যে, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান বিশ্বের শতশত কোটি মানুষের মধ্যেও অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন না। এর মূলত দুটো কারণ রয়েছে:

প্রথমত: স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অনুভুতি। আত্মপ্রেম, পিতামাতা বা সন্তানের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদির মত স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে। মহান স্রষ্টা এই বিশ্বাসের অনুভুতি দিয়েই প্রতিটি মানব আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বাস বিকৃত হতে পারে, একে অবদমিত করা যায়, তবে একে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তাই যারা নিজেদেকে স্রষ্টায় বিশ্বাসী নন বলে মনে করেন তাঁরাও মূলত মনের গভীরতম স্থান থেকে বিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারেন নি, যদিও তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন অবিশ্বাস করার।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও জানার নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে। তাই সৃষ্টির রহস্য ও সক্ষতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, স্রষ্টার মহত্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ততই গভীর হচেছ। সৃষ্টির রহস্য, জটিলতা, মানবদেহ, জীবজগত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি বিশাল সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব নিয়ে যারাই গবেষণা বা চিন্তাভাবনা করেছেন বা করছেন, তারাই স্রষ্টার মহত্বের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হচ্ছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সকল দেশের সকল মানুষ যখন স্রষ্টার বিশ্বাসে একমত, তাহলে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত মতবিরোধ কেন?

এর কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্বে মূলত মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হয়েছে স্রষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব, তাঁকে ডাকার বা তাঁর উপাসনা করার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে। প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্মগত অনুভূতি দিয়ে এবং সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তবে কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর প্রতি মনের আকুতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাহায্য, করুণা বা সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পারে না । এক্ষেত্রে যখনই মানুষ নিজের ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ করে, তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

এ জন্য মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না সে সকল বিষয় তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের (devine revelation/ inspiration) মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।

কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী রসুলদের উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত-আরাধনা করতে হবে, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কিরূপ হবে, মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন। এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী (revelation)। এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না।"[২৫]

ওহীর বিপরীতে ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষদের যুক্তি ও প্রমাণ ছিল সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ। এই প্রবণতাকে বিভিন্ন মানব সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে কুরআন কারীমে চিত্রিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সঠিক বিশ্বাস বা ইসলাম প্রচার করেন, তখন সেই জাতির অবিশ্বাসীরা নবী-রাসুলদের আহবান এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের প্রচারিত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী, তারা যুগ যুগ ধরে যা জেনে আসছেন মেনে আসছেন তার বিরোধী। নূহ (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন তার উম্মতকে ইসলামের পথে আহবান করলেন তখন তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ

"আমরা তো আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি।"[২৬]

মূসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহবান করেন তখন তারাও একই যুক্তিতে তার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে বলে:

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

"আমাদের পূর্ব পুরুষদের কালে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনি নি।"[২৭]

সকল যুগে অবিশ্বাসীরা এ যুক্তিতেই ওহী প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ বলেন:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ

"এবং এভাবে আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের সমৃদ্ধশালী (নেতৃপর্যায়ের) লোকেরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক

অনুসরণ করে চলেছি’।”[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা এই একই যুক্তিতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার তাদের এই যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯]

বস্তুত, তারা যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচারিত বিশ্বাস ও কর্ম ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তারা দাবি করতেন যে, ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবী ও নেককার মানুষদের থেকে পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পাওয়া তাদের বিশ্বাসই সঠিক। তাদের মতের বিরুদ্ধে ওহীর মতকে গ্রহণ করতে তারা রাজি ছিলেন না। আবার তাদের বিশ্বাসকে কোনো ওহীর সূত্র দ্বারা প্রমাণ করতেও রাজি ছিলেন না। বরং তাদের বিশ্বাস বা কর্ম ‘পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে নবী-রাসূল বা নেককার মানুষদের থেকে প্রাপ্ত’ একথাটিই ছিল তাদের চূড়ান্ত দলিল ও যুক্তি। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

“তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিশিতাগণকে নারী বলে গণ্য করেছে; তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা বলে, ‘দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা-উপাসনা করতাম না।’ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো কেবল আন্দায-অনুমান করে মিথ্যা বলছে। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? বরং তারা বলে, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুপথপ্রাপ্ত হব।”[৩০]

এখানে মক্কার মানুষদের দুটি বিশ্বাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত ফিরিশতাগণকে নারী বলে বিশ্বাস করা এবং দ্বিতীয়ত তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাস বিকৃত করে নিজেদের কর্মকে আল্লাহর পছন্দনীয় বলে দাবি করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না; কাজেই আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা ফিরিশতাদের পূজা করতাম না। অথবা আল্লাহর পবিত্র নগরীতে পবিত্র ঘরের মধ্যে আমরা ফিরিশতাদের উপাসনা করে থাকি। এ কর্ম যদি আল্লাহর পছন্দনীয় না হতো তবে তিনি অবশ্যই আমাদের শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যেহেতু আমাদেরকে শাস্তি দেন নি, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, এ কর্মে তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন।

তাদের এ বিশ্বাসের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। দেখে, প্রত্যক্ষ করে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। একমাত্র ওহী ছাড়া এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় তা আন্দায, মিথ্যা বা ওহীর বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। আর মক্কার মানুষদের এই বিশ্বাস দুটি প্রমাণের জন্য তারা পূর্বের কোনো আসমানী কিতাব বা ওহীর প্রমাণ দিতে অক্ষম ছিল। কারণ তাদের নিকট এরূপ কোনো গ্রন্থ ছিল না। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল দ্বিবিধ: প্রথমত, ওহীর জ্ঞানের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, পূর্বপুরুষদের দোহাই দেওয়া।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তারা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কোনো ওহীর বাণী এক্ষেত্রে পেশ করতে পারে না; বরং আন্দাযে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

দ্বিতীয় বিষয়টি কুরআনে বিভিন্ন ভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথমত, পূর্ব পুরুষদের অনেকেই সত্যিই নেককার ছিলেন বা নবী-রাসূল ছিলেন। তবে তাদের নামে যা প্রচলিত তা সঠিক কিনা তা যাচাই করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের দোহাই না দিয়ে সুস্পষ্ট ওহীর নির্দেশনা মত চলতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকূব (আ) ও অন্যান্য নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“সে সকল মানুষ অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করা তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।”[৩১]

অন্যান্য স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত ছিলেন। কাজেই ওহীর বিপরীতে এদের দোহাই দেওয়া বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

“যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, ‘না, না, বরং আমরা

আমাদের পিতা- পিতামহাদেরকে যে কর্ম ও বিশ্বাসের উপরে পেয়েছি তারই অনুসরণ করে চলব। এমনকি তাদের পিতা-পিতামহগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তার সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?"[৩২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন যে, পূর্বপুরুষগণ কেমন ছিলেন সে কথা নিয়ে বিতর্ক না করে মূল বিশ্বাস বা কর্ম নিয়ে চিন্তা কর। যদি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীর জ্ঞান প্রচলিত বিশ্বাস বা কর্মের চেয়ে উত্তম হয় তবে পিতৃপুরুষদের দোহায় দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করো না। মহান আল্লাহ বলেন:

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

"(সে নবী) বলেন, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে পথে পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' তারা বলে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'।"[৩৩]

ওহীর বিপরীতে অবিশ্বাসীদের এরূপ বিশ্বাসকে 'ধারণা' 'কল্পনা' বা 'আন্দায' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ

"যারা শিরক করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তিগণও অবিশ্বাস করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, তোমাদের নিকট কোনো 'ইলম' (জ্ঞান) আছে কি? থাকলে আমাদের নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান নির্ভর মিথ্যা কথাই বল।"[৩৪]

এখানেও তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাসকে বিকৃত করে তারা যা বলেছে তাকে 'আন্দায', 'ধারণা' বা 'কল্পনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে তাদের নিকট তাদের বিশ্বাসের ও দাবির স্বপক্ষে 'ইলম' বা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ওহীর বক্তব্য দাবি করা হয়েছে।

অন্য স্থানে বলা হয়েছে:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে; তারা কেবলমাত্র ধারণার অনুসরণ করে চলে এবং তার শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে।"[৩৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না।"[৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান (ইলম) নেই; তারা কেবল ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণা-অনুমানের কোনো মূল্য নেই।"[৩৭]

এছাড়া এরূপ বিশ্বাসকে 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বা নিজের মন-মর্জি বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমার কাছে পছন্দ কাজেই আমি এই মত গ্রহণ করলাম এবং আমার কাছে পছন্দ নয় কাজেই আমি এই মত গ্রহণ করলাম না। আমার পছন্দ বা অপছন্দ আমি 'ওহী' দ্বারা প্রমাণ করতে বাধ্য নই।

নিঃসন্দেহে, গাইব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় সবই ধারণা, অনুমান, আন্দায বা কল্পনা হতে বাধ্য। আর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিবেক ও যুক্তিগ্রাহ্য ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে এরূপ আন্দায বা ধারণাকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ

করা বা পুর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে ওহী অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা নিজের মর্জি বা 'প্রবৃত্তির' অনুসরণ বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথনির্দেশনা ছাড়া নিজের ইচ্ছা বা মতামতের অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কেউ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"[৩৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ

"তারা তো শুধুমাত্র অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।"[৩৯]

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০]

১. ২. ৩. তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ

বস্তুত আমরা একথা বলতে পারি না অমুক কর্ম সবাই করছে বা আমাদের সমাজে যুগ ধরে চালু আছে, কাজেই তা ঠিক এবং আমরা তা করব। কারণ কোনো কর্ম বা বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকা বা পিতা পিতামহদের যুগ থেকে অর্চিত হওয়া তার সঠিক হওয়ার বা নির্ভুল হওয়ার প্রমাণ নয়। সমাজের প্রচলিত কর্ম বা বিশ্বাস ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হবে জ্ঞানের মাধ্যমে।

যেমন মনে করুন কোনো সমাজে প্রচলিত আছে যে কারো জ্বর হলে অমুক গাছের রস বা ফল খেলে সুস্থ হয়ে যাবে। সেখানে এ কথাও প্রচলিত যে অমুক কর্ম করলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার বা বরকত দান করবেন বা সে মৃত্যুর পরে শান্তি পাবে।

সমাজে প্রচলিত থাকা এই ধারণা দুইটির সঠিকত্বের প্রমাণ নয়। এগুলো ঠিক না ভুল তা জানতে হলে আমাদের জ্ঞানের সন্ধান করতে হবে। আমাদের জ্ঞান দু প্রকারের: প্রথমত, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীলব্ধ জ্ঞান।

প্রথম ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি গাছের রস বা ফল খেলে জ্বর সেরে যাবে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদের ল্যাবরেটরীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এভাবে আমরা জানতে পারব যে, উপরোক্ত ধারণাটি সঠিক অথবা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি কর্মে আল্লাহ খুশি হবেন বা বরকত দান করবেন বা তাতে মৃত্যুর পরে শান্তি পাওয়া যাবে, এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে ওহীলব্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে; কারণ এই বিষয়টি আমাদের মানবীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে। এজন্য আমরা এক্ষেত্রে দেখব আল্লাহ বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিনা।

এ জন্য আমরা দেখি যে, বিভিন্ন যুগে ও জাতিতে যখন কাফিররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও বিশ্বাসকে সঠিক বলে দাবি করেছে, তখন তিনি তাদেরকে ওহীর জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন এবং ঈমানের ব্যাপারে ওহীর উপর নির্ভর না করার নিন্দা করেছেন।[৪১]

মক্কার কাফিরদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করলো এবং তাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার আচরণকে সঠিক বলে দাবি করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পক্ষে অহীলব্ধ জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানান। আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلا غُرُورًا

"বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।"[৪২]

এখানে কুরআন কারীমের প্রমাণপেশের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। এরপর তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা বলা হয়েছে।

সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈসা (আ), উযাইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল

(আ), অন্যান্য নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলীল কি? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। তাদের এ বিবেক ও যুক্তিবিরুদ্ধ কর্মের পক্ষে তারা দাবি করত যে, যাদেরকে তারা ইবাদত করে বা বিপদে আপদে যাদেরকে ডাকে তারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা আল্লাহর 'সন্তান', আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তাদের এ দাবি আংশিক সত্য ছিল। আমরা দেখেছি যে, এদের অনেকেই মূলত নবী, ফিরিশতা বা নেককার মানুষ ছিলেন। আর কিছু ছিল কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব। তবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া তো ইবাদত পাওয়ার বা ইলাহ হওয়ার কোনো প্রমাণ নয়। এজন্য মুশরিকগণ এক্ষেত্রে আরো দুটি দাবি করত। প্রথমত তারা দাবি করত যে, এদের ডাকলে বা এদের ইবাদত করলে এরা আল্লাহর নৈকট্য মিলিয়ে দেন।[৪৩] দ্বিতীয়ত তারা দাবি করত যে, আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।[৪৪]

তাদের এ সকল যুক্তি সবই ছিল কল্পনা, ধারণা, অনুমান এবং প্রকৃত ওহীর শিক্ষার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি। এজন্য আল্লাহ বারংবার তাদের কাছে 'কিতাব' বা ওহীর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা দাবি করেছেন। যুক্তি ও বিবেক দাবি করে যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের ইবাদত করতে হবে, তাহলে তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আমরা তার নির্দেশ পালন করতাম। এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি কখনোই দেন নি। কাজেই তোমাদের কর্ম যুক্তি ও বিবেক বিরুদ্ধ এবং ওহীর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল।

মক্কার কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করত। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কল্পনা ও সমাজের প্রচলিত কথা। কোনো ওহীলব্ধ জ্ঞানের উপর এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না। পবিত্র কুরআনে তাদের এই বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করার পরে তাদে কাছে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে অহীলব্ধ জ্ঞান থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে:

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তোমাদের কাছে কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তাহলে তোমাদের ওহীলব্ধ কিতাবটা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[৪৫]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্যই ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো জ্ঞানের উপর হতে হবে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ওহী পাঠিয়েছেন, এসকল ওহীর কিতাব (Divine Scripture) সবই নষ্ট বা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, যে বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। এক মাত্র সর্বশেষ রাসূল মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে পাঠানো ওহীই নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত হয়েছে , যার উপর আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি।

১. ২. ৪. ওহীর প্রকারভেদঃ কুরআন ও হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে তা সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব ও হিকমাহ বা সুন্নাত। এখানে আমরা এই দু প্রকারের ওহীর বিষয়ে আলোচনা করব। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রেরিত ওহীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে তাঁর সহচর-সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্বও আমরা আলোচনা করব।

১. ২. ৪. ১. কুরআন মাজীদ

কুরআন কারীম মানব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর সর্বশেষ বাণী। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর তখন থেকে আল্লাহ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন প্রেরণ করতে শুরু করেন। পরবর্তী ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কুরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বৎসরে তা পরিপূর্ণরূপে অবতারিত হয়। আল্লাহর নিকট থেকে প্রধান ফিরিশতা (Archangel) জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তিনি তার সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন তা মুখস্থ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য। এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় পৃথক পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে

লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অসংখ্য সাহাবী তা মুখস্থ করে নেন। তাঁর সময় থেকেই তিনি ও সাহাবীগণ সাধারণ সালাতে এবং বিশেষত রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পাঠ করতেন। অনেক সাহাবীই ৩ থেকে ৭ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ একটু বেশি সময় ধরে কমবেশি এক মাসের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাতে কুরআন খতম করতেন। এছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখে দেখে দিবসে ও রাত্রিতে তা পাঠ করা ছিল সাহাবীগণের প্রিয়তম ইবাদত ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দের কর্ম।

এভাবে মূলত মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) খতমের মাধ্যমেই কুরআনকে অবিকল আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পরের বৎসর খলীফা আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে লিখিত পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে সংকলন করান। পরবর্তীকালে খলীফা উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে নতুন মুসলিম প্রজন্মের মানুষদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করণের সুবিধার্থে আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক পুস্তকাকারে সংকলিত কুরআনটির বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন।

এভাবে সকল মুসলিমের প্রাত্যহিক পাঠের প্রিয়তম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন কারীম পরিপূর্ণ ও অবিকৃতভাবে অগণিত মানুষের হৃদয়পটে এবং পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয়। যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতারিত হয়েছে আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনিভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন।

এ কুরআনই মানব জাতির পথের দিশারী এবং সকল কল্যাণের উৎস। এতে রয়েছে সকল উপদেশ, শিক্ষা ও সকল আত্মিক ও মানসিক অসুস্থতার মহৌষধ। কুরআনের বৈশিষ্ট্য কুরআন কেন্দ্রিক ঈমান, আকীদা ও জীবন গঠন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে 'আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান' ও 'কুরআনের প্রতি ঈমান' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব। কুরআনই প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস, ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে ও সরলভাবে বিশ্বাস করাই ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কিভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কিসে বিশ্বাস নষ্ট হবে, কিসে কুফরী হবে, কিসে শিরক হবে, কিভাবে ও কি কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ঈমান লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত হয়েছিল, কিভাবে বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, কিভাবে ঈমানদার ব্যক্তি জীবনযাপন করবেন, ইত্যাদি বিষয়ই হলো, কুরআন কারীমের মূল শিক্ষা। আল-কুরআনই ইসলামী আকীদার প্রধান ও মূল উৎস।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত থেকে আক্ষরিক, সরল ও স্বাভাবিক যে অর্থ বুঝা যায় তাই আকীদার মূল উৎস, কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা নামে পরিচিতি পরবর্তী যুগগুলির আলিমগণের মতামত আকীদার উৎস নয়। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সহজ ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন এবং তা বুঝা সহজ করেছেন বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে কুরআন কারীম নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে। এছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হলে তাও ওহীর ব্যাখ্যা বলে গণ্য। এছাড়া আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদাণ করা হয়। পরবর্তী যুগের আলিমগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে যা কিছু বলেছেন তা আলিমগণের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, রায় বা মতামত হিসেবে পর্যালোচনার গুরুত্ব লাভ করে, কিন্তু কখনোই তা ওহীর সমতুল্য বা সম্পূরক নয় এবং তা আকীদার ভিত্তি নয়। আমরা আকীদার উৎস বিষয়ে বিভ্রান্তি আলোচনাকালে বিষয়টি পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ২. ৪. ২. হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ)

১. ২. ৪. ২. ১. পরিচয় ও সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যে ওহী পাঠাতেন তা ছিল দু প্রকারের। প্রথম প্রকার ওহী কুরআন, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো শব্দ ও অর্থসহ আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতেন, সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন। দ্বিতীয় প্রকার ওহীর মূল অর্থ, 'জ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞা' আল্লাহ তাঁর উপর নাযিল করতেন। তিনি নিজের ভাষায় তা সাহাবীদেরকে বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং কখনো কখনো লিখাতেন। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার ওহীকে 'কিতাব' বা গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।"[৪৬]

এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহী 'হাদীস' বা 'সুন্নাত' নামে পৃথক ভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

হাদীস: হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা বা নতুন বিষয়।[৪৭] ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে

প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে” তাই “হাদীস” বলে পরিচিত। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মারফূ’ হাদীস” বলা হয। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মাউকূফ হাদীস” বলা হয়। আর তাবেয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসে “মাকতূ’ হাদীস” বলা হয়।[৪৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে দাবী করা হয়েছে বা বলা হয়েছে তাকেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ‘হাদীস’ বলে গণ্য করা হয়। তা সত্যই রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

সুন্নাত শব্দের অর্থ ও ব্যবহার ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে সুন্নাত ও হাদীস অনেকটা সমার্থক।[৪৯]

বস্তুত কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগই হাদীস বা সুন্নাত। কুরআনের পাশাপাশি অতিরিক্ত যে ওহীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদান করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। কুরআন ও হাদীসই আমাদের সকল জ্ঞানের ও কর্মের মূল উৎস। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন :

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَداً، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

“আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো – আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।”[৫০]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম জীবনের সকল বিশ্বাস এবং সকল কর্মের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বা হাদীস। আমাদের ঈমান-আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সঠিক কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে বিষয়টি কুরআন বা হাদীসে আছে কিনা এবং কিভাবে আছে।

১. ২. ৪. ২. ২. সহীহ হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺকুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লেখাতেন এবং মুখস্থ করাতেন। তিনি কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলতেন বা শেখাতেন সে সকল শিক্ষা অর্থাৎ হাদীস তিনি সাধারণত লিখতে নিষেধ করতেন। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা মুসলিমগণ মুখস্থ করতেন এবং বিক্ষিপ্ত চামড়ার টুকরো, মাটির পাত, পাথর, খেজুর গাছের বাকল ইত্যাদিতে লিখে নিতেন। এ অবস্থায় হাদীস লেখা হলে ভুলবশত একজন মুসলিম কোনো হাদীসকে কুরআনের লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিশিয়ে ফেলতে পারেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে কুরআন নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কুরআনের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি মুসলিমদেরকে কুরআন মুখস্থ করতে ও লিখতে বলতেন। আর তাঁর বাণী ও কর্ম ,অর্থাৎ হাদীস শুধমাত্র মুখস্থকরে বর্ণনা করতে ও মানুষদেরকে শেখাতে বলতেন। এক্ষেত্রে তিনি হাদীস মুখস্থ করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কেউ তাঁর নামে মিথ্যা না বলে, বা এমন কথা তাঁর নামে না বলে যা তিনি বলেন নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَــيَّ [متعمــدا] فَلْيَتَبَــوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"

“তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে। তোমরা আমার হাদীস মৌখিকভাবে বর্ণনা কর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (ইচ্ছা করে) মিথ্যা কথা বলবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দ হবে।”[৫১]

মাদানী জীবনের শেষ দিকে তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন। বিশেষত বিদায় হজ্বের সময় তিনি হাদীস লেখার অনুমতি দেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কোনো কোনো সাহাবী কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। অধিকাংশ সাহাবী তাঁর শিক্ষা, বাণী, কর্ম অত্যন্ত যত্নের সাথে মুখস্থ করতেন, পরস্পরে তা আলোচনা করতেন এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করতেন।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাদীস হুবহু মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২] অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা যেন তাঁর নামে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন। উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি। ‘আশারায়ে

মুবাশশারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।[৫৩] উম্মাতের মধ্যে জালিয়াত ও জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন।[৫৪] যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে।[৫৫]

এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা সাধারণত হাদীস বলতেন না। কখনো হাদীস বললে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলতেন। অন্যের বলা হাদীস যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ করতেন না। বর্ণনার নির্ভুলতা বা বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হলে বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করে, অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করে বা বর্ণনাকারীকে শপথ করিয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। এরপরও সন্দেহ থাকলে তারা হাদীস গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতেন। সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বললে সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে।

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধিতর অনুসরণে তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসকে তারা 'সহীহ' বা 'হাসান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর অশুদ্ধ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। যয়ীফ হাদীসের মধ্যে রয়েছে বানোয়াট বা জাল হাদীস।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) 'আদালত': হাদীসের সকল রাবী (বর্ণনাকারী) পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) 'যাবত': তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩)'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) 'শুযূয মুক্তি': হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) 'ইল্লাত মুক্তি': হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত। প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় শর্তে সামান্য দুর্বলতা থাকলে হাদীসটি 'হাসান' বলে গণ্য হতে পারে।[৫৬] এ সকল শর্তের অবর্তমানে হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল অথবা বানোয়াট বা মাউযূ হাদীস বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

আকীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করতে হবে। সকল যুগে সকল ইমাম ও আলিম এ বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। তাঁরা সর্বদা সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেছেন:

إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ﷺ أخذنا به ولم نَعْدُهُ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে তাঁর উপরেই আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না।"[৫৭]

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তাঁর রচিত 'আল ফিকহুল আকবার' নামক গ্রন্থে বলেছেন:

وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن

"কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই।"[৫৮]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ) মাযহাবের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

وجميع ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيان حق. ... وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ فهو كما قال ...

"শরীয়ত এবং বিবরণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যাক কিছু সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে সবই হক্ক। ..... এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে।"[৫৯]

১. ২. ৪. ২. ৩. মুতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস

এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তা হলো, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা। বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসকে ভাগ করেছেন: (১) মুতাওয়াতির ও (২) আহাদ।

(১) যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত সকল স্তরে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির বা অতি-প্রসিদ্ধ হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক তাবিয়ী থেকে অনেক তাবি-তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। কোনো যুগেই এতগুলি মানুষের

একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা বানানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন সালাতের ওয়াক্ত ও রাকা'আত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়।

(২) যে হাদীসকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত কোনো যুগে অল্প কয়েকজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আহাদ' বা খাবারুল ওয়াহিদ হাদীস বলা হয়।

খাবারুল ওয়াহিদ হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) গরীব: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

(খ) আযীয: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে মাত্র দুজন রাবী রয়েছেন সে হাদীসকে আযীয হাদীস বলা হয়।

(গ) মুসতাফীয: যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল পর্যায়ে দুজনের বেশি, তবে অনেক নয় সে হাদীসকে মুসতাফীয হাদীস বলা হয়।

মুসতাফীয হাদীসকে মাশহূর হাদীসও বলা হয়। অনেক মুহাদ্দিসের মতে যে হাদীস সাহাবীগণের যুগে দু-একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাবিয়ীগণের বা তাবি-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।[৬০]

মুতাওয়াতির বা 'অতি-প্রসিদ্ধ' হাদীস দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান বা "ইলম কাত'য়ী' (**العلم القطعي**) এবং 'দৃঢ় বিশ্বাস' বা 'ইয়াকীন' (**اليقين**) লাভ করা যায়। কুরআন কারীমের পাশাপাশি এই প্রকারের হাদীসই মূলত 'আকীদা'র ভিত্তি। এই প্রকারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাস (কুফরী) বলে বিবেচিত হয়।

মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান (**علم الطمأنية**) লাভ করা যায়। এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা পাপ ও বিভ্রান্তি বলে গণ্য। খাবারুল ওয়াহিদ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসও আকীদার বিষয়ে গৃহীত। তবে সাধারণভাবে ফকীহগণের নিকট খাবারুল ওয়াহিত সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। বরং তা কার্যকর ধারণা (**الظن العملي**) প্রদান করে। কর্মের ক্ষেত্রে বা কর্ম বিষয়ক হালাল, হারাম ইত্যাদি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীসের উপরে নির্ভর করা হয়। আকীদার মূল বিষয় প্রমাণের জন্য সাধারণত এরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় না। তবে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা হয়।[৬১]

অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, সহীহ হাদীস যদি 'খাবারুল ওয়াহিদ' হয় এবং তা তাবিয়ীগণের যুগে না হলেও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে 'আকীদা'র ক্ষেত্রে তার নির্ভর করা যাবে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, বুখারী এবং মুসলিম উভয়ের সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ এগুলিকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু এগুলি দ্বারা সুনিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে অধিকাংশ আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, 'খাবারুল ওয়াহিদ' পর্যায়ের সহীহ হাদীস 'ধারণা' বা 'কার্যকরী ধারণা' প্রদান করে, সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করে না।

এ বিষয়ে ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন: "সহীহ হাদীস বিভিন্ন প্রকারের। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ বলে উদ্ধৃত করেছেন। এরপর যা শুধু বুখারী সংকলন করেছেন, এরপর যা কেবল মুসলিম সংকলন করেছেন, এরপর যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা বুখারীর শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা অন্যদের বিচারে সহীহ বলে গণ্য। শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনুস সালাহ (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী ও মুসলিম অথবা উভয়ের একজন যে হাদীসকে সহীহ হিসেবে সংকলন করেছেন সে হাদীসটি সুনিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং তদ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। মুহাক্কিক বা সুপণ্ডিত গবেষকগণ এবং অধিকাংশ আলিম তাঁর এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুতাওয়ারি পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকারের সহীহ হাদীস দ্বারাই 'ধারণা' (**ظن**) লাভ করা যায়।"[৬২]

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা সবই আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। উপরে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, আকীদার বিষয়েও তাঁরা সহীহ হাদীসের উপরে নির্ভর করতেন, এ বিষয়ক হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে তা শর্ত করেন নি। পার্থক্য এই যে, কুরআনে উল্লেখিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কোনো বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফ্‌রী বলে গণ্য হয়। আর খাবারুল ওয়াহিদের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করলে তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য হয়।

আকীদার ক্ষেত্রে 'মুতাওয়াতির' হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদানের দ্বিবিধ কারণ রয়েছে:

(ক) হাদীসের এ শ্রেণীভাগ বুঝতে নিম্নের উদাহরণটি আলোচনা করা যায়। যে কোনো বিচারালয়ে উত্থাপিত মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারক একটি দৃঢ় 'ধারণা' (**ظن**) লাভ করেন। তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন যে এ সম্পদ সত্যই এ লোকের বলেই মনে হয় অথবা এ লোকটি সত্যই এ হত্যাকাণ্ডে জাড়িত ছিল বলে বুঝা যায়। তিনি এও জানেন যে, তার এই 'ধারণা'র মধ্যে ভুল হতে পারে। সকল বিচারকেরই কিছু রায় ভুল হয়। কিন্তু এ জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন বিচারের রায় প্রদান বন্ধ রাখা হয় না। অনুরূপভাবে সামগ্রিক সনদ বিচার ও অর্থ যাচাইয়ের পরে 'খাবরুল ওয়াহিদ' বা 'এককভাবে বর্ণিত' সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে

মুহাদ্দিস অনুরূপ 'কার্যকরী ধারণা' লাভ করেন যে, কথাটি সত্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। তবে বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে সম্ভাবনা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যত নির্ভুল বলে গণ্য করা হয়। যখন এরূপ বর্ণনা 'অতি-প্রসিদ্ধ' (মুতাওয়াতির) বা 'প্রসিদ্ধ' (মাশহূর) পর্যায়ের হয় তখন ভুল-ভ্রান্তির সামান্য সম্ভাবনাও রহিত হয়।

কুরআন পুরোপুরিই 'মুতাওয়াতির'ভাবে বর্ণিত। যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই শতশত সাহাবী তা লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে হাজার হাজার তাবিয়ী তা সেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। কেউ একটি শব্দকে সমার্থক কোনো শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করেন নি। সহীহ হাদীস তদ্রূপ নয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অর্থের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতেন। আরবী ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রয়োজনে একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। মূল হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল।[৬৩]

(খ) আকীদা বা বিশ্বাস মূলত প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হতে হয়। বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল শেখাতেই আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মুসলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফযীলত মূলক নেক কাজে একটি না করলে অন্যটি করা যায়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই। আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয। যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয়ে হয় কুরআনে স্পষ্ট আয়াত থাকবে, অথবা অগণিত সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত থাকবে।

এ ছাড়া কর্মের বিষয়ে 'ইজতিহাদ' বা কিয়াসের উপরে নির্ভর করা যায়। বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয় ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ অচল। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর বিষয়কে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে যুক্তি দিয়ে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা যায় না।

১. ২. ৪. ২. ৪. সহীহ হাদীসের উৎস

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী আকীদা এবং সকল ইসলামী জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি ও উৎস। এজন্য সাহাবীগণের যুগ থেকেই আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচইয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা দ্বিবিধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন: সংকলন ও যাচাই-বাছাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের প্রায় ৯০ বৎসর পর থেকে পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসরের মধ্যে তাঁর নামে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস এবং সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবেয়ীগণের বক্তব্য, কর্ম ও মতামত বিভিন্ন 'হাদীস'-গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু হাদীস সনদ সহকারে সংকলন করা হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল সনদ সহকারে প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করা। এজন্য তাঁরা সনদসহ সহীহ, যায়ীফ, মাউযূ ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস সংকলন করতেন। এছাড়া তাফসীর, ইতিহাস ও এ জাতীয় গ্রন্থগুলিতে গ্রন্থকারগণ মূলত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সনদ সহ জমা করতেন, সহীহ বা মাউযূ কোনো বিচার করতেন না বা উল্লেখও করতেন না। অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিস কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আলিম সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলে আর তা সহীহ না বানোয়াট তা বলার প্রয়োজন মনে করতেন না। কারণ যেহেতু সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু সকলেই তা বিচার করতে পারবে।[৬৪]

মুহাদ্দিসগণের সংকলন-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষ মনে করেন যে, হাদীসের নামে যা কিছু বলা হয় তা সবই সহীহ। অথবা বড় বড় আলিমগণ তাদের গ্রন্থে যা কিছু সংকলন করেছেন তা যাচাই-বাছাইয়ের পরেই করেছেন, কাজেই সংকলিত সব হাদীসই বোধহয় সহীহ। হাদীস সংকলন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতাই এরূপ চিন্তার কারণ।

আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: "বুখারী ও মুসলিমের বাইরে সহীহ হাদীস খুজতে হবে মাশহুর হাদীসের বইগুলিতে, যেমন আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমা, দারাকুতনী ও অন্যান্যদের সংকলিত গ্রন্থ। তবে এ সকল গ্রন্থে যদি কোনো হাদীস উদ্ধৃত করে তাকে সুস্পষ্টত 'সহীহ' বলে উল্লেখ করা হয় তবেই তা সহীহ বলে গণ্য হবে, শুধুমাত্র এ সকল গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে বলেই হাদীসটিকে সহীহ মনে করা যাবে না; কারণ এ সকল গ্রন্থে সহীহ এবং যয়ীফ সব রকমের হাদীসই রয়েছে।"[৬৫]

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন: "দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসের রীতি ছিল যে, সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ, বাতিল সকল প্রকার হাদীস সনদ-সহ সংকলন করা। তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, সনদ উল্লেখ করার অর্থই হাদীসটি বর্ণনার দায়ভার রাবীদের উপর ছেড়ে দেওয়া, সংকলকের আর কোনো দায় থাকে না।"[৬৬]

দ্বাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খৃ) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এই তিনখানা গ্রন্থের সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সে সকল গ্রন্থ যেগুলির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এই পর্যায়ে রয়েছে : মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবন হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শারহ মায়ানীল আসার, শারহ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হলো ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যে সকল 'হাদীস' পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েযদের ওয়াযে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫). যে সকল 'হাদীস' মূলত সাহাবী বা তাবেয়ীদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলিকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবনু আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবনু আসাকির, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। ... এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐ সকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সূফীগণ বা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ক্রটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সনদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ক্রটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেযী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলিমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।[৬৭]

চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগন্থসমূহে সংকলিত হাদীসসমূহের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ)-এর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১২৩৯ হি) বলেন: এই পর্যায়ের হাদীসগুলির অবস্থা এই যে, প্রথম যুগের (প্রথম তিন হিজরী শতাব্দীর) মুহাদ্দিসদের মধ্যে এগুলি পরিচিতি লাভ করে নি, অথচ পরবর্তী যুগের আলিমগণ তা বর্ণনা ও সংকলন করেছেন। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে: প্রথম সম্ভাবনা এই যে, প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণ এগুলির বিষয়ে জেনেছিলেন এবং এগুলির সনদ বা সূত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা এগুলির কোনো সনদ বা ভিত্তি জানতে পারেন নি, এজন্য তাঁরা এ সকল হাদীস সংকলন করেন নি।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, তাঁরা এগুলির সনদ বা সূত্র জানতে পেরেছিলেন। তবে তাঁদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে এগুলির সনদে কঠিন আপত্তি ও ক্রটি জানতে পেরেছিলেন, যে ক্রটির কারণে হাদীসগুলি প্রত্যাখ্যান করা জরুরি ছিল। এজন্য তাঁরা হাদীসগুলি সংকলন করেন নি।

সর্বাবস্থায় এ সকল হাদীসের উপর কোনো অবস্থাতেই নির্ভর করা যায় না এবং এগুলি দ্বারা কোনো আকীদা বা কর্ম প্রমাণ করা যায় না। এই পর্যায়ের হাদীসগুলি অনেক মুহাদ্দিসকেই বিভ্রান্ত করেছে এবং তাঁদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। কারণ, এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান এ সকল হাদীসের অনেক সনদ দেখে প্রতারিত হয়ে তারা এগুলিকে 'মুতাওয়াতির' বলে গণ্য করেছেন এবং 'সুনিশ্চিত জ্ঞান' ও সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রমাণের জন্য এগুলির উপর নির্ভর করেছেন। এভাবে তাঁরা প্রথম দুই পর্যায়ের বিপরীতে নতুন

মতবাদের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন ।"[৬৮]

১. ২. ৫. সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী বা কুরআন ও সুন্নাহ । ইসলামী বিশ্বাস বা 'আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ'-র ভিত্তি ও উৎস কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান । পবিত্র কুরআনে ও সহীহ হাদীসে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করা এবং যেভাবে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি ।

কুরআন ও হাদীসের বাণী অত্যান্ত সুস্পষ্ট ও পরিস্কার । আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, গোপনীয়তা, বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা নেই । তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কুরআনের বা হাদীসের বুঝার বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তীয় দুই প্রজন্ম 'তাবিয়ী' ও 'তাবি-তাবিয়ীগণের' ব্যাখ্যা ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয় ।

সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে গড়া ছাত্র । তাঁরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহন করেছেন, তার সাহচর্যে থেকেছেন, জীবনের সবকিছর উর্ধ্বে তাঁকে ভালবেসেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁরা সদা উদগ্রীব ছিলেন । তাঁরা তাঁর মুখের বাণী সরাসরি শুনেছেন কুরআন নাযিল হওয়ার পটভুমি তাঁরা জেনেছেন, কুরআনের ও হাদীসের শিক্ষা সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন ও জীবনে বাস্ত াবায়িত করেছেন তাঁরাই । স্বভাবতই কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে ।

কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় ঈমান, আমল, তাকওয়া, জিহাদ, স্বার্থ ত্যাগ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।[৬৯] এ সকল আয়াতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত ও কামালাতে তাঁরাই শীর্ষে । তারা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ । আল্লাহর অফুরন্ত রহমত তাঁরা পেয়েছেন । তাঁদেরককে ভালবাসা ও তাঁদের অনুকরণ- অনুসরণ পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব । রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহবীদের জীবন-পদ্ধতি বা কর্মপন্থার (সুন্নাতের) বিরেধিতাকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যদি কেউ তার কাছে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল ।"[৭০]

এখানে 'বিশ্বাসীদের পথ' বলতে স্বভাবতই সাহাবীদের পথ বোঝান হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ের বিশ্বাসীগণ তাঁরাই । তাঁদেরকে নাজাত ও মুক্তির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বলে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে । এ মহাসাফল্য ।"[৭১]

এখানে সাহাবীগণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রথমত, প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ, দ্বিতীয়ত, প্রথম অগ্রগামী আনসারগণ এবং তৃতীয়ত তাঁদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন । প্রথম দুই পর্যায়ের সাহাবীগণকে সফলতার মাপকাঠি ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও আনসারকে 'প্রকৃত মুমিন' ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।[৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি ও মতামতের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে । এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা । তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই

তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।"[৭৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সাহাবীদের প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্ দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি বলেন:

مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْحَابِيْ

"আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে তারাই সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত।"[৭৪]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ ইসলামের সকল বিষয়ের মত আকীদার বিষয়েও সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যাকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'সুন্নাতে সাহাবা' কখন কিভাবে এবং কোন্ পর্যায়ে দলীলরূপে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন বা সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ) নির্দেশ না থাকলে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে। তিনি বলেন

آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، نظرت إلى أقاويل أصحابه، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

"আমি কুরআনের উপর নির্ভর করি। কুরআনে যা পাই না তার জন্য সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ)-র উপর নির্ভর করি। যদি কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ) না পাই, তাহলে আমি সাহাবীদের মতামত ও শিক্ষার উপর নির্ভর করি, তাদের মতামত ও শিক্ষার বাইরে যাই না।"[৭৫]

সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী- এ তিন প্রজন্মের মানুষদের ধার্মিকতার প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

"আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো যুগ হলো আমার যুগ, যে যুগের মানুষের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবীগণ), আর তাদের পরেই সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়ীগন), আর এর পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবি তাবিয়ীগণ)"।[৭৬]

এ অর্থে আবূ হুরাইরা (রা), বুরাইদা আসলামী (রা), নু'মান ইবনু বাশীর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখার ন্যায়, আকীদার বিষয়েও কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ভালভাবে বুঝার জন্য ও সঠিক ব্যাখ্যা দান করার জন্য প্রথমত সাহাবীদের এবং এরপরে তাঁদের ছাত্রদের বা তাবেয়ীদের এবং তাদের ছাত্রদের বা তাবি-তাবেয়ীদের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রেও অবশ্যই সহীহ সনদে বর্ণিত বিশুদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে যেমন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, তেমনি তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মামেও অনেক মনগড়া কথা রটনা করা হয়েছে। এজন্য হাদীস সংকলনের সময়ে মুহাদ্দিসগণ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীরে বাণী ও শিক্ষাও সনদ-সহ সংকলিত করেছেন, যেন সনদের মাধ্যমে তাঁদের সঠিক শিক্ষা ও মতামত জানা যায় এবং তাদের নামে রটিত মিথ্যা কথা ধরা পড়ে।

১. ২. ৬. উৎসের বিভ্রান্তি বনাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঈমান, আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক যত প্রকারের বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তি বিদ্যমান তার সব কিছুর মূল কারণ আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি। কুফর, শিরক, বিদ'আত, দলাদলি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি সব্ কিছুর মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়ে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা মতবিরোধিতা।

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলি 'গাইব' বা অদৃশ্য জগতকে কেন্দ্র করে। আর অদৃশ্য জগতের বিষয়ে কোনো কিছু সঠিকভাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস 'ওহী'। যখনই কোনো মানুষ ওহীর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করে অথবা আকীদার বিষয়ে অহীর অতিরিক্ত কোনো সূত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করে তখনই সে তার জন্য বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর উৎসের মধ্যে রয়েছে:

১. ২. ৬. ১. ওহী অস্বীকার করা

যুগে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ওহীর প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে দাবি করেন তারা ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। এরূপ নাস্তিকতার দাবিদারগণও মনের গভীরে স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা অনুভব

করেন। এ বিজ্ঞানময় বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার মধ্যে যাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান তাকে অস্বীকার করি বলে গায়ের জোরে দাবি করলেও বিবেক এরূপ দাবি পুরোপুরি মানতে পারে না। তবে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় মনের গভীরের বিশ্বাসের অনুভূতিকে তারা বাড়তে দেন না। বিবেকের বিশ্বাসের দাবি মুখে স্বীকার করলেই অনেক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ কর্ম বাদ দিতে হয়, এজন্য তারা বিষয়টি মুখে স্বীকার করেন না বা এ বিষয়ে বিবেকের প্রেরণা নিয়ে চিন্ত াগবেষণা করতে চান না।

দার্শনিক বা চিন্তাবিদ নামধারী অনেক মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। তারা কল্পনা করেছেন যে, স্রষ্টা এ জগত ও প্রাণীকুল সৃষ্টি করে এদেরকে নিজের মনমর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা আরো কল্পনা করেছেন যে, স্রষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য মানবীয় জ্ঞানই যথেষ্ট। তারা দাবি করেছেন যে, মহান স্রষ্টা মানুষকে তার ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অগম্য একটি বিষয় তার ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান দিয়ে পুরোপুরি বুঝে নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন। এভাবে তারা মহান স্রষ্টার প্রতি অবমাননার সাথে সাথে মানবীয় জ্ঞান ও বিবেককে অপমান করেছেন।

১. ২. ৬. ২. ওহীকে অকার্যকর করা

অনেক মানুষ ওহীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ওহীকে অকার্যকর করার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুভাবে ওহীর কার্যকরিতা অস্বীকার করা হয়: (১) ওহীর স্বাভাবিক ও সরল অর্থ প্রত্যাখ্যান করে 'রূপক' অর্থ গ্রহণ করা, অথবা (২) ওহীর নির্দেশনার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অমুক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য তা প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করা। এ হলো মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

১. ২. ৬. ৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ

বিশ্বাস বিষয়ক বিভ্রান্তির মূল কারণ বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী ছাড়া অন্যান্য উৎসেরর উপর নির্ভর করা। এ সকল ওহী-অতিরিক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে: লোকাচার, ব্যক্তিগত পছন্দ, ওহীর ব্যাখ্যা, ওহী-ভিত্তিক যুক্তি, ধর্মগুরুদের মতামত, ইলকা, ইলহাম বা কাশফ, আকল বা মানবীয় জ্ঞান ইত্যাদি।

আমরা দেখেছি যে আরবের কাফিরগণ মূলত ওহীর অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। তবে তারা বিভিন্ন ওজুহাতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত। তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা তাদের নিজস্ব পছন্দ। এ সকল লোকাচারকে তারা পিতাপিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর ধর্মবিশ্বাস বলে বিশ্বাস করত। এগুলির ভিত্তিতেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাও'আত অস্বীকার করে। তাদের নিকট ইবরাহীম (আ) ও ইসলামঈল (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোনো ওহী তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল না, বরং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা প্রচলনের উপরেই নির্ভর করত। বিভিন্ন মুসলিম সমাজের অধিকাংশ বিভ্রান্তিও এরূপ লোকাচারের ভিত্তিতে প্রসার লাভ করেছে। পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, বিশেষ কোনো ব্যক্তি মতামত, নিজের পছন্দ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো একটি 'আকীদা' বা বিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রসার লাভ করে।

১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক যুক্তি

কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের কাফিরগণ ও ইহূদী-খৃস্টানদের শিরক ও কুফরের একটি বিশেষ কারণ ছিল ওহীর ব্যাখ্যা ও ওহী-ভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তিকে ওহীর সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলি দেখব, সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) তাকদীর সম্পর্কে কাফিরদের বিশ্বাস এবং (২) ঈসা (আ) ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে খৃস্টানদের বিশ্বাস। ওহী এবং ওহীর তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করছি। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত।"[৭৭]

এ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), আলী ইবনু আবী তালিব (রা), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা), মুজাহিদ ইবনু জাবর প্রমুখ সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলির অধিকাংশ সনদই অত্যন্ত দুর্বল। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির সার সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোনো ভিক্ষা প্রদান করেন না। আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত ছিলেন। তিনি এ সময় রুকুরত অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষককে প্রদান করেন। ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, "আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন।"[৭৮]

উপরের তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তাঁর দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই মু'আবিয়া (রা) ও অন্যান্য সকল সাহাবী

(রা) যারা আলী (রা)−এর সাথে শত্রুতা করেছেন, বা তাঁকে ক্ষমতা দেন নি এবং তাঁদের যারা অনুসরণ করেন বা তাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁরা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার কারণে কাফির বা মুরতাদ বলে গণ্য (নাউযু বিল্লাহ!)।

এখানে কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। কুরআনের নির্দেশ যা তার স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায়, তা হলো, মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত। আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং কোনো কোনো যয়ীফ বা খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত। এ সকল মত দ্বারা আলী (রা)-এর মর্যাদা জানা যায়, তবে কখনোই বিষয়টিকে মুমিনের বিশ্বাস বা আকীদার অংশ বানানো যায় না। এজন্য যে কোনো ভাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা বা বিদ্বেষপোষণ ঈমান বিনষ্টকারী, কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা বা অন্য কোনো মুমিনের বিরোধিতা করা তদ্রূপ নয়। কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের অংশ বানিয়েছেন।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে 'স্থলাভিষিক্ত' সৃষ্টি করছি।"[৭৯]

খলীফা অর্থ 'স্থলাভিষিক্ত' বা 'গদ্দিনশীন', যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন। এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে 'খলীফা' বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করবেন। কার স্থলাভিষিক্ত তা আল্লাহ বলেন নি। মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধ: (১) ইবনু আব্বাস (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে 'স্থলাভিষিক্ত' বলতে পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়েছে। (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে 'খলীফা' বা স্থলাভিষিক্ত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে পারে। অর্থৎ আদম ও তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই স্থলাভিষিক্ত।[৮০]

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল ব্যবহারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়। এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপত্তি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্থলাভিষিক্ত, গদ্দিনশীন বা খলীফার প্রয়োজন হয়। আর মহান আল্লাহ তো এরূপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র। কুরআন বা হাদীসে মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা হয় নি, বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হন। যেমন সফরের দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: "আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে (আমাদের) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।"[৮১] একব্যক্তি আবূ বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা। তখন তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।"[৮২]

এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে এই তৃতীয় মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শীয়াগণ এ তাফসীরকে ওহীর সমতুল্য এবং ওহীর সম্পূরক বলে গণ্য করে একে তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা দাবি করেন যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা এবং এ খিলাফাতের চূড়ান্ত রূপ নবীগণ ও আলী বংশের ইমামগণের মধ্যে বিরাজমান। আর কারো খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে তার মত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতে হবে। এ যুক্তিতে তারা দাবি করেন যে, আলী বংশের ইমামগণ মহান আল্লাহর মতই অলৌকিক গাইবী জ্ঞান, ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তা না হলে তাঁরা আল্লাহর খিলাফত কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা একটি তাফসীরকে ওহী হিসেবে গণ্য করে তার উপরে কিছু যুক্তি তর্ক দিয়ে একটি আকীদা বা বিশ্বাস তৈরি করেছেন, যা কুরআন বা হাদীসে কখনো কোথাও এভাবে বলা হয় নি।

এখানে ওহী ও তাফসীরের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। ওহীর নির্দেশনা যে, আদমকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে 'খলীফা' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এতটুকু বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে তা অবিশ্বাস বলে গণ্য। তবে কার খলীফা তা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মতামত ইলমী আলোচনা বটে, কিন্তু ওহীর সমতুল্য নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উপরের তাফসীরগুলি গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবী, তাবিয়ী বা পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ থেকে বর্ণিত হলেও এগুলি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার মত বিশ্বাসের ভিত্তি নয়। এগুলি ইলমী ও ফিকহী আলোচনার সূত্র হলেও আকীদার উৎস নয়। এরূপ গ্রহণযোগ্য তাফসীরের পাশাপাশি তাফসীর নামে অনেক উদ্ভট ও আজগুবি কথাও পাঠক অনেক গ্রন্থে দেখবেন, যেগুলির সাথে কুরআনের বাণীর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি তাফসীরের নামে বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সূরা

ফাতিহার শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন "যারা ক্রোধে নিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়"[৮৩]। এর তাফসীরে কোনো কোনো শীয়া মুফাস্সির বলেছেন যে, ক্রোধে নিপতিত অর্থ যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং পথভ্রষ্ট অর্থ যারা নিরপেক্ষ থেকেছেন বা উভয়দলকে ভাল বলেছেন। সূরা রাহমানে মহান আল্লাহ বলেন: "দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে বর্ণনা।"[৮৪] এর তাফসীরে (!) এরূপ কেউ কেউ বলেছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থ আল্লাহর সকল গাইবী জ্ঞান তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ জ্ঞান তাঁর থেকে আলী বংশের ইমামগণ লাভ করেছেন!!!

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্তির পিছনে এ কারণটি বিদ্যমান। কুরআনের অমুক আয়াতের তাফসীরে অমুক মুফাস্সিরের বক্তব্য, অমুক হাদীসের ব্যাখ্যায় অমুক মুহাদ্দিসের বক্তব্য ইত্যাদিকে 'আকীদা'র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। ওহীর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতামতের মূল্য রয়েছে, তবে তা অবশ্যই মানবীয় মতামত মাত্র। কখনোই তা ওহীর সমপর্যায়ের বা ওহীর সম্পূরক নয়।

১. ২. ৬. ৫. ধর্মগুরুগণ বা আলিমগণের মতামত

সকল ধর্মেই আলিমগণ বা ধর্মগুরুগণ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ধর্মের বিধিবিধান ও ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা প্রদান করেন। তবে ইহূদী-খৃস্টান সম্প্রদায়, বিশেষত খৃস্টান সম্প্রদায় ধর্মগুরু বা বুজুর্গদের ইসমাত বা অভ্রান্ততা ও পবিত্র-আত্মা থেকে প্রাপ্ত কাশফ-ইলহামে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকেই দীনের চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদের বুজুর্গি, কারামত, কাশফ ও বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাদের মতামতকে তারা ওহীর মতই মর্যাদা দান করেছে। বরং ওহীর আর বিশেষ কোনো মূল্য থাকে নি। এ সকল ধর্মগুরু ওহীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের বক্তব্যের সারকথা ছিল, ওহীর বক্তব্য আমরা বুঝব না, এগুলি সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে ধর্মগুরু, পাদরি বা পোপ যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটিই ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এরূপ বিশ্বাসকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব।

মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভক্তি ও বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ পরবর্তী আলিমগণের বক্তব্যকে আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। মূলত শীয়া ফিরকার অনুসারীগণই প্রথমত ইমাম ও নেককারদের ইসমাত ও তাদের ইলমু লাদুন্নী, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির অভ্রান্ততার বিশ্বাস প্রচার করে। পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতার দিনগুলিতে কারামিতা, ফাতিমিয়্যাহ, ইসামঈলিয়্যাহ, বাতিনিয়্যাহ, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুয ইত্যাদি শীয়া ফিরকা সকল মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। অনেক সাধারণ নেককার মানুষও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে আলিম-বুজুর্গগণের মতামতকেই আকীদার মূল ভিত্তি ধরা হয়। অমুক আলিম অমুক কথা বলেছেন, তিনি কি কিছুই জানতেন না? কাজেই কথাটি ঠিক এবং শুধু ঠিকই নয়, এর বিপরতীত কথা বিভ্রান্তি।

নিঃসন্দেহে ইসলামে আলিম ও নেককারগণের মর্যাদা রয়েছে। তবে তাঁরা মা'সূম নন, তাদের মতামত কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। ভুলের কারণে যেমন কোনো নেককার ব্যক্তি বিষয়ে কু-ধারণা পোষণ করা যায় না, তেমনি কোনো নেককার বলেছেন বলেই তা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমরা উপরে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসের পরে ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মকে কুরআন ও হাদীসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কথা কুরআনে বা প্রথম তিন যুগে প্রসিদ্ধ ইমামগণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ হাদীসে নেই সে কথা আকীদার অংশ হতে পারে না, ইলমী আলোচনার বিষয় হতে পারে। আকীদা একমাত্র কুরআন ও হাদীস থেকেই শিখতে হবে। যদি কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশন সুস্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী হয় অথবা সে বিষয়ে মতভেদের সষ্টি হয় এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যার অধিকার সাহাবীগণের। তাঁরা যদি কিছু না বলেন তবে আমাদের কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই। যে বিষয়ে যতটুকু বলে অথবা কিছু না বলে সাহাবীগণের ঈমান সঠিক থেকেছে সে বিষয়ে ততটুকু বললে অথবা কিছু না বললে আমাদের ঈমানও সঠিক থাকবে।

পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথাই বলেছেন। প্রথম তিন মুবারক শতাব্দীর পরে, এবং বিশেষত, ক্রুসেড যুদ্ধে আক্রান্ত এবং পরে তাতার আক্রমনে পরাজিত ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজগুলিতে অনেক আলিম, বুজুর্গ অনেক কথা বলেছেন, তাদের বিপরীতেও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের দেখতে হবে, এ সকল কথা কি সাহাবীগণ বলেছেন? যদি তাঁরা কিছু না বলেন তবে আমাদের মুক্তির পথ হলো কিছু না বলা। কিছু বললে তা অলস ইলমী বিতর্ক হতে পারে, তবে আকীদার বিষয় হতে পারে না।

উম্মাতের সকল আলিম ও বুজুর্গই সম্মানিত। তাদের সম্মান করা মুমিনের দায়িত্ব। তাদের মাধ্যমেই দীন আমরা পেয়েছি। তবে সম্মান করা এবং অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করা এক নয়। উম্মাতের পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথা বলেছেন, তাদের মতামতের সম্মান করতে হবে এবং কোনো মত বাহ্যত সুন্নাতের বিপরীত হলে তার ভাল ব্যাখ্যা করতে হবে। তবে কখনোই তাকে আকীদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বা এরূপ মতের ভিত্তিতে কুরআন বা সুন্নাতের নির্দেশনার ব্যাখ্যা করা যায় না।

১. ২. ৬. ৬. মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস

'আকীদা' বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'আকল' বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিমুখি বিভ্রান্তি বিদ্যমান। কিছু মানুষ 'ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে 'আকল'-কে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যে, অতিন্দ্রীয় বা গাইবী বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে যা

কিছু বলা হবে তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক। এ কারণে মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক আজগুবি ও উদ্ভট বিষয়াদি ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা নামে প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের পরবর্তী ধর্মগুরুগণ। বিশেষত বিকৃত খৃস্টধমের মূল বিশ্বাস মানবীয় জ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহর একত্ব ও ত্রিত্বে বিশ্বাস এমনই। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর সত্তা তিনজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এ তিন ব্যক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর, কিন্তু তারা তিন ঈশ্বর নন, বরং এক ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রকৃতই তিন এবং প্রকৃতই এক। এরূপ উদ্ভট কথাকে তারা বিভিন্নভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেন: বিষয়টি অযৌক্তিক ও অবাস্তব, তবে যেহেতু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি (an irrational truth found in revelation)

তাদের এ কথাটি প্রতারণা মাত্র। প্রথমত, কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থে ত্রিত্ববাদের এ কথাগুলি নেই। প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও কোথাও ত্রিত্ববাদ (Trinity) শব্দটিই নেই, এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তো অনেক দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো ধর্মগ্রন্থে এরূপ কথা থাকে তবে তা প্রমাণ করবে যে, তা মহান আল্লাহর দেওয়া ওহী নয়; কারণ ওহী ও মানবীয় জ্ঞান উভয়ই একই উৎস থেকে আগত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে সংঘর্ষ থাকতে পারে না।

প্রচলিত খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি মূল বিষয় প্রায়শ্চিত্ববাদ। তারা বিশ্বাস করেন যে, আদমের ফল ভক্ষণের কারণে তার সকল সন্তানই পাপী ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এ পাপ মোচনের জন্য একটি কুরবানী বা উৎসর্গ প্রয়োজন। আর এজন্য যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে সকল আদম সন্তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। নিঃসন্দেহে বিষয়টি মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। একের পাপে অন্যের জাহান্নাম পাওনা হওয়া যেমন উদ্ভট, তেমনি একের জাহান্নামমুক্তির জন্য নিরপরাধ অন্য আরেকজনের শাস্তি দেওয়াও উদ্ভট। এ বিষয়ে মেজর ইয়েটস ব্রাউন নামক জনৈক খৃস্টান পণ্ডিত বলেন:

"No heathen tribe has conceived so grotesque an idea, involving as it does the assumption, that man was born with a hereditary stain uopn him, and that this stain (for wihch he was not personally responsible) was to be atoned for, and that the creator of all things had to sacrifice His only begotten son to neutralise this mysterious curse."[85]

অন্য আরেক দল মানুষ ঠিক এর বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। তারা ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আকলকেই প্রধান বলে গণ্য করেছেন। তাদের মতে ওহীর বিষয়টি সকলের জন্য বোধগম্য নয়, কাজেই ওহীর কোন্ বক্তব্য সঠিক এবং কোন্টি ভুল বা রূপক তা আকল দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এ যুক্তিতে তারা মানবীয় আকলকে গাইবী জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিকগণ এবং মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ফিরকা। এরা ওহীর বিচারে মানবীয় আকলকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রদান করেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ আকলের নামে নিজ নিজ পছন্দ, অনুভুতি ও মতামত আকীদা বানিয়ে ফেলে।

ইসলামের নির্দেশনা এর মাঝামাঝি ও সমন্বয়মূলক। ওহীর শিক্ষা জ্ঞানের সঠিকত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞানের নির্দেশনা ওহীর সঠিকত্ব প্রমাণ করে। গাইবী বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে এবং মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্বাধীন বিষয়ে ওহী বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে না, বরং মৌলিক দিক নির্দেশনা দেয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়াধীন বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে এবং গাইবী বিষয়ে সাধারণ দিক নির্দেশনার মধ্যে সীমিত থাকে। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক ওহীর যৌক্তিকতা বিচার করবে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ্ বারংবার 'আকল' বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 'আকল'-এর নামে মনমর্জি বা 'হাওয়া' (الهوى)-র অনুসরণ করার ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বারংবার জানিয়েছেন।

মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। মহান আল্লাহ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যেহেতু আকল ও ওহী দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। তবে এ দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক।

একটি উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব। ওহীর নামে যদি বলা হয় স্রষ্টা নরমাংস ভক্ষণ পছন্দ করেন, অথবা নরববলিতে স্রষ্টা খুশি হন, অথবা স্রষ্টা মানুষের মনের কথা জানেন না, অথবা তিনি অনেক বিষয় দেখতে পান না, অথবা স্রষ্টাকে কোনোভাবে প্রতারণা করে তাঁর বরলাভ বা জান্নাত লাভ সম্ভব... তবে তা মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষা নয় বলেই প্রমাণিত হবে। কারণ এ সকল বিষয় মানবীয় বুদ্ধি বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক।

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-করুণাময় এবং তিনি ন্যায়বিচারক ও শাস্তিদাতা তবে উভয় বিষয়ই মানবীয় জ্ঞানে সম্ভব ও যৌক্তিক। যেহেতু বিষয়দুটিই যৌক্তিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেহেতু এ বিষয়ে ওহীর নির্দেশাবলি সরল অর্থে বিশ্বাস করাই মুমিনের দায়িত্ব। এখন যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করে তার সমাধানকল্পে বিভিন্ন মতামত তৈরি করেন এবং এরূপ তৈরি করা মতামতের ভিত্তিতে ওহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি। যেমন কেউ বলেন, যেহেতু আল্লাহ ন্যায় বিচারক সেহেতু তিনি কোনো পাপী মুসলিমকে শাস্তি ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন না, কাজেই যে সকল আয়াত বা হাদীসে পাপী মুমিনকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে তা বাতিল বা তার অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে। এর বিপরীতে অন্যরা বললেন, মহান আল্লাহ যেহেতু ক্ষমাশীল, সেহেতু তিনি কোনো মুমিনকে শাস্তি দিতে পারেন না, অতএব পাপী মুমিনের শাস্তি বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীস স্বাভাবিক

সরল অর্থে গ্রহণ না করে ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে হবে। এরূপ সকল মতামতই বিভ্রান্তিকর। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, আল্লাহর বিশেষণ ও কর্ম বিষয়ক সকল বিভ্রান্তির উৎস ছিল গাইবী বিষয়ের সকল কিছু জ্ঞান দিয়ে চূড়ান্তভাবে জেনে নেওয়ার অপচেষ্টা করা।

আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস-ইজতিহাদ ও যুক্তিনির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ (১৮২ হি) বলেন:

ليس التوحيد بالقياس.... لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له... فقد أمرك الله عز وجل أن تكون تابعاً سامعاً مطيعاً ولو يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذن لضلوا، ألم تسمع إلى قول الله: لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) فافهم ما فسر به ذلك.

"তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না। .... কারণ কিয়াস তো চলে এমন বিষয়ে যার তুলনা আছে ও নমুনা আছে। আর মহান মহাপবিত্র আল্লাহর তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই। মহান আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তুমি অনুসরণ করবে, শুনবে ও আনুগত্য করবে। যদি উম্মাতকে তাওহীদ সন্ধান ও ঈমান অর্জনের জন্য নিজস্ব মতামত, কিয়াস ও পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তুমি কি শুন নি? মহান আল্লাহ বলেছেন: 'সত্য যদি এদের মতামত-পছন্দের অনুগত হতো তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু।'[৮৬] কাজেই এ আয়াতের তাফসীর ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর।"[৮৭]

১. ৩. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইসলামী আকীদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

(১) বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ

(২) ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ

(৩) বিভ্রান্তিকর আকীদাসমূহ, সেগুলিরর কারণ ও স্বরূপ

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

১. ৩. ১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষের মনকে সদাব্যস্ত, অস্থির ও হতাশ করে ফেলে।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শির্ক-কুফরমুক্ত ঈমান। কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً

"এবং যে ব্যক্তি পরলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।"[৮৮]

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান। আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং (আখিরাতে) তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরষ্কার দান করব।"[৮৯]

দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"যদি জনপদ সমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল, কাজেই আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দান করলাম।"[৯০]

আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। আল্লাহ বলেন:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"জেনে রাখ! আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে।"[৯১]

এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়:

প্রথমত, আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ওহীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখব যে, ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত ও ঈমান লাভ করেছে। কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারে নি। বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

১. ৩. ২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব

কুরআন কারীমের ইহূদী, খৃস্টান, আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই নিজদেরকে খাটি মুমিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তার মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনকেই বিভ্রান্তি ও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাঁটি ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিল। তারা অনেক নেককর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত। কিন্তু ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শির্ক-কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এ সকল কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি এ ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও, তবে অবশ্যই তোমার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুক্ত হবে।"[৯২]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৯৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[৯৪]

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখব। এজন্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলির কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির বিভ্রান্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। অন্যথায় শয়তানের প্ররোচনায় অর্জিত ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

১. ৩. ৩. বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে জেনেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকেও জানতে পারব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। সকল বিষয়ের ন্যায় ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের পথ। তিনি যে কর্ম করেন নি সে কর্মকে বুজুর্গি বা দীনদারি মনে করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ বলে গণ্য করা এবং পাপ। অনুরূপভাবে বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন নি তা বলা বা অনুরূপ কোনো বিষয়কে ইসলামী বিশ্বাসের অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য করাও তাঁর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও অপূর্ণ মনে করা। এরূপ করা কঠিন পাপ। কর্মের ক্ষেত্রে নেককার হলেও বা কর্মের ক্ষেত্রে পাপী না হলেও বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নাত-বিরোধিতার কারণে এ ব্যক্তি পাপী হন। এরূপ ব্যক্তি বিশ্বাসের বিভ্রান্তির কারণে জাহান্নামী হবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এ বিষয়ক একটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। আরো অনেক হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, বিশেষত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করব। এখানে এ সকল ফিরকার জাহান্নামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এরা

সকলেই কাফির। বরং আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের ব্যতিক্রম বিশ্বাস উদ্ভাবনের ফলে তারা আকীদাগত পাপে নিপতিত হয় এবং এজন্য তারা জাহান্নামী হবে। আর সাধারণভাবে আকীদাগত বিদ'আত কর্মগত বিদ'আতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করতেন তা জানা মুমিনের অতীব প্রয়োজন। তাঁরা যা বলেছেন তা বলা, তাঁরা যা বলেন নি তা না বলা এবং সকল ক্ষেত্রে হুবহু তাঁদের অনুসরণ করার জন্য ইলমুল আকীদার পঠন ও পাঠন মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।

১. ৪. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ইসলামী বিশ্বাসের সকল মূল বিষয়ই কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেও তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লিখতে শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উল্লেখ করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন।

১. আল-ফিকহুল আকবার, ইমাম আবূ হানীফাহ (১৫০ হি)।
২. আস-সুন্নাহ, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)।
৩. আল-ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-আদ্‌নী (২৪৩ হি)
৪. আস-সুন্নাহ, আবূ বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসরাম (২৭৩হি),
৫. আস-সুন্নাহ, হাম্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাম্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি)
৬. আস-সুন্নাহ, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস'আস (২৭৫ হি)
৭. আস-সুন্নাহ, আবূ বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহ্‌হাক (২৮৭ হি)
৮. আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৯০ হি)
৯. আস-সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি)
১০. সারীহুস সুন্নাহ, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি)
১১. আস-সুন্নাহ আবূ বাক্‌র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (৩১১ হি)
১২. আস-সুন্নাহ, আবূ বাক্‌র খাল্লাল আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি)।
১৩. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হি)।
১৪. আল-ইবানাতু আন উসূলিদ দিয়ানাহ, আল-আশ'আরী (৩২৪ হি)।
১৫. আস-সুন্নাহ, আল-আস্‌সাল (৩৪৯ হি)।
১৬. আস-সুন্নাহ, সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০হি)
১৭. আশ-শরী'আহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইল আল-আজুর্‌রী (৩৬০ হি)
১৮. আস-সুন্নাহ, আবূশ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি)
১৯. আস-সুন্নাহ, ইবনু শাহীন আবূ হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি)
২০. আর-রিসালাহ আল-কাইরোয়ানিয়্যাহ, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যাইদ আল-কাইরোয়া মালিক-আস-সাগীর (৩৮৬হি)
২১. আস-সুন্নাহ, ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি)
২২. 'আল-ঈমান', ইবনু মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি)
২৩. ই'তিকাদ আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, আবুল কাসিম লালকাঈ হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (৪১৮ হি)।
২৪. আকীদাতুস সালাফি আহলিল হাদীস, ইসমাঈল ইবনু আব্দুর রাহমান আস-সাবূনী (৪৪৯ হি),
২৫. আদ-দুর্‌রাতু ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু, আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমদ ইবনু সাঈদ ইব্‌নু হায্‌ম আয-যাহিরী (৪৫৬ হি)।
২৬. আল-ই'তিকাদ, আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি)।
২৭. আল-ইকতিসাদ ফিল ই'তিকাদ, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি)
২৮. 'আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ', উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.)
২৯. 'শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ', সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.)
৩০. 'শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়্যাহ', মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.)
৩১. কিতাবুত তাওহীদ, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি)
৩২. 'শারহুল ফিকহিল আকবার', মোল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি)

আকীদার বিষয়ে যুগে যুগে আলিমগণ আরো অগণিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া বিভ্রান্ত দল-উপদলের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতবাদের প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত সহীহ মতামত ব্যাখ্যা করেও ইমামগণ অগণিত বই-পুস্তক রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাওহীদের ঈমান

২. ১. আরকানুল ঈমান

একজন মানুষকে মুমিন বলে গণ্য হতে কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তা কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এগুলিকে 'আরকানুল ঈমান' বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পূণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য তার যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহে, পরকালে, মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), গ্রন্থসমূহে এবং নবীগণে, এবং ধন সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন-অনাথ, অভাবগ্রস্ত, পথিক, সাহায্যপ্রার্থনাকারিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করে, এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[৯৫]

এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় কোনো পূণ্য নেই। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। এখানে আল্লাহ মুমিনের বিশ্বাসের মৌলিক পাঁচটি বিষয় এবং তার মৌলিক কর্ম ও চরিত্রের বর্ণনা দান করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

"রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুনিগণও। তারা সকলেই আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর গ্রন্থসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ইমান আনয়ন করেছেন। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।"[৯৬]

এখানে ঈমানের স্তম্ভগুলির মধ্য থেকে ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে ৫টি বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহে, তাঁর রাসূলে, তাঁর রাসূলের উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।"[৯৭]

এভাবে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে উপরের বিষয়গুলি একত্রে বা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসেও ঈমানের রুকনগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকের শুরুতে আবূ হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ঈমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "(ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে।"[৯৮]

এই ঘটনারই বর্ণনা করেছেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) অন্য হাদীসে। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তথায় আসলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো অত্যন্ত পরিপাটি ও কাল। .... তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে বলেন: "ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেন, ঈমান কী তা আমাকে বলুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর গ্রন্থসমূহে, তাঁর রাসূলগণে এবং পরকালে, এবং

বিশ্বাস করবে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণে (ভাগ্যে), তাঁর ভাল এবং মন্দে।"[৯৯]

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী ঈমানের বা 'আল-আকীদাহ আল ইসলামিয়্যাহ'-র ছয়টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে: (১) আল্লাহর উপর ঈমান, (২) আল্লাহর মালাকগণের (ফিরিশতাগণের) প্রতি ঈমান (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান, (৪) আল্লাহর রাসূলগণের উপর ঈমান, (৫) পুনরুত্থান, কিয়ামত, পরকাল বা আখিরাতের উপর ঈমান, এবং (৬) তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান। এ বিষয়গুলোকে আরকানে ঈমান, অর্থাৎ ঈমানের স্তম্ভসমূহ, ভিত্তিসমূহ বা মূলনীতিসমূহ বলা হয়।

২. ২. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহর একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর প্রতি ঈমানের বর্ণনা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ- وفي رواية: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَـهَ إِلا اللَّـهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وفي رواية ثالثة: أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وفي أخرى: أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ- وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وفي رواية: صيام رمضان والحج

"ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, (অন্য বর্ণনায়: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু (উপাস্য) আছে সবকিছুকে অবিশ্বাস করা), সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদান মাসের সিয়াম (রোযা) পালন করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করা।"[১০০]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"যে কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তবে তাঁর জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন।"[১০১]

২. ৩. তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা

'তাওহীদ' শব্দটি আরবী 'ওয়াহাদা (وَحَدَ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'এক হওয়া', 'একক হওয়া' বা 'অতুলনীয় হওয়া' (to be alone, unique, singular, unmatched, without equal, incomparable)। তাওহীদ অর্থ 'এক করা', 'এক বানানো', 'একত্রিত করা', 'একত্বের ঘোষণা দেওয়া' বা 'একত্বে বিশ্বাস করা'। তাওহীদের ব্যবহারিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লিখিত তাওহীদের পরিচিতি আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলিতে তাওহীদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: (**لا إله إلا الله**) "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।" বিভিন্ন বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে: (**وحده لا شريك لـه**) "তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।" আমরা প্রথমে এ বাক্যটির বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করব।

আরবীতে (لا) শব্দের অর্থ হলো নেই, মোটেও নেই বা একেবারে নেই। এই বাক্যে শব্দটি (**نفـي الجـنس**) বা মোটেও নেই বা একেবারেই নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(**إلـه**) শব্দের অর্থ হলো "মাবুদ", অর্থাৎ উপাস্য বা পূজ্য, যার কাছে মনের আকুতি পেশ করা হয়, প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিধ ও অভিধান-প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন:

الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد. فالإله الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود

"হামযা, লাম ও হা=ইলাহ: ধাতুটির একটিই মূল অর্থ, তা হলো ইবাদত করা। আল্লাহ ইলাহ কারণ তিনি মাবুদ বা ইবাদতকৃত।"[১০২]

আরবী ভাষায় সকল পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই 'ইলাহ' বলা হয়। এজন্য সূর্যের আরেক নাম 'ইলাহাহ' (**الإلاهة**); কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের উপাসনা বা পূজা করত।[১০৩] মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

"ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে এবং

আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে দিবেন?"[১০৪]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এখানে 'আলিহাতাকা (آلِهَتَكَ) স্থলে 'ইলাহাতাকা' (إلاهَتَك) পড়তেন। 'ইলাহাত' অর্থ ইবাদত, অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে আপনাকে এবং আপনার ইবাদত করা বর্জন করতে দিবেন?"[১০৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, (ইলাহাহ্) শব্দটি আরবীতে (ইবাদাহ্) শব্দের সমার্থক[১০৬]। এই 'ইবাদাত' বা 'ইবাদাহ' (العبادة) শব্দের অর্থ আমরা বাংলায় সাধারণভাবে উপাসনা বা পূজা বলতে পারি। তবে ইসলামের পরিভাষায় 'ইবাদাত' অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ এবং এর বিভিন্ন প্রকার ও স্তর রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। আমরা আমাদের আলোচনায় সাধারণভাবে উপাসনা, পূজা, ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'ইবাদাত' ব্যবহার করব, যেন আমরা এই ইসলামী গুরুত্বপূর্ন শব্দটির সকল অর্থ ও ব্যবহার ভালভাবে বুঝতে পারি।

(إلا) শব্দের অর্থ ঃ ব্যতীত, ছাড়া বা ভিন্ন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, (لا إلـه إلا الله) বাক্যটির অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"। অর্থাৎ যদিও আল্লাহ ছাড়া অন্য অনেক কিছুকেই ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা আরাধনা করা হয়, তবে সত্যিকারভাবে ইবাদত করার যোগ্য বা মাবুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদাতের তিনিই একমাত্র অধিকারী। ইসলামের পরিভাষায় ইবাদাত বলা হয় এমন সব কিছই একমাত্র তাঁর জন্য।

বিভিন্ন হাদীসে এই বাক্যের সাথে যোগ করা হয়েছে: (وحـده لا شـريك لـه)। আমরা দেখেছি যে, আরবীতে (وَحَدَ) ক্রিয়াপদটির অর্থ: এক হওয়া বা অতুলনীয় হওয়া।

(لا) শব্দটি মোটেও নেই বা কিছুই নেই অর্থ প্রকাশ করছে।

(شـريك) অর্থ অংশীদার বা সহযোগী। শব্দটি আরবী থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং 'অংশীদার' অর্থে 'শরিক' এখন বাংলা ভাষায় অতি পরিচিত শব্দ। আরবীতে শির্ক্ (شِـرْكٌ) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate)। ইশরাক (إشـراك) ও তাশ্রীক (تشـريك) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে 'শির্ক' শব্দটিকেও আরবীতে 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়।[১০৭]

(له) অর্থ 'তাঁর' বা 'তাঁর জন্য'।

এভাবে দেখছি যে, তাওহীদের ঘোষণা বা সাক্ষ্যের এই অংশের অর্থ: মহান আল্লাহ একক ও অতুলনীয়, তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই।

২. ৪. তাওহীদের প্রকারভেদ

আকীদার উৎসের বিচ্যুতির কারণে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের গভীর অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে, আভিধানিক অর্থ, নিজের বুদ্ধি-বিবেক, দর্শন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাওহীদের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেক পণ্ডিত মনে করেছেন যে, 'তাওহীদ' অর্থ মহান আল্লাহকে একমাত্র অনাদি সত্তা বা একামত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করা। তাদের এ চিন্তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনের অগণিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের ও অন্যান্য জাতির কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করত এবং তাঁকেই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালন হিসেবে বিশ্বাস করত। এতটুকুতেই যদি তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়, তবে তো আর তাদেরকে কাফির বলার বা তাদের হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণের আগমনের প্রয়োজন থাকত না।

কুরআন ও হাদীসের অগণিত বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের একাধিক পর্যায় বা স্তর রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।"[১০৮]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর্যায় রয়েছে, যে কারণে ঈমানের সাথে সাথে শিরক্ একত্রিত হতে পারে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون .... وهم مع ذلك يشركون بـه ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه

"তাদের ঈমান হলো, যদি তাদের বলা হয়, আকাশ কে সৃষ্টি করেছে? পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? পাহাড় কে সৃষ্টি করেছে? তারা বলে: আল্লাহ, অথচ তারা শিরক করে ... এরপরও তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে, আল্লাহকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহ ব্যতীরেকে অন্যদের সাজদা করে।"[১০৯]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) বলেন:

إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره

"তাদের ঈমান হলো তারা বলে, (একমাত্র) আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের রিযক দেন এবং তিনিই আমাদের মৃত্যুদেন। এ হলো তাদের ঈমান, এর সাথে তারা তাদের ইবাদতে গাইরুল্লাহর ইবাদত করে শিরক করে।"[১১০]

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৫হি), আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (১০৪ হি), ইকরিমাহ মাওলা ইবনু আব্বাস (১০৫ হি), আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৫ হি), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ (১১৭ হি), আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৭০ হি) ও অন্যান্য তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী মুফাস্সির বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, সকল কাফিরই আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিয্কদাতা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো।[১১১]

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের অন্তত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং কাফিরগণ একটি বিশ্বাস করতো এবং একটি অস্বীকার করত। কুরআন কারীমের এজাতীয় অগণিত নির্দেশনা ও সাহাবী-তাবিয়গণের এ সকল তাফসীরের আলোকে পরবর্তী যুগের আলিমগণ 'তাওহীদ'-কে দুভাগে ভাগ করেছেন। কেউ কেউ দুটি পর্যায়কে আরো বিস্তারিতভাবে তিনটি বা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) তাঁর রচিত 'শরাহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ' পুস্তকে তাওহীদকে প্রথমত দু পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা'রিফাহ (**توحيد الإثبات والمعرفة**) বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ এবং (২) তাওহীদুত তালাবি ওয়াল কাসদি (**توحيد الطلب والقصد**) বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।[১১২] অন্যত্র তিনি উক্ত প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, (২) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত ও (৩) তাওহীদুল ইলাহিয়্যাহ।[১১৩]

প্রসিদ্ধ আলিম ও সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেন এবং এভাবে তিনি তাওহীদকে চার পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন:

(১) আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা

(২) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা

(৩) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা।

(৪) আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা।[১১৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের মূলত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়টির একাধিক পর্যায় রয়েছে। এখানে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওহীদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করব।

২. ৪. ১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ

আমরা দেখেছি যে, এ পর্যায়ের তাওহীদকে তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা'রিফাহ বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ বলা হয়। কখনো বা (**التوحيد العلمي الخبري**) অর্থাৎ 'জ্ঞান ও সংবাদের একত্ব' বলা হয়।[১১৫] জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের দুইটি মূল বিষয় রয়েছে: ১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব, ও ২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

২. ৪. ১. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব

আরবীতে একে 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' (**توحيد الربوبية**) "প্রতিপালনের একত্ব" বলা হয়।[১১৬] এর অর্থ বিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি, প্রতিপালন, সংহার ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহর একত্ব। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন আয়াতে 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।"[১১৭]

তিনি আরো বলেছেন:

أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"জেনে রাখ! সৃষ্টি ও নির্দেশনা (পরিচালনা) একমাত্র তাঁরই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মহিমাময়।"[১১৮]
তিনি আরো বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহই মহাশক্তিময় রিয্ক-দাতা।"[১১৯]
অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

"তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।"[১২০]
এভাবে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের কথা বলা হয়েছে।

২. ৪. ১. ২. অধিকাংশ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ পযায়ের তাওহীদের বিষয়ে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে তেমন কোনো আপত্তি বা মতভেদ ছিল না। সাধারণভাবে কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিয্কদাতা, জীবনদাতা, একক সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ইবাদত করত। তারা আল্লাহর ইবাদাত করার সাথে সাথে ফিরিশতাগণ, কোনো কোনো নবী-রাসূল, সত্য বা কল্পিত আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁদের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা পাথরের 'ভক্তি' করত। 'ভক্তি'-র প্রকাশ হিসেবে তারা এ সকল দ্রব্য বা স্থানে 'সাজদা' করত, মানত করত বা প্রার্থনা করত, যে সকল কর্ম ইসলামের পরিভাষায় 'ইবাদত' বলে গণ্য। তারা কখনোই দাবি করত না যে, এ সকল 'উপাস্য' এ বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে বা প্রতিপালন করে, বরং তারা আল্লাহকেই একমাত্র স্রষ্টা, রব্ব, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করত।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ

"বল, আসমান এবং জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক দান করেন? কে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা উত্তরে বলবে: আল্লাহ। বল: তাহলে কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করছ না।"[১২১]

অতঃপর আল্লাহ বলছেন:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

"বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়েছ তাদের কেউ কি সৃষ্টি করতে পারে এবং ধ্বংসের পরে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে? একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"[১২২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.

"(কাফিরদেরকে) বল, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা রয়েছে তারা কার? তারা বলবে: আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল, সপ্ত আকাশের রব্ব-প্রতিপালন ও মহান আরশের রব্ব-প্রতিপালক কে? তারা বলবে: আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? বল, তোমরা যদি জান তবে বল, সকল কিছুর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি ত্রাণের ক্ষমতা রাখেন, যার উপর ত্রাণ দাতা বা রক্ষাকর্তা নেই? তারা বলবে: আল্লাহ। বল, তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?"[১২৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কাফিররা মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সকল ক্ষমতা, রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ.

“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সুর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় চলেছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন আর যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।”[১২৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

“যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, আকাশমণ্ডলী এবং ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ।’ আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।”[১২৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে এগুলি তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”[১২৬]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

“যদি জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?”[১২৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’ নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।”[১২৮]

এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানছি যে, কাফিররা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই বিশ্বের সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, প্রতিপালক, বৃষ্টিদাতা, ফসলদাতা, রিয্কদাতা, সকল ক্ষমতার মালিক, সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে কেউ আশ্রয়দাতা নেই, মানুষের সকল শক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তিনি অনিষ্ট চাইলে কেউ তা দূর করতে পারে না এবং তিনি কল্যাণ চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এ কথা তার অকপটে স্বীকার করতো।

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, তারা এভাবে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেও অস্পষ্ট একটি ধারণা তাদের মধ্যে ছিল যে, আমাদের উপাস্যগণ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে সক্ষম না হলেও, বা আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা দিলে তা পরিবর্তনের ক্ষমতা না রাখলেও সাধারণভাবে কিছু অলৌকিক নিষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা তাদের আছে, যা আল্লাহই তাদের দিয়েছেন।

২. ৪. ১. ৩. নাম ও গুনাবলির একত্ব

‘তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত’ (**توحيد الأسماء والصفات**) বা ‘নাম ও গুনাবলীর তাওহীদ’ অর্থ: দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর বিভিন্ন নাম ও বিশেষণের উল্লেখ করেছেন। এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের কর্ম, গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. ৪. ১. ৪. এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফিরদের কিছু আপত্তি ছিল

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি গাইবী বিষয়। মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্ত

বতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সত্তা ও গুণাবলির খুটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ বিষয়ে দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তিতর্কের ভিত্তিকে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ থাকতে পারে না। কেউ বলেছেন, তাঁর অমুক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তমুক গুণ থাকতে পারে না বা অমুক নামে তাঁকে ডাকা যায় না। কুরআন কারীমে কাফিরদের এরূপ কিছু বিভ্রান্তির উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রাতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাকে 'রাহমান' বা করুণাময় বলে বিশ্বাস করতে বা এ নামে ডাকতে অস্বীকার করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

"যখন তাদেরকে বলা হয় 'সাজ্দাবনত হও রাহ্মান-এর প্রতি', তখন তারা বলে, 'রাহমান আবার কি? তুমি কাউকে সাজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদা করব?' এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।"[১২৯]

এ বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে ওহীর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করা। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে আল্লাহর বিষয়ে যে সকল বিশেষণ বা কর্মের গুণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলিকে কোনোরূপ বিকৃতি, ব্যাখ্যা, তুলনা বা পরিবর্তন ছাড়াই বিশ্বাস করা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এবং আল্লাহরই নিমিত্ত উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বা নামসমূহের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা বর্জন করবে। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।"[১৩০]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

"বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"[১৩১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।"[১৩২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[১৩৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা বা তুলনা স্থাপন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।"[১৩৪]

২. ৪. ১. ৫. নাম ও গুণাবলির তাওহীদের বিভিন্ন ফিরকার বিভ্রান্তি

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্বের বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে। এ বিষয়ে একমাত্র ওহীর উপর নির্ভর না করে মানবীয় পছন্দ, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হয়। ইফতিরাক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

২. ৪. ২. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব

আরবীতে একে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ' (**توحيد الألوهيـــة**) অর্থাৎ 'ইবাদত বা উপাসনার একত্ব' বা 'আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী' (**التوحيد الإرادي الطلبي**) অর্থাৎ 'ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব' বলা হয়।[১৩৫]

২. ৪. ২. ১. ইবাদতের পরিচয় ও সংজ্ঞা

ইবাদত শব্দটি আভিধানিকভাবে 'আবদ' বা 'দাস' শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে 'উবূদিয়্যাত' ও 'ইবাদত' দুটি শব্দ

ব্যবহৃত হয়। উবূদিয়্যাত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর 'ইবাদত' বুঝানো হয় অলৌকিক, অজাগতিক বা অপার্থিব দাসত্বের ক্ষেত্রে। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই 'ইবাদত', উপাসনা, worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার 'ইবাদত' বা উপাসনা করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই 'ইবাদত' করে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইস্পাহানী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ (৫০২ হি) বলেন:

العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفعال (الإفضال)

"'উবূদিয়াত' (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি প্রকাশ করা। আর 'ইবাদত' (worship, veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞাপক। কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি-অসহায়ত্ব প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এই চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"[১৩৬]

অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়:

العبادة على المعنى اللغوي غاية التذلل والافتقار والاستكانة

"ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব।"[১৩৭]

আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) বলেন:

والعبادة في اللغة من الذلة ... وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

"আভিধানিকভাবে ইবাদত অর্থ ভক্তি-বিনয় বা অসহায়ত্ব। ... আর শরীয়তের পরিভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদত বলা হয়।"[১৩৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভীতিময় চূড়ান্ত ভক্তিই ইবাদত। আর চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ের। তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয় তেমনি তার প্রশংসাও করা হয়। সবই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য। এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলা হয়:

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

"আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।"[১৩৯]

২. ৪. ২. ২. ইবাদতের প্রকারভেদ

তবে সব কর্ম এক পর্যায়ের নয়। কিছু কর্ম আছে যা সাধারণভাবে মানুষ 'ইবাদত' হিসেবেই করে। যে সত্তার এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাকেই তা প্রদান করে। সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলি জানেন। পূজা, অর্চনা, বলি, কুরবানী, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জাতীয় কর্ম। পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ইবাদত হিসেবে করে, আবার জাগতিকভাবেও করে। যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। এগুলি মানুষ মানুষ হিসেবে জাগতিকভাবে অন্য মানুষের জন্য করে। আবার 'মা'বূদ' বা পূজিত সত্তার জন্যও করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই শিরক। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, বলি, উৎসর্গ, জবাই ইত্যাদি করা। এগুলি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ কারো ভিতরে ঈশ্বরত্ব (divinity, holiness, sacredness, sanctity) ঐশ্বরিক ক্ষমতা, চূড়ান্ত আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ তার জন্য এরূপ কর্ম করে না। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন:

اعلم أن العبادة هي التذلل الأقصى. وكون التذلل أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة، مثل كون هذا قياماً وذلك سجوداً، أو بالنية بأن نوى بهذا الفعل تعظيم العباد لمولاهم، وبذلك تعظيم الرعية للملوك، أو التلامذة للأستاذ، لا ثالث لهما.

"জেনে রাখ, ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয়। কোন্ ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত এবং কোন্‌টি চূড়ান্ত নয় তা দুভাবে জানা যায়: (১) ভক্তি-বিনয়ের প্রকার থেকে, যেমন দাঁড়িয়ে ভক্তি করা চূড়ান্ত ভক্তি নয় তবে সাজদা করা চূড়ান্ত ভক্তি এবং (২) নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য থেকে, যেমন বান্দা হিসেবে তার মাবূদকে ভক্তি করার উদ্দেশে যে ভক্তি বা বিনয় প্রকাশ করা হয় তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রজা হিসেবে রাজার বা ছাত্র হিসেবে শিক্ষকের ভক্তির নিয়েতে যা করা হয় তা চূড়ান্ত ভক্তি নয় বলে গণ্য। ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত পর্যায়ের কি না তা জানার তৃতীয় কোনো পথ নেই।"[১৪০]

২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত, যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা

ইত্যাদি- একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাত করেন এবং সাথে সাথে অন্য কারো ইবাদাত করেন তাহলে তিনি আল্লাহর ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবেন না, কারণ তিনি ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করেছেন এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ বিশুদ্ধভাবে, একনিষ্ঠভাবে, নিষ্কলুষভাবে বা শিরকের কলুষতা থেকে মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং কোনো প্রকার ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য না করা। কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন বিশুদ্ধভাবে ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করতে। এ হলো (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-র অর্থ ও নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য বা মাবুদ) নেই, সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠার সাথে বিশুদ্ধভাবে তাঁকেই ডাক।"[১৪১]

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"তাদেরকে তো কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সঠিক ধর্ম।"[১৪২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[১৪৩]

অন্যত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক বানিও না।"[১৪৪]

মহান আল্লাহ বলেন,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অস্বীকার (অবিশ্বাস) করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[১৪৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।"[১৪৬]

এখানে তাগুতকে বর্জন করা বলতে তাগুতের ইবাদত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা তাগূতের ইবাদত বর্জন করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।"[১৪৭]

তাগূত শব্দটি আরবী 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীকে 'তাগী' (**الطاغي**) বা সীমালঙ্ঘনকারী বলা হয়। অত্যধিক সীমলঙ্ঘনকারীকে 'তাগিয়াহ' (**الطاغيــة**) বলা হয়। কঠিনতম সীমালঙ্ঘণকারী বা মহা-অবাধ্যকে 'তাগূত' (**الطــاغوت**) বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে 'তাগূত' অর্থ মহা-সীমালঙ্ঘনকারী।[১৪৮]

আভিধানিকভাবে সকল সীমা-লঙ্ঘনকারীকে তাগূত বলা যায়। তবে কুরআনের পরিভাষায় 'তাগূত' অর্থ শয়তান। এছাড়া

আল্লাহকে ছাড়া যা কিছুর ইবাদত, পূজা বা উপাসনা করা হয় তাকে 'তাগূত' বলা হয়।[১৪৯]

এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তাঁরই উপাসনা ইবাদাত করতে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত-উপাসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ হলো তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ্ অর্থাৎ ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

২. ৪. ৩. উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য

তাওহীদের এ দুটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পরে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়কে পৃথক করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে এখানে প্রণিধাণযোগ্য যে শাহাদাতাইন বা ঈমানের ঘোষনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে শেষ পর্যায় বা ''তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্''-র ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ঈমানের ঘোষণায় প্রথম পর্যায়ের তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কালিমায়ে তাওহীদে "লা খালিকা ইল্লাল্লাহঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই", "লা রাযিকা ইল্লাল্লাহঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো রিয্‌কদাতা নেই", "লা মালিকা ইল্লাল্লাহঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো বাদশাহ বা মালিক নেই", "লা রাব্বা ইল্লাল্লাহঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো রাব্ব বা প্রতিপালক নেই", বা অনুরূপ বাক্য বলা হয় নি। বরং 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর দ্বিবিধ কারণ রয়েছে: (১) তাওহীদুল ইবাদাত তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের ফসল ও দাবি এবং (২) তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের বিরোধিতা ও অস্বীকৃতি।

২. ৪. ৪. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর দাবি তাওহীদুল ইবাদাত

প্রথম কারণ হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদ (তাওহীদুল উলূহিয়্যা) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা জ্ঞানের তাওহীদের ফসল ও ফলাফল। যেহেতু আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, রিয্‌কদাতা ও সর্বশক্তিমান কাজেই একমাত্র তাঁরই ইবাদাত উপসনা করা দরকার। যেহেতু সকল ক্ষমতাই তাঁর সেহেতু তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপসনা করা নিতান্তই অর্থহীন ও জঘন্য অন্যায়। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের (তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ্‌র) কথা উল্লেখ করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের আহ্বান জানিয়েছেন।

বস্তুত, 'ইলাহ' (উপাস্য) এবং 'রাব্ব' (প্রতিপালক)-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। তাওহীদ পন্থী মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কারো 'ইলাহ' বলতে পারেন না; কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনোভাবে কোনো মুমিনের 'ইলাহ' বা উপাস্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কারো পালনকর্তা বা মালিক হিসেবে 'রাব্ব' বলতে পারে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৫ হি) বলেন:

رَبُّ كلِّ شيءٍ: مالكُهُ. والربُّ: اسم من أسماء الله عَزَّ وجَلَّ، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة

"রাব্ব অর্থ মালিক বা স্বত্বাধিকারী, যে কোনো কিছুর রাব্ব অর্থ তার মালিক বা স্বত্বাধিকারী। 'আর-রাব্ব' মহান আল্লাহর একটি নাম। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করা যায় শুধু সম্পর্কের সাথে (অমুকের রাব্ব)।"[১৫০]

ইউসুফ (আ)-এর কারাবাসের ঘটনায় আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

"উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ইউসুফ ধারণা করেছিল তাকে সে বলল, তোমার রব্বের (প্রভুর) নিকট আমার কথা বলো; কিন্তু শয়তান তাকে তার তার রব্বের (প্রভুর) নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দেয়।"[১৫১]

এখানে রাব্বুকা ও রাব্বুহু বলতে বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে।

আরবের কাফিরগণ এবং অন্যান্য কাফির-মুশরিকগণ মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক ও সার্বভৌম সর্বশক্তিমান মালিক বা 'রাব্ব' বলে মানত, অথচ তাঁকে একমাত্র 'ইলাহ' হিসেবে মানত না। বিষয়টি ছিল একান্তই অযৌক্তিক ও মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘষিংক। কারণ যিনি একমাত্র প্রতিপালক তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট 'চূড়ান্ত ভয় ও আশা-সহ চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে যাব কেন?

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, ইলাহ এবং রাব্ব-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও, ব্যবহারে দুটি শব্দ একই সত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ। যিনিই রাব্ব তিনিই ইলাহ হবেন। আর যিনি রাব্ব নন তার ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। এজন্য অনেক সময় ইলাহ অর্থে রাব্ব ও রাব্ব অর্থে ইলাহ ব্যবহার করা হয়।

এ কারণে কুরআন কারীমে বারংবার কাফিরদের কর্ম ও বিশ্বাসের এ অযৌক্তিকতা তুলে ধরে বারংবার মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে বারংবার রাব্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেহেতু তিনিই একমাত্র রাব্ব বলে তোমরাও স্বীকার করছ, তবে কেন তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করছ?

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন 'তাওহীদুর রূবুবিয়্যাহ' সম্পর্কে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করতে। এ সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য জ্ঞানের তাওহীদ থেকে কর্মের তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। যেহেতু তোমরাই স্বীকার করছ যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান, সেহেতু তাকে ছাড়া আর কারও উপাসনা করা, প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, জবাই, মানত বা উৎসর্গ করা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। এভাবে কাফিরদেরকে

তাদের শির্কের অসারতা সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্মের অসারতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এ ছাড়াও কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের কথা উল্লেখ করে একমাত্র তারই ইবাদত করার নির্দেশ দেওয় হয়েছে। এখানে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি পুথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করে দিয়েছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।"[১৫২]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদতে বিমুখ হয় তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দিনকে আলোকজ্জ্বল করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (মাবুদ বা উপাস্য) নেই। তাহলে তোমরা কিভাবে বিপথে যাচ্ছ? এইভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ, কত মহান তিনি! তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাকেই ডাক। জগৎসমুহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত সকল প্রশংসা। বল, আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমর ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাকে জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছে আত্নসমর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।"[১৫৩]

আমরা দেখেছি যে, 'ডাকা' বা প্রার্থনা করাই ইবাদতের মূল। এখানে মহান আল্লাহ প্রথমে আল্লাহকে ডাকতে বা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর 'অহঙ্কারবশত' যারা আল্লাহর ইবাদত করে না, অর্থাৎ আল্লাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ডাকে তাদের পরিণতি উল্লেখ করেছেন। এরপর আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের তাওহীদের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তাদেরকে ইবাদতের তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদ জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের স্বাভাবিক প্রকাশ ও ফলাফল। যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত উপাসনা করা উচিৎ। আর তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে যদি উপাসনা করা হয় তাহলে তাঁকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সব কিছুর মালিক বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যায়। এজন্যই ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা বলে, 'আমাদের রাব্ব (প্রতিপালক) তো আল্লাহ' এবং এতে অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৫৪]

কাফিরগণ স্বীকার ও বিশ্বাস করত এবং বলত যে 'রাব্বুনাল্লাহ' বা 'আমাদের রব্ব তো আল্লাহ'। তারা মহান আল্লাহকে 'আল্লাহ' ও 'আল্লাহুম্মা' এবং 'রাব্বানা' বা 'রাব্বী' বলেই ডাকত। তবে তাদের এ ডাক ও বিশ্বাস ছিল অর্থহীন। কারণ আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে বিশ্বাস করার পর আবার অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ 'রাব্বুনাল্লাহ' বিশ্বাসে অবিচলিত না থেকে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। কাফিরদের এ বিচ্যুতির দিকে বারংবার ইঙ্গিত করে কুরআন কারীমে সর্বদা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ৪. ৫. তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের আপত্তি

ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এ পর্যায়ের তাওহীদেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য

নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে ঈমান ও কুফ্‌রের মধ্যে মূলত এ ব্যাপারেই বিরোধ। প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের একত্বে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বের একাধিক স্রষ্টা আছেন অথবা এই বিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই- এ ধরণের বিশ্বাস খুবই কম মানুষেই করেছে বা করে। সকল যুগে সকল দেশের প্রায় সব মানুষই মূলত বিশ্বাস করেছেন এবং করেন যে, এই বিশ্বের একজনই স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন। কিন্তু তারা উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ফিরিশতা, নবীগণ, নেককারগণ, জিন্নগণ, অন্যান্য দেবদেবী, পাথর, গাছপালা, মানুষ, মানুষের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা স্মৃতিচিহ্নের পূজা, উপাসনা বা 'ভক্তি' করেছেন। আমরা যে কোনো শিরকে লিপ্ত অমুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই বিষয়টি খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারি। বিভিন্ন যুগের ও জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাঁরা সবাই এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন।[১৫৫]

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, যুগে যুগে আল্লাহ যে সকল নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদের উম্মতেরা কখনই বলে নি যে, আল্লাহ ছাড়া এই বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা পালনকর্তা আছেন। বরং তারা সবাই আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সংহারক বলে বিশ্বাস করতেন। তবে তারা মনে করতেন যে, অনেক দেব-দেবী, গাছ-পাথর, ফিরিশতা, জিন্ন বা মানুষের ঐশ্বরিক শক্তি আছে বা তারা আল্লাহর প্রিয়, কাজেই তাদেরকে উপসনা করলে, তাদের নামে মানত, জবাই বা প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে তাদেরও ইবাদত করতেন। নবী রাসূলগণ তাদেরকে সকল দেবদেবী পাথর মূর্তি ও মানুষের উপাসনা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য আহ্বান জানান। কাফিরেরা তা মানতে অস্বীকার করে।

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় মক্কার কাফিরদের বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, তারা প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না।

তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত না, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত। কুরআনে কাফিরদের 'দু'আ', মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি তারা আল্লাহর জন্য করত। তারা আল্লাহর নামে মানত-কুরবানি করত এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের জন্যও মানত-কুরবানি করত। ইরশাদ করা হয়েছে:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের উপাস্যদের জন্য'।"[১৫৬]

কুরআন কারীমের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুশরিকদের প্রধান ইবাদত ছিল 'দু'আ' অর্থাৎ ডাকা বা ত্রাণ বা উদ্ধারের জন্য আবেদন বা প্রার্থনা করা। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দু'আ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দু'আ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকগণ মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করত, তাঁকে ডাকত এবং তার কাছে সাহায্য, বিজয় ইত্যাদি প্রার্থনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করলেন তখন কাফিরগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলত,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"হে আল্লাহ, যদি (মুহম্মদ ﷺ যা প্রচার করছে) তা আপনার পাঠান সঠিক ও সত্য ধর্ম হয়, তবে আপনি আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করুন।"[১৫৭]

বদরের যুদ্ধে যাত্রার আগে মক্কার কাফিরগণ পবিত্র কা'বা গৃহের গিলাফ বা বহিরাবরণী ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ আপনি আমাদের এবং মুহাম্মাদের (ﷺ) দলের মধ্যে যে দল বেশি সম্মানিত ও বেশি ভাল তাদেরকে বিজয়ী করে দেন।" কাফিরদের নেতা আবু জাহল আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলে, "হে আল্লাহ আমাদের (কাফির ও মুসলিমদের) মধ্য থেকে যারা বেশি পাপী, যারা বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী তাদেরকে আপনি এই যুদ্ধে পরাজিত করুন।"[১৫৮]

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

"তোমরা যদি বিজয় প্রার্থনা করে থাক, তবে বিজয় এসে গিয়েছে"[১৫৯]।

অর্থাৎ তোমরা ভাল দলের বিজয় প্রার্থনা করেছিলে, আল্লাহ ভাল দলকে বিজয়ী করেছেন।

আল্লাহর কাছে দু'আ করার পাশাপাশি তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যের কাছেও দু'আ করত। সাধারণত দু'আ কুবুল হওয়ার আশায় তারা দু'আর পূর্বে মানত, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি পেশ করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফিরগণ সাধারণ ও ছোটখাট বিপদ-আপদে আল্লাহকে ডাকত না, বরং এ সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে ডাকত এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করত। আর কঠিন বিপদে পড়লে তারা আল্লাহকে ডাকত। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

"বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা বলতো, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে, অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে।"[১৬০]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়।"[১৬১]

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

"যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্দার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।"[১৬২]

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬৩] কুরআনের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই এইভাবে চলত। সূরা হজ্বের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম। এজন্য কঠিন বিপদে পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত।[১৬৪]

এভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করলেও, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ভয়ঙ্করভাবে অস্বীকার করত। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

"তাদের নিকট যখন বলা হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই' তখন তারা অহঙ্কার করে। এবং বলে, আমরা কি এক উন্মাদ কবির জন্য আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করব?"[১৬৫]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ.

"এবং তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী (রাসূল) এসেছেন এবং কাফিররা বলে: এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু উপাস্যের (ইলাহের) স্থানে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের বিষয়ে অবিচল-স্থিরচিত্ত থাক। নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনি নি; নিশ্চয় এ এক মনগড়া কথা।"[১৬৬]

তারা তাদের মাবূদদের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত করলেও, মূলত এককভাবে আল্লাহর কথা আলোচনা করা বা আল্লাহর একত্বের ও মহত্বের আলোচনা করায় তারা বিরক্ত হতো। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

"যখন তুমি তোমার প্রতিপালককে উল্লেখ কর কুরআনের মধ্যে এককভাবে তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তারা সরে পড়ে।"[১৬৭]

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।"[১৬৮]

ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে তাদের চরম শত্রুতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরম বিরোধিতার কারণ ছিল এই তাওহীদুল ইবাদাতের বিশ্বাস।

২. ৪. ৬. কাফিরদের আপত্তির কারণ

উপরের আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগ্রত হয়। তা হলো, মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করার পরেও কেন তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এত কঠিনভাবে অস্বীকার করত? কেনই বা তারা এককভাবে আল্লাহর যিক্‌র বা আলোচনা হলে বিরক্ত হতো?

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, তারা মহান আল্লাহকে জাগতিক রাজা-মহারাজাদের মতই কল্পনা করত। তারা মনে করত যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা অনুরূপ পর্যায়ের আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে আল্লাহর বিশেষ প্রেম ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ এদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন, যে মর্যাদা ও অধিকারের ফলে এ সকল 'প্রিয়পাত্র' উলূহিয়্যাত' অর্থাৎ ইবাদত বা চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। একজন জাগতিক মহারাজ যেমন তার প্রিয় দাস বা খাদিমকে খুশি হয়ে রাজত্বের কিছু অংশ প্রদান করেন, অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ এদেরকে বিশ্ব পরিচালনার কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ক্ষমতা এদের নেই, তবে মহারাজ যেমন সামন্ত রাজাদের রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন না, তেমনি আল্লাহও এদের কাজে কর্মে বাধা দেন না; কারণ তিনিই ভালবেসে এদেরকে উলূহিয়্যাত ও রবূবিয়্যাতে শরীক করেছেন। তাদের এ বিশ্বাস প্রকাশ করে হজ্জের তালবিয়া পাঠের সময় তারা বলত:

لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়া। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন ...।[১৬৯]

এজন্য তারা বিশ্বাস করত যে, সরাসরি আল্লাহর ডাকলে বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্রের অধিকার ও ক্ষমতা অস্বীকার করা হয় এবং বেয়াদবি হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে এদের মাধ্যমেই যেতে হবে, যেমন মহারাজের নিকট আবেদন করতে 'যথাযথ কর্তৃপক্ষে' মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব না। তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।"[১৭০]

তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল 'আউলিয়া'-র রয়েছে আল্লাহর কাছে বিশেষ অধিকার, ফলে এরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে দ্রুত হাজত মিটিয়ে দিতে পারেন। কাজেই এদের ডাকলে যত দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়, সরাসরি আল্লাহকে ডেকে তা পাওয়া যায় না। এবিষয়ে আল্লাহ বলে্ন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী)।"[১৭১]

এখানে লক্ষণীয় যে, তাদের এ সকল দাবি ও বিশ্বাস বিবেক ও যুক্তি বিরোধী। কারণ আল্লাহই যখ্ন একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান তখন কেন মানুষ অন্য কারো কাছে নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে?

এছাড়া তাদের এ দাবিগুলি সবই মহান আল্লাহ কেন্দ্রিক। মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান্ করেছেন, অথবা তিনি সাধারণভাবে ফিরিশতা বা নবীগণ বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষদেরকে উলূহিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতা, অধিকার বা শরিকানা প্রদান করেছেন, এবং এসকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন বলে দাবি করতে হলে তা আল্লাহর থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এজন্য কুরআন কারীমে বারংবার তাদের নিকট কিতাবের প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। স্বভাবতই তারা কখনো কোনো প্রমাণ দিতে পারে নি। তারা শুধু ওহীর কয়েকটি পরিভাষার অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে মহান আল্লাহ নেককার বান্দাদের বা নবী ও ফিরিশতাদের ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নেককার বান্দাদের সুপারিশ বা শাফা'আতের বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত। অনুরূপভাবে মুজিযা ও কারামতের বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত। মুশরিকগণ এ বিষয়গুলি বিকৃত করে তাদের শিরক প্রমাণ করতে চেষ্টা করত।

তাদের যুক্তির ধারা অনেকটা নিম্নরূপ: (১) আল্লাহ অমুক বা তমুককে ভালবাসেন, (২) যেহেতু তিনি তাঁকে ভালবাসেন সেহেতু নিশ্চয় তিনি তাকে রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শরীক বানিয়েছেন বা বিশ্ব পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন, (৩) এ ক্ষমতার প্রমাণ তাদের মুজিযা-কারামত বা অলৌকিক কার্যাদি, (৪) যেহেতু তিনি তাদেরকে রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছেন সেহেতু তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায় না, (৫) যেহেতু তাদের শাফা'আতের অধিকার স্বীকৃত, কাজেই তাদের কাছেই হাজত পেশ করতে হবে এবং (৬) তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকা হলে বা তাদের মহত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা আলোচনা করলে তাদের সাথে বেয়াদবি হয় যা ক্ষমার অযোগ্য।

তাদের এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা তওহীদের প্রচারকদের ভয়-ভীতি দেখাত। তারা বলত, আল্লাহর প্রিয়পাত্র যাদের আমরা ইবাদত করি তোমরা এদের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ না করলে এরা তোমাদের ক্ষতি করে দেবে। তাওহীদের প্রচারকদের ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারা ছিল নিম্নরূপ:

(১) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলার অর্থই আল্লাহর প্রিয়পাত্র ফিরিশতা, নবী, ওলী বা আল্লাহর সন্তানদের বিরুদ্ধে কথা বলা! আল্লাহ ছাড়া কারো ডাকা যাবে না, সাজদা করা যাবে না, মানত করা যাবে না ইত্যাদি বলার অর্থ এ আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্রের সাথে বেয়াদবী করা!!

(২) এরূপ বেয়াদবীতে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্র বেজায় অখুশি ও নারায হন! ফলে এরূপ বেয়াদবদের তারা শাস্তি দেন!! মহান আল্লাহ তাদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সে ক্ষমতাবলে তারা বেয়াদবদের শাস্তি দিতে পারেন!!!

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ)–এর প্রসঙ্গে বলেন:

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক কর আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক যদি কিছু ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ এসকল উপাস্য আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে আমি ভয় পাই না, আমার যদি কোনো ক্ষতি বা বিপদ হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হবে, তোমাদের উপাস্যদের ইচ্ছাতে নয়)। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব, তবে কি তোমরা অবধান কর না? তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাদেরকে কিভাবে ভয় করব? অথচ আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার কোনোরূপ অনুমতি প্রদান না করা সত্ত্বেও তেমারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় পাও না? তাহলে তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল তো কোন দল নিরাপত্তা লাভের যোগ্য?"[১৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথ-প্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।"[১৭৩]

এখানে কুরআন কারীমের যুক্তি প্রদান পদ্ধতি লক্ষ্য করুন। এ সকল মুশরিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের ভয় দেখাচ্ছে যে, তাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলার অর্থই তাদের সাথে বেয়াদবী করা এবং তাদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। এতে তারা নারাজ হয়ে তোমার অমঙ্গল ও ক্ষতি করবে। এখন প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহ যদি আমার ভাল চান তাহলে কি তারা তা ঠেকাতে পারে? যদি তিনি আমার অমঙ্গল চান তাহলে কি তারা তা রোধ করতে পারে? উভয় ক্ষেত্রে মুশরিকদের উত্তর হলো: না। আর তারা যেহেতু এতই অক্ষম তাহলে তাদের ডাকার দরকার কী? মহান আল্লাহকে ডাকলেই তো হলো। তিনিই তো তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুশরিকগণ একটি ভিত্তিহীন কল্পনার উপরেই শিরকে লিপ্ত হয়, যে মহান আল্লাহ যেহেতু এ সকল বান্দাকে ভালবাসেন, সেহেতু তিনি অবশ্যই এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এদের না ডেকে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে এদের সাথে বেয়াদবী হয়। তাদের এ সকল যুক্তি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনা এবং ওহীর কয়েকটি বিষয়ে বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: "প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মাতকে সুনিশ্চিতরূপে শিরকের হাকীকত বুঝিয়ে গিয়েছেন। এরপর যখন নবীর

প্রিয় সহযোগীগণ এবং তাঁর দীনের বাহকগণ গত হন, তাদের পরে নতুন একটি প্রজন্ম আগমন করে, যারা সালাত বিনষ্ট করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তখন এরা ওহীর মধ্যে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলিকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রিয়ত্ব এবং শাফা'আতের বিষয়দুটি সকল শরীয়তেই বিশেষ মানুষদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা এ দুটি বিষয়েরও বিকৃত অর্থ করে। এছাড়া তারা অলৌকিক কর্মাদি এবং কাশফ-ইলহামের বিষয়টিকে ক্ষমতা ও গাইবী ইলমের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। যার থেকে এরূপ অলৌকিক কর্ম বা কাশফ দেখা গিয়েছে তাকে অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের মালিক বলে তারা দাবি করে।"[১৭৪]

২. ৪. ৭. ইবাদতের তাওহীদই সকল নবী-রাসূলের দাও'আত

ইবাদততের তাওহীদই ছিল যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের প্রথম ও মূল দাও'আত। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী ও রাসূল তাঁর উম্মাতকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেছেন। প্রথম রাসূল নূহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

"আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীয়ত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ (মাবূদ বা উপাস্য) নেই।"[১৭৫]

হূদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

"'আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।"[১৭৬]

সালিহ (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

"সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।"[১৭৭]

শু'আইব (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

"মাদ্য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।"[১৭৮]

সকল নবীকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসূলই প্রেরণ করি নি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[১৭৯]

আমরা দেখেছি যে, অন্য আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: "আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।"

২. ৪. ৮. তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচনা

তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচ্য এবং সকল আলোচনার মূল বিষয়। ইমাম আবূ হানীফার (রা) 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, তাওহীদের আলোচনাকালে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন:

"তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায়। (তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ স্বীকার করার অর্থই তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ স্বীকার করা।) কিন্তু তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ স্বীকার করলে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ স্বীকার করা হয় না।...

কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াত এই দুই প্রকারের তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত। বরং সত্যিকার বিষয় যে, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই এই দুই প্রকারের তাওহীদের বিবরণ।

কারণ কুরআনে কোথাও আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে, আর এগুলি জ্ঞান ও সংবাদের তাওহীদ। আর কোথাও শির্ক-মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় সব কিছু বর্জন করতে আহ্বান করা হয়েছে। এ হলো 'আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী' বা 'ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব' (ইবাদতের তাওহীদ)।

আর কোথাও আদেশ, নিষেধ ও আল্লাহ আনুগত্য বজায় রাখার বর্ণনা রয়েছে। এগুলি তাওহীদের দাবি ও পরিপূরক। আর কোথাও তাওহীদের অনুসারীদের সম্মান-মর্যাদার কথা, দুনিয়াতে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদেরকে কিভাবে সম্মানিত করা হবে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদের পুরস্কার। আর কোথাও শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, পৃথিবীতে তাদেরকে কি লাঞ্ছনা প্রদান করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের জন্য কি শাস্তি ও যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদ থেকে বাইরে যাওয়ার প্রতিফল। কাজেই কুরআনের সকল আলোচনাই তাওহীদ কেন্দ্রিক।[১৮০]

তৃতীয় অধ্যায়
রিসালাতের ঈমান

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অসংখ্য মানুষকে মনোনীত করে তাঁদেরকে তাঁর বাণী দান করেন এবং মানুষদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বানের দায়িত্ব তাঁদেরকে দান করেন। এরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী ও কল্যাণময় মানুষ ছিলেন। এরা সবাই তাঁদের দায়িত্ব যথাযত পালন করেন। এদের অধিকাংশের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা। শুধু যাদের নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নবী বা রাসূলরূপে বিশ্বাস করি। অন্য কাউকে আমরা নিশ্চিতরূপে আল্লাহর রাসূল বলে মনে করতে পারিনা, যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল যুগে সকল দেশে আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা এদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আমরা অনুসরণ করি এবং তাঁর শরীয়ত মত জীবন পরিচালনা করি। আমরা এ অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ঈমানের অবশিষ্ট রুকনগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব।

৩. ১. রিসালাতের সাক্ষ্য

৩. ১. ১. শাহাদাতের তিনটি শব্দ

আমরা দেখেছি যে, শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশে (মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহ ওয়ারাসূলুহু) বলে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনটি শব্দ আছে: মুহাম্মাদ, আবদ ও রাসূল। রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ আলোচনা করার আগে আমরা এই তিনটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনের চেষ্টা করব।

৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (ﷺ)

প্রথমে আমাদের জানা দরকার মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই কমবেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছি। তা সত্ত্বেও তার জীবনী আলোচনার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় উল্লেখ করব।

৩. ১. ২. ১. দেশ ও বংশ

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আরব দেশের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুল মুত্তালিব, তার পিতা হাশিম। হাশিম ছিলেন কুরাইশ বংশের, কুরাইশ একটি আরব গোত্র, যারা ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।

কুরাইশ বংশ ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ। এ বংশের মধ্যে হাশিমের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত পরিবার। মক্কাবাসীরা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। এই হাশিম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহকে মক্কার কুরাইশ বংশের অপর শাখা বানূ যুহরার নেতা ওয়াহ্‌ব ইবনু আব্দু মানাফ বিন যুহরার কন্যা আমিনার সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের কয়েক মাস পরে, মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে আব্দুল্লাহ খেজুর আনার জন্য মদীনায় (ইয়াসরিবে) তার মাতুলালয়লে গমন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর।

৩. ১. ২. ২. জন্ম

আব্দুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমুল ফীল' (**عام الفيل**) বা হাতির বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮১] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।[১৮২]

সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।[১৮৩] হাদীসে নববী থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনু

হিশাম, ইবনু সা'দ, ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা) ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল বাকের (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনু সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতুল কুবরা"-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[১৮৪]

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।"[১৮৫] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[১৮৬]। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) থেকে এই মতটি বর্ণিত।

(৮). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

(৯). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল।

(১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি) থেকে এ মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নুবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নুবুয়্যত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[১৮৭]

৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর

জন্মের পরে তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন "আহমাদ", আর তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার নাম রাখেন "মুহাম্মদ"। মক্কার আধিবাসীরা তাদের নবজাতক সন্তানদেরকে সাধারণত শহরের বাইরে বেদুইন গোত্রদের মধ্যে কিছুদিন লালান পালন করতেন, যেন তারা শহরের মিশ্র পরিবেশের বাইরে বেদুইনদের মাঝে পরিপূর্ণ মানসিক ও দৈহিক পূর্ণতা ও স্বাবলম্বিতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং তাদের ভাষা বিশুদ্ধ হয়। এ নিয়মে জন্মের কিছুদিন পরে মক্কার বাইরে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদূইন গোত্র বনু সা'দের হালীমা বিনতু আবু যু'আইব নামক এক মহিলা শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-এর লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে ৫ বৎসর কাটান।

এরপর তিনি মক্কায় তাঁর মাতার কাছে ফিরে আসেন। প্রায় এক বৎসর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের ভার গ্রহন করেন। আব্দুল মুত্তালিব তার এই এতিম পৌত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ২ বৎসর পরে, ৮ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাদাকেও হারান। মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আবূ তালিবের উপর দায়িত্ব দেন এতিম বালক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর লালন পালনের। পরবর্তী প্রায় ১৭ বৎসর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন।

এসময়ে তিনি মাঝেমাঝে তার চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের ছাগল- ভেড়া চরাতেন মক্কার প্রান্তরে। কখনো চাচার সাথে ব্যবসায়ের ভ্রমণে অংশ নিয়েছেন। তিনি সাধারণ যুবকদের মত গল্পগুজব পছন্দ করতেন না। তিনি কখন কোনো মূর্তিকে স্পর্শ করেন নি । মক্কায় প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খৃষ্টাব্দের দিকে, যখন তার বয়স প্রায় ২০ বৎসর, মক্কার কিছু সৎ ও সাহসী যুবক একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা সমাজের অত্যাচার রোধ করবেন।

শক্তের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবেন এবং দুর্বলের অধিকার আদায় করে দেবেন। যুবক মুহাম্মদ (ﷺ) এই শপথে অংশ গ্রহণ করেন।

৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুবুওয়াত-পূর্ব জীবন

২৫ বৎসর বয়সে তিনি খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ নামক মক্কার একজন ধনী ব্যবসায়ী মহিলার ব্যবসায়ের সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। খাদীজা তার সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতায় খুবই মুগ্ধ হন। তিনি তার সাথে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি ও মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এসময়ে খাদিজার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বৎসর, এবং মহানবীর বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

বিবাহের পরে খাদিজা তার সকল সম্পদ স্বামীর হাতে সমর্পন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতেন। তিনি অনাথদের লালন পালন, অসহায় ও দুস্থদের সেবা, মুসাফিরদের আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। এ সময়ে তিনি তাঁর সেবা, সততা, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সমাজের লোকেরা তাঁকে আল আমীন (বিশ্বস্ত) ও আস সাদিক (সত্যবাদী) ইত্যাদী বিশেষণে আখ্যায়িত করত। বিভিন্ন সামাজিক বিরোধিতায় তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত।

এ বিষয়ে কাবাঘর নির্মাণকালে হাজার আসওয়াদ বা কাল পাথর পুনস্থাপন বিষয়ক ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। কাবাঘরের সংস্কার ও পুনর্নিমাণের পরে পবিত্র হাজ্র আসওয়াদকে কাবাগৃহের দেওয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে পুনস্থাপন করার বিষয়ে মক্কার প্রতিটি গোত্র নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি করে। প্রত্যেকে তার দাবিতে অনড় থাকে এবং অধিকার রক্ষার্থে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করে। মক্কাবাসীরা এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। একপর্যায়ে নেতৃবৃন্দ একমত হন যে, প্রথম যে ব্যক্তি গিরিপথের মধ্য থেকে তাদের সামনে আগমন করবেন সকলেই তার সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। এ সময়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) তথায় উপস্থিত হন। তারা সকলেই আনন্দিত হয়ে বলে উঠেন, আল-আমিন এসেছেন! তখন তিনি নিজের চাদরটি বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি তুলে চাদরের উপর রাখেন। এরপর বিবাদমান সকল গোত্রকে আহ্বান করেন চাদরটি চারিদিক থেকে ধরে পাথরটি কাবাগৃহের নিকটে নিয়ে যাওয়ার। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি কাবার প্রাচীরে পুনস্থাপন করেন। এভাবে মক্কাবাসী ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। এ ঘটনায় নবুয়তের পূর্বেই মক্কাবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল নুবুওয়াতের ৫ বৎসর পূবে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর কিশোর বয়সে এ ঘটনাটি ঘটেছিল।[১৮৮]

৩. ১. ২. ৫. নুবুওয়াত ও মাক্কী জীবন

৪০ বৎসর বয়সে তিনি ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি মক্কার বাইরে হেরা পাহাড়ের গুহায় বসে রাতদিন আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন। এ বছরেই, অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (ইংরেজী আগস্ট মাসে), ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগনের নেতা জিবরীল আল- আমীন (আ) ওহী নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাকে কুরআন কারীমের সূরা ইকরার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষা দান করেন।

এর পরে তিনি আল্লাহর নির্দেশে গোপনে মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করার জন্য আহবান জানাতে থাকেন। এভাবে তিন বৎসর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এ সময়ে মক্কার কিছু সৎ ও নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এর পর আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। তার নবুয়ত প্রাপ্তির ৪র্থ বৎসর থেকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন।

এসময়ে মূলত তিনি মুলত তাওহীদুল ইবাদাত বা ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেন। পাশাপাশি সততা, নৈতিকতা, মানবতা, মানবসেবা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় পালনের এবং শিরক, হত্যা, হানাহানি অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কর্ম বর্জনের জন্য আহ্বান করতেন। ইসলামের অন্যান্য বিধান যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি তখনো প্রবর্তিত হয়নি। এগুলি কিছু মক্কী জীবনের একেবারে শেষে এবং বাকি সকল বিধান মদীনায় হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তাঁর এ আহবান প্রত্যাখ্যান করে। আমরা দেখেছি যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর ইবাদত করত। পাশাপাশি তারা আল্লাহর প্রিয় ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত বান্দা হিসেবে ফিরিশতা, কোনো কোনো নবী, কোনো কোনো কল্পিত ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর ইবাদত করত। তারা এদের ইবাদত করাকে পিতাপিতামহদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম-ইসামাঈল (আ)-এর সঠিক ধর্ম বলে বিশ্বাস করত। এজন্য এদের ইবাদত পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নন এ কথাকে তারা উদ্ভট ও অবস্তর কথা এবং যুগযুগ ধরে প্রচলিত পিতা পিতামহের আচরিত ধর্মের অবমাননা বলে মনে করে। তারা বিভিন্ন ভাবে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে অপমান ও অত্যাচার করতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতের যৌক্তিকতা খণ্ডন করার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা বুঝতে পারে যে, তাঁর বক্তব্য শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ তার বক্তব্য গ্রহণ করবেই। এজন্য তারা মানুষদেরকে তার থেকে দূরের রাখার জন্য চেষ্টা করে। তাকে ধর্মত্যাগী, ধর্মের অবমাননাকারী, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে মানুষদের মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে।

তাদের শত অপপ্রচার ও বাধা সত্ত্বেও ক্রমে ইসলামের বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম

গ্রহণ করেন। তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ডাকে সাড়া দানকারী নও মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। কোনো অত্যাচার নির্যাতন বা অপমান-লাঞ্ছনাই মহানবীকে সত্যের আহবান থেকে সরাতে পারে না। তিনি তার সকল অত্যচারের মধ্যেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষদেরকে আহবান করতে থাকেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারের কারণে শতাধিক মুসলিম নারী ও পুরুষ আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদ আকড়ে ধরে মক্কাবাসীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন।

এত অত্যাচারের মাধ্যমেও ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে অক্ষম হয়ে মক্কার সকল গোত্র একত্রিত হয়ে সকল মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের মানুষদের সামাজিকভাবে বয়কট ও অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নুবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম সন পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বংশের মানুষদের এবং মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে অবস্থান করেন। এ সময়েও তিনি সাধ্যমত দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

নবুয়তের ১০ম বৎসরে অবরোধ থেকে মুক্তির কিছু দিন পরে, তাঁর চাচা আবু তালিব ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা কিছু দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্য এ ছিল খুবই বেদনাময় বৎসর। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি তাঁর ব্যাথ্যা-বেদনার প্রিয়তম সাথীকে হারান। অপর দিকে চাচার মৃত্যুতে তিনি সামাজিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত নেতা। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তার কারণে অনেক সময় কুরাইশ নেতারা মহানবীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে সাহস পেত না। আবু তালিবের মৃত্যুর পরে কুরাইশদের অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা তাকে কোনোভাবেই কথা বলতে দিত না। তেমনিভাবে তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতিও অত্যাচর শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

এমতবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের কথা চিন্তা করেন। তিনি এ বছরের শেষ দিকে (শাওয়াল মাসে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে মে/জুন মাসে) মক্কার প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে তায়েফ শহরে গমণ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় খাদিম যায়িদ বিন হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফে গমণ করেণ। পথিমধ্যে যে সকল বেদুইন গোত্রকে তিনি দেখতে পান, তাদেরকে তিনি তাওহীদের আহবান জানান। তারা কেউই তার আহবানে কর্ণপাত করে না। তিনি তায়েফে প্রায় দশদিন যাবৎ তাওহীদের আহ্বান জানান। তিনি তায়েফের সকল গোত্রপ্রধান ও সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান জানান। তারা কেউই তার ডাকে সাড়া দেয় না। বরং তারা তায়েফের দুষ্ট ছেলেদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। ছেলেরা তায়েফের পথে পথে গালাগালি করে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। উপরন্ত তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে থাকে। তিনি রক্তাক্ত দেহে তায়েফ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ভগ্নহৃদয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। সকল কষ্ট ও ব্যথা মেনে নিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন, যদিও মক্কায় তাঁর অবস্থান বা ইসলাম প্রচার প্রায় অসম্ভব ছিল।

ইব্রাহিম (আ)-এর সময় থেকে মক্কায় কাবাঘরের হজ্জ প্রচলিত হয়। তখন থেকে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা যুলহাজ্জ মাসে মক্কায় এসে হজ্জ আদায় করত। যদিও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অনাচার ছড়িয়ে পড়ে, তবুও হজ্জ ও হাজীদের সম্মান ছিল তাদের বিশ্বাসের অংশ। তারা হজ্জের সময়ে সকল প্রকার মারামারি, দৈহিক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ মনে করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের এই সুযোগে গোপনে মক্কায় আগত বিভিন্ন এলাকার হাজীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন। নবুয়তের ১১শ বৎসরের হজ্জ মাওসুমে (৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মক্কার প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার উত্তরের ইয়াসরীব (মদীনা) শহরে থেকে আগত ৬ জন যুবক হাজী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হজ্জের পরে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

পরবর্তী বৎসরে, নবুয়তের ১২শ বৎসরের হজ্জ মওসুমে (৬২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মদীনার আরো কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সাথে তার প্রিয় সাহাবী মুস'আাব বিন উমাইরকে মদীনায় প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে (নবুয়তের ১৩শ বৎসরে, ৬২২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে) মদীনা থেকে হাজীদের যে কাফেলা আসে তার মধ্যে ৭০ জনেরও বেশি ছিলেন মুসলিম। তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে অবস্থান করার আহ্বান জানান। তাঁরা তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন।

৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদেরকে মদীনায় গমন করার (হিজরত করার) অনুমতি দেন। মক্কার কুরাইশ নেতাগণ মদীনায় ইসলামের সাফল্যে বিচলিত হন। তারা যে কোনো মূল্যে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য এক আলোচনায় মিলিত হন। আলেচনায় তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এসময়ে মহান আল্লাহ তার রাসূল (ﷺ)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে খুজে বের করে হত্যা করার জন্য, কিন্তু তার ব্যর্থ হয়। তিনি তাঁর সঙ্গী আবু বকরের সাথে তিন দিন সাওর পাহাড়ের চূড়ার গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকার পর মদীনায় রওয়ানা দেন। নুবুওয়তের ১৪শ বৎসরের সফর মাসের ২৭ তারিখে (১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর মক্কা ত্যাগ করেন। প্রায় দশ দিন পথ চলার পরে রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে (২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি মদীনায় পৌছান।

তিনি মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদীনার প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মদীনার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগণ এবং অমুসলিম ও ইহূদীদের সাথে নাগরিক চুক্তির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মদীনায় তিনি অত্যন্ত শান্তির সাথে মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থকেন। এ সময় থেকে মহান আল্লাহ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন।

মক্কার কাফিররা তাঁর সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা বিভিন্ন ভাবে মদীনার মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা করতে থাকে এবং মুসলিমদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমন করতে থাকে। ফলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিহাদের বা যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন। কাফিরদের তুলনায় সংখ্যায়, অস্ত্রে ও ক্ষমতায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী তার প্রিয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলা করেন। পরবর্তী ৮ বৎসরে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফিররা পরাজিত হতে থাকে। সর্বশেষে ৮ম হিজরী সালে (৬৩০ খৃ) রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। মক্কার কাফিরদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর আরব উপদ্বীপের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তিনি আরদেশের বাইরে পারস্য, রোম, মিসর, আবিসিনিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে চিঠি লেখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করে। আরবের বাইরেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই বৎসরে (৬৩২ খৃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষাধিক সঙ্গীকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত

হজ্জ থেকে ফেরার পরে **১১**শ হিজরীর (৬৩২ খৃ) প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। বস্তুত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না। এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা ও সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু এ সকল ঘটনার তারিখ কোনো হাদীসে উল্লেখ করেন নি। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি। কবে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিকভাবে দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (**১৫১** হি/৭৬৮ খৃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[১৮৯]

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[১৯০]

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, **১০** দিন, কেউ বলেছেন, **১২** দিন, কেউ বলেছেন **১৩** দিন, কেউ বলেছেন, **১৪** দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন।[১৯১]

তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ইন্তিকাল করেন।[১৯২] কিন্তু এই সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের **১১** তারিখে ইন্তিকাল করেন।[১৯৩] এই একক বর্ণনাটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু কোন্ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে: **১**লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল, **১২**ই রবিউল আউয়াল ও **১৩**ই রাবিউল আউয়াল।[১৯৪]

আমরা **১২**ই রবিউল আউয়ালকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত দিবস ধরে নিয়ে তাঁর ওফাতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলি সহীহ হাদীসের আলোকে উল্লেখ করছি। হাদীস শরীফে সাহাবীগণ তারিখ উল্লেখ না করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা বার ও প্রাসঙ্গিক পূর্বাপর ঘটনাদি উল্লেখ করেছেন। আমরা এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই ঘটনাবলি উল্লেখ করব।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি মসজিদ-সংলগ্ন আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। ওফাতের ৫ দিন আগে (রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ) বৃহস্পতিবার[১৯৫] তিনি গোসল করেন এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে মিম্বরে বসেন এবং সাহাবীদেরকে অন্তিম উপদেশ নসীহত দান করেন। এছাড়াও তিনি অসুস্থ অবস্থায় বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে ওসীয়ত করেন। এ সকল ওসীয়তে তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্ক সম্পর্কে সতর্ক করেন। আয়েশা (রা), আবূ হুরাইরা (রা) জুনদুব (রা), আবূ উবাইদাহ

ইবনুল জার্‌রাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ ওসীয়তের বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. ... لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. ... يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ... وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ... لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي... اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এই কাজ থেকে।" ...

"আল্লাহ লানত-অভিশাপ প্রদান করেন ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" একথা বলে তিনি তাঁর উম্মতকে অনুরূপ কর্ম থেকে সাবধান করছিলেন। .... "তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবর মসজিদ বানিয়ে নেয়।" ... "তোমরা আমার কবরকে ইদ (ইদগাহ বা নিয়মিত সমাবেশের স্থান) বানিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিওনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" "হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজিত দ্রব্য বা পূজ্য-স্থানের মত বানিয়ে দিবেন না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহর ক্রোধ কঠিনতর হোক সে সকল মানুষের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানায়।"[১৯৬]

এতদিন পর্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত জামাতে সালাতের ইমামতি করছিলেন। বৃহস্পতিবার (৮ই রবি. আউয়াল) মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন। এরপর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি মসজিদে যেতে সক্ষম হন না। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।

তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এ সময়ে বারবার বলছিলেন:

الصَّلاةَ (الصَّلاةَ) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"সালাত! সালাতের বিষয়ে সাবধান! (কোনোরূপ অবহেলা করবে না) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের (অধীনস্থগণের) বিষয়ে সাবধান!"[১৯৭]

সোমবার দিন (১২ই রবিউল আউয়াল, ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাসের ৫/৬ তারিখ) দিবসের প্রথম দিকে- দিপ্রহরের পূর্বে- তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশার (রা) কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। এ সময়ে তিনি মেসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকেন। আয়েশা তার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পান তিনি বলছেন: "তাদের সাথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, নবী-রাসূলগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, সৎকর্মশীলগণ। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, সর্বোচ্চ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন। হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন। হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিরিত করে দিন।" এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

তার মৃত্যুর সংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন সাহাবীরা। প্রচণ্ড শোকে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। তাঁর ওফাত হতে পারে- এ কথা মানতে কেউ কেউ অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ وَقَالَ: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)، وَقَالَ: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ). قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবূ বাক্‌র (রা) (মদীনার প্রান্তরে) সুনহ নামক স্থানে ছিলেন। তখন উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেন নি।, আয়েশা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে এ ছাড়া অন্য কিছুই আসে নি। নিশ্চিয় আল্লাহ তাকে উঠাবেন এবং তিনি (যারা তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে) সে সকল মানুষের হস্তপদ কর্তন করবেন। তখন আবূ বাক্‌র (রা) আগমন করেন। তিনি (আয়েশার ঘরের মধ্যে রক্ষিত) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

মুবারক দেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুমু খান এবং বলেন: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানি হোন, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ও মহান। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই দু বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। এরপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে (উমারকে সম্বোধন করে) বলেন, হে কসমকারী, একটু শান্ত হও! যখন আবূ বাক্‌র (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন উমার (রা) বসে পড়লেন। তখন আবূ বাক্‌র আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! যারা মুহাম্মাদের (ﷺ) ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। এবং তিনি (কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে) বলেন[১৯৮]: "তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল", এবং বলেন[১৯৯]: "মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।" তখন মানুষেরা আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে উঠেন।"[২০০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসারে আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার (১৩ই রবিউল আউয়াল) উক্ত ঘরের মধ্যে তাঁকে গোসল করান হয় এবং কাফন পরান হয়। এরপর সাহাবীগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। একক বৃহৎ জামাতে জানাযা হয় নি। সাহাবীগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করে বেরিয়ে যান। এভাবে মঙ্গলবার সারাদিন কেটে যায়। মঙ্গলবার দিনগত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করা হয়।

আয়েশার (রা) এই বাড়িটির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত X ৮ হাত। অর্থাৎ ,তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০ হাত X ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। এই ঘরের মধ্যে (১০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বসতবাড়ি তাঁর ছিল-না। পরবর্তী কালে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কেও এই ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়। এই ঘরের মধ্যে কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।[২০১]

৩. ১. ২. ৮. আয়াত ও মুজিযা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্ম সম্পাদন করাতেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ সকল কর্ম তাদের নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করত। কোনো নবী মৃতকে জীবিত করেছেন, কেউ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে থেকেছেন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত, নিদর্শন বা চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলিকে মু'জিযা বলা হয়। এবিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ অনেক 'আয়াত' বা মুজিযা দান করেছিলেন। অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ তাঁর সময়ের মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ কেউ ঈমান এনেছে, কেউ অবিশ্বাস করেছেন। পরবর্তী যামানার মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি। তাঁরা শুধুমাত্র এ সকল মুজিযার কথা পড়েছেন বা শুনেছেন।

যেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহবান করেন। তারা তাতে অক্ষম হয়।

আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্তব্দ করতে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মক্কার কাফিরগণ নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাজি রেখেছে। অথচ তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে জনসমক্ষে উপস্থিত করে দাবি করা যে, এই দেখ আমরা মুহাম্মাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার জবাব দিয়েছি। যেহেতু জনমত ছিল তাদের পক্ষে এবং অধিকাংশ মানুষই তাদের মতের ছিল সেহেতু মোটামুটি কাছাকাছি একটি সূরা তৈরি করেই তার হৈ চৈ করতে পারত এবং তাদের পক্ষের মানুষদের মনোবল জোরদার করতে পারত। কিন্তু কখনোই তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। কারণ তারা জানত যে, এতে তাদের পক্ষের আরবদের সামনেই তাদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পাবে।

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানব জাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পেরেছেন। আধুনিক যুগেও যে সকল অমুসলিম বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা পণ্ডিত কুরআন অধ্যয়ন করছেন তারও স্বীকার করছেন যে এই গ্রন্থ কোনো মানুষের রচিত নয়, বরং তা মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কেউ তাতে ঈমান এনেছেন, কেউ এড়িয়ে গিয়েছেন। এ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের মানুষ নতুনভাবে এই চিরস্থায়ী মুজিযার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারবে।

এছাড়া মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো অনেক মুজিযা দান করেছিলেন যা তাঁর সমসময়িক মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সকল মুজিযার মধ্যে কিছু মুজিযার বিবরণ কুরআনে রয়েছে। অন্যান্য মুজিযার বিবরণ হাদীস থেকে জানা যায়। কুরআনে উল্লিখিত

মুজিযাগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি মুজিযা:

(১) ইসরা ও মি'রাজ: অলৌকিকভাবে রাত্রিভ্রমন ও ঊর্ধ্বগমন

মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[২০২]

অন্যত্র সূরা নাজমে আল্লাহ বলেছেন:

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

"সে (মুহাম্মাদ ﷺ) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া (অবস্থানের জান্নাত)। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।"[২০৩]

এ সকল আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। আর 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন: "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?"[২০৪] অন্যত্র সূরা জিন্ন-এর মধ্যে তিনি বলেন: "আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।"[২০৫] নিঃসন্দেহে উপরের দুই স্থানেই 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এথেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখানেও 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমন করানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহন) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মি'রাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

(২) চন্দ্র খণ্ডিত করা

মক্কার কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শন দাবি করে। তখন রত্রি বেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছু পরে আবার তা একত্রিত হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।"[২০৬]

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলিমগণ এ বিষয়ক হাদীসগুলিকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেছেন।

এ ছাড়া আরো অগণিত আয়াত বা মুজিযা মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির বিস্তারিত তালিকার জন্যই

পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। তাঁর দু'আয় খাদ্যে অলৌকিক বরকতের ঘটনা ঘটেছে অগণিতবার। সামান্য কয়েকটি রুটি দ্বারা শতাধিক মানুষ তৃপ্তির সাথে আহার করেছেন। সামান্য আধ আজলা পানির মধ্যে তিনি হাত রাখলে আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা বের হয় যাতে কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল বাহিনীর সকলেই ওযু-গোসল ও পানি পান করেন। তাঁর দু'আয় মৃত ঝর্ণায় পানির সঞ্চার হয়, মাত্র দু পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা হয়, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষ তাঁর নির্দেশে পালন করে, কথা বলে ও সাক্ষ্য দেয়। শুষ্ক খেজুরের গুড়ি তাঁর জন্য মানব শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে। তাঁর দু'আয় অন্ধ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করেব, বাকশক্তিহীন কথা বলে, পাগল সুস্থ হয়।

তাঁর অলৌকিক নিদর্শন বা মুজিযার মধ্যে অন্যতম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে, তাঁর বিভিন্ন সাহাবী সম্পর্কে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যা তার জীবদ্দশায় ও তার পরে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।[২০৭]

৩. ১. ২. ৯. আকৃতি ও প্রকৃতি

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাঝারি আকৃতির ছিলেন। তিনি বেঁটে ছিলেন না, আবার অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন ন। তাঁর কাঁধ প্রশস্ত, মাথা বড়, হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো পৌরুষ প্রকাশক ও শক্ত এবং মুখ বড় ছিল। তাঁর চক্ষু ছিল আকর্ষণীয়ভাবে বড় এবং ফাড়া। তাঁর শরীরের রং ছিল ফরসা, সুন্দর কিছুটা লালচে মিশ্রিত সাদা। তাঁর চেহারা মোবারক ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর ও মনেমুগ্ধকর।

তাঁর মাথা ভরা কাল চুল ছিল। তাঁর চুল বেশী কোঁকড়ান বা একবারে সোজা ছিল না, সামান্য কোঁকড়ান ছিল। তাঁর সুবিন্যস্ত চুল সাধারণত তাঁর কান পর্যন্ত লম্বা নেমে আসত। তিনি হজ্জ-ওমরা ছাড়া কখনো মাথা মুণ্ডন করতেন না। ইন্তেকালের পূর্বেও তার চুল ও দাড়ি কাল ছিল। সামান্য ১৫/২০টি চুল সাদা হয়েছিল।

তিনি দৃঢ় পায়ে বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটতেন, এমনভাবে যে তাকে দেখে মনে হত তিনি ঢালু যমিনের উঁচু থেকে নীচুতে নামছেন এবং পদক্ষেপের সাথে সাথে সামনে ঝুকে পড়ছেন।

তিনি জাগতিক চাকচিক্য ও বিলাসিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। খুব সামান্য খাদ্য খেতেন। কখনো কখনো মাসের পর মাস তাঁর ঘরে কিছুই রান্না হত না। শুধুমাত্র ২/১টি খেজুর ও পানি খেয়েই দিন কাটাতেন। মেহমানদের সাথে তিনি কখনো পেটভরে খান নি। তিনি খাওয়ার সময়ে সাধারণত তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন এবং খাওয়ার পরে আঙ্গুলগুলো চেটে নিতেন। তিনি সাধারণ খেজুরের ছোবড়ার বিছানায় শুতেন। তিনি ডান দিকে কাত হয়ে, ডান হাতের তালু তার ডান গালের নীচে রেখে ঘুমাতেন।

মদীনার জীবনে তিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান। সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারণ করে দেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই প্রচুর সম্পদ তাঁর মালিকানায় আসত। কিন্তু তিনি নিজের জন্য টাকা পয়সা নিজের কাছে রাখতেন না। সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন। তার ইন্তেকালের আগে তার কাছে মাত্র ৭টি দিরহাম ছিল যা তিনি বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার ব্যবহারের বর্মটিও তিনি ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে এক ইহুদীর কাছে ৩০ সা (প্রায় ৯০ কিলোগ্রাম) গমের বিনিময়ে বন্ধক রাখেন, যা তিনি ইন্তেকালের আগে আর ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি। ইন্তেকালের সময় তিনি কোনো নগদ টাকা পয়সা রেখে যান নি। সামান্য কিছু খেজুরের বাগান তার ছিল। তিনি ওসিয়ত করেন যে তার মৃত্যুর পরে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকাহ বা ওয়াকফ দান বলে হণ্য হবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে না।

তিনি সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি সর্বদা সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। কেউ তাঁকে সুগন্ধি উপহার দিলে তা কখনো ফেরত দিতেন না।

তিনি কথা বলতেন ধীরে এবং প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। তিনি কখনো উচ্চশব্দে হাসতেন না। সর্বদা তিনি মৃদু হাসতেন। তিনি সবার সাথে হাসিমুখে মিলিত হতেন। কারো সাথে কথা বললে তিনি তাঁর দেহ ও মুখমণ্ডল পুরোপুরি তার দিকে ফিরিয়ে এমনভাবে মনোযোগ ও সম্মানের সাথে কথা বলতেন যে, তাঁর সাথে যেই কথা বলত সেই অনুভব করত যে, সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়।

তিনি অনাবিল হাসি তামাশা পছন্দ করতেন। কিন্তু কখনোই তিনি হাসি তামাশার জন্য এমন কথা বলতেন না যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র রয়েছে। পারিবারিক জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রী-পরিজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পারিবারিক মতভেদে কথা কাটাকাটিতে তাদের প্রতিবাদ, আপত্তি হাসিমুখে নীরবে শুনতেন। তিনি নিজের কাপড় নিজে পরিস্কার করতেন, নিজের ছাগল নিজে দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন।

তিনি কখনো তার কোনো খাদেম বা স্ত্রীকে ধমক দেন নি। তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলতেন না বা ঝগড়া বা গালিগালাজ করতেন না, কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না। একমাত্র ইসলামের বিরোধিতা দেখলেই তিনি রাগান্বিত হতেন। এছাড়া কখনো তাকে রাগতে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো উপর রাগ করেন নি, কোনো প্রতিশোধ নেন নি। কেউ তার প্রতি ব্যক্তিগত কোনো অপরাধ করলে বা তাঁকে কেউ কষ্ট দিলে, তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। মদীনায় তিনি ছিলেন একছত্র অধিপতি, শাসক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রধান। কিন্তু কখনো তাঁর আচরণে শক্তি বা প্রতিপত্তির সামান্যতম প্রভাব ছিল না। মদীনার দরিদ্রতম বা নগণ্যতম ব্যক্তিকেও তিনি পরিপূর্ণ সম্মান দান করতেন, ডাকলে তার বাড়ীতে যেতেন, তার কাছে বসে তার কথা শুনতেন। তিনি সর্বদা অতি সাধারণ পোষাক ও বাসস্থান ব্যবহার করতেন। তাঁর বিনয়ের একটি দিক ছিল যে, কেউ তার সম্মানে উঠে দাঁড়াক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর সাহাবীগণ তাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁকে আসতে দেখলে তার সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে

তিনি মাজলিস ছেড়ে প্রস্থান করার সময় যখন উঠে দাঁড়াতেন তখন উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াতেন।[২০৮]

৩. ১. ৩. আব্দুহু

এখানে দুটি শব্দ রয়েছে 'আব্দ' ও 'হু', অর্থাৎ তাঁহার আব্দ বা আল্লাহর আব্দ। আরবী 'আব্দ' (عَبْد) শব্দের ফারসী ভাষায় অর্থ (বান্দা)। সাধারণভাবে বাংলাভাষায় এই ফার্সী শব্দটি প্রচলিত। আবদ বা বান্দার বাংলা অর্থ ''দাস'', ''ক্রীতদাস'' বা ''চাকর''। আরবী ভাষায় সাধারণভাবে (আব্দ) বলতে সৃষ্টি বা মানুষ বুঝানো হয়, কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা বান্দা। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আর মধ্যে বলতেন:

أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

''আমরা সবাই তো আপনার দাস, আর একজন দাসের সবচেয়ে বড় সত্য ও সঠিক কথা হলো: হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না, আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ দিতে পারে না এবং কোনো ক্ষমতাবান বা ধনবানের ক্ষমতা বা ধন আপনার কাছে তার কোনো উপকারে আসে না।''[২০৯]

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে শিরকের আলোচনায় দেখব যে, যুগে যুগে মানুষের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও শিরকে নিপতিত হওয়ার মূল কারণ ছিল, ফিরিশতা, জিন, নবী, নেককার মানুষ, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দ্রব্য গাছ, পাথর বা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তি কল্পনা করে বা এদের সাথে মহান আল্লাহর বিশেষ সুপারিশ বা লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে জাগতিক বিপদ, আপদ, সমস্যা, অনাবৃষ্টি, অসুস্থতা, ফসলহীনতা ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য এদের কাছে ধর্না দেওয়া, প্রার্থনা করা এবং এরা যেন তুষ্ট হয়ে ডাকে সাড়া দেয় সে জন্য এদের নামে বা এদের কবর, মূর্তি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে মানত, ভেট, ফুল, সাজদা ইত্যাদি প্রদান।

নবী-রাসূলগণকে নিয়ে তাঁদের পরবর্তী উম্মতগণ এভাবে শির্কের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। যে নবী রাসূলগণ মানবজাতিকে শির্কের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোয় আনতে জীবনপাত করেছেন, তাঁদেরই উম্মতেরা তাঁদের তিরোধানের পরে তাঁদের মধ্যে "ঈশ্বরত্ব" কল্পনা করে তাঁদের ইবাদত শুরু করে। তাঁদের মু'জিজা ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে তারা তাঁদের ঐশ্বরিক শক্তির প্রমাণ হিসাবে পেশ করে আল্লাহর পরিবর্তে তাঁদের কাছেই প্রার্থনা, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া, তাঁদের খুশি করতে ভেট, মানত ইত্যাদি প্রদান করা শুরু করে।

সৃষ্টির মধ্যে "ঈশ্বরত্ব" কল্পনার প্রধান দুটি দিক: প্রথমত, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার বিশেষ সম্পর্ক দাবী করা। তাকে ঈশ্বরের পুত্র, কন্যা বা বংশধর বলে দাবী করা। খ্রীষ্টানগণ আল্লাহর মহান রাসূল ঈসা (আ)-কে "আল্লাহর পুত্র" রূপে দাবী করে। তারা "পুত্রত্ব" বলতে জাগতিক পিতাপুত্র সম্পর্ক বুঝায় না। তাদের কাছে পুত্রত্ব অর্থ স্রষ্টা ঈসাকে (আ.) তার নিজের জাত বা সত্তা (Same Substance) থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব রয়েছে। অগণিত বিভ্রান্তি ও জঘন্য মিথ্যা কথা দিয়ে তারা বাইবেলের তাওহীদমূলক অসংখ্য নির্দেশনা ও উক্তিকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপভাবে আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা কন্যাসন্তান বলে বিশ্বাস করব।

সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব দাবীর দ্বিতীয় দিক হলো অবতারত্ব (Incarnation) দাবী। অমুকের মধ্যে স্রষ্ঠা বা তাঁর বিশেষ কোনো গুণ বা শক্তি মিশে গিয়েছে বা স্রষ্ঠার সাথে তার মিলন হয়েছে বা তিনি তাঁর সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন।

এ ধরনের সকল শিরকে মূলোৎপাটন করতে এবং সেগুলির দরজা বন্ধ করতে ইসলামী ঈমানের মধ্যে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু" ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর মনোনিত রাসূল, তাঁর মহত্তম সৃষ্টি ও তাঁর প্রিয়তম। কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষ। তিনি স্রষ্টার অবতার নন, স্রষ্টার সত্তার অংশ নন, স্রষ্টা বা তাঁর কোনো গুণের সাথে মিলে মিশে তিনি একাকার হয়ে যান নি। কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। তাঁর মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণতম বান্দা ও উপাসক হওয়ার মধ্যে। তাঁকে পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক মূলত বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তি থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই বিশ্বাস রক্ষা কবজ।

পূর্ববর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতকে "আল্লাহর বান্দা ও রাসূল" বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উম্মতের পরবর্তীতে ভক্তিকে আনুগত্যের উপরে স্থান দিয়ে তাদেরকে পুত্র বা অবতার বলে দাবী করেছে। এভাবে তাঁদের শিক্ষা, ধর্ম ও শরীয়ত বিকৃত ও নষ্ট হওয়ার পরে আল্লাহ সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে এভাবে তাওহীদের হেফাযত করেছেন।

৩. ১. ৪. রাসূলুহু

এখনেও দুটি শব্দ রয়েছে: 'রাসূল' ও 'হূ', অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহর) রাসূল। আরবী 'রাসূল' (رَسُــول) শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, প্রেরণকৃত, দূত, প্রতিনিধি, বার্তাবাহক (Messenger, emissary, envoy, delegate, apostle) ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল অর্থ আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তা মানুষের কাছে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল মনোনিত মানুষকে আল্লাহ দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন 'নবী' ও 'রাসূল'। উভয় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও পার্থক্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে 'আরকানুল ঈমান'-এর মধ্যে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করা ঈমানের ভিত্তি। কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং নবী। উভয় পদমর্যাদাই তাঁর জন্য প্রযোজ্য।

নবী-রাসূলগণের প্রেরণে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের প্রেরণ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেম ও করুণার মহান নিদর্শন। আর এই করুণার সর্বশেষ প্রকাশ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল ও নবী হিসেবে প্রেরণ।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে সাথে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর মনোনিত ও নির্বাচিত বার্তাবাহক।

৩. ২. রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ

মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য বিশ্বাস করা। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বাসের যে সকল দিক শিক্ষা দিয়েছেন তা আমরা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

(১) তাঁর নুবুওয়াতের বিশ্বাস। অর্থাৎ তিনি নুবুওয়াত পেয়েছেন, তাঁর নুবুওয়াত সর্বজনীন, তাঁর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপুর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল।

(২) তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, তাঁর অনুসরণ মুক্তির পর্থ এবং তাঁর রীতির ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী।

(৩) তাঁর মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস, মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার পূর্ণতায় বিশ্বাস, তাঁকে ভালবাসার অপরিহার্যতা এবং তাঁর কারণে তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ এবং তাঁর আনুগত্যে-অনুসরণে অগ্রগামীদের ভালবাসা।

নিম্নে রিসালাতের বিশ্বাসের এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ২. ১. তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত

একজন মুসলিম সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দিতে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণ শিক্ষা দিতে এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করতে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[২১০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন।[২১১]

৩. ২. ২. তাঁর নুবওয়াতের সর্বজনীনতা

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না। আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"আমি তো আপনাক সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।"[২১২]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক রাসূল উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার

অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।"[২১৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

"তিনিই মহিমাময় যিনি তাঁর বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।"[২১৪]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমত-স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[২১৫]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক উচাঙ্গের ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, (২) আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ গনীমত বৈধ করা হয়েছে, (৪) পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রার উপাদান ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, (৫) আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।[২১৬]

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

"আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে প্রদান করা হয় নি: (১) এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (২) আমার জন্য পৃথিবীকে মাসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করে দেওয়া হয়েছে, আমার উম্মাতের যে কোনো মানুষ যেখানেই তার সালাতের সময় উপস্থিত হবে সেখানেই সে সালাত আদায় করবে, (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, (৪) পূর্ববর্তী নবীদেরকে পাঠানো হতো বিশেষভাবে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য এবং (৫) আমাকে শাফা'আত প্রদান করা হয়েছে।[২১৭]

কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (ﷺ) কোনো নির্দিষ্ট যুগের বা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত নবী তবে তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবেন না, যদিও তিনি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করেন। কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তার সকল কথা ও শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তাঁর কিছু কথাকে অবিশ্বাস করার অর্থ তাঁকে অবিশ্বাস করা।

৩. ২. ৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি

একজন মুসলিম আরো বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। বস্তুত, কুরআন ও হাদীসের এ বিষয়ক কোনো ঘোষণা না থাকলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতাম।

প্রথমত, সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর পরে অন্য নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আগমন করবেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করে মানুষদেরকে জানাবেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে কখনো কোনোভাবে জানান নি যে, তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে কোনো নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। এ বিষয়টিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহী চূড়ান্ত ভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের সর্বজনীনতা ও পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে বারংবার এবং তাঁর দীনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাজেই এরপর আর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় নি। উপরন্তু কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) শেষ নবী। অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[২১৮]

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: ... (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।"

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"ইস্রায়েল সন্তানগণকে (বনী ইসরাঈলকে) শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (আনুগত্য) প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"[২১৯]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে (রা) বলেন:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي

"মূসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।"[২২০]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরী করেছে, কিন্তু ইমারতের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমরতটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং বলতে থাকে: এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! তিনি বলেন: আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।"[২২১]

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ

"আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল। তারা বলতে লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি।"[২২২]

অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ (نَبِيٌّ)

"আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি 'মাহী' (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্‌র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি 'হাশির' (একত্রিতকারী), আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং

আমি 'আকিব' (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।"[২২৩]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبِيَّ

"রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুবুওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।"[২২৪]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর আগমনের সাথে সাথে নুবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর পরে যদি কেউ নুবুওয়াতের দাবী করে তবে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভণ্ড। বিভিন্ন হাদীসে তিনি তাঁর উম্মতকে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ

"নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর মিথ্যাবাদীর (ভণ্ড নবীর) আবির্ভাব ঘঠবে। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।"[২২৫]

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২২৬] এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বরং প্রকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুবুওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত। যারা তাঁর নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তাঁরাই তাঁর খাতমুন নুবুওয়াতের বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে নবুওয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন।

যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করে বা কেউ এরূপ দাবিদারের কথা সত্য বলে মনে করে তবে সে নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বা এরূপ ভণ্ডের অনুসারী। যদি কোনো মুসলিম নামধারী এরূপ দাবি করে বা এরূপ দাবিদারের কথা বিশ্বাস করে তবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

উপরন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবী বা রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন, আসার সম্ভাবনা আছে বা আসা অসম্ভব নয় তবে সে ব্যক্তিও অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে, যদিও সে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে, অথবা তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানে, অথবা তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলে। এই ব্যক্তি মূলত "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-য় বিশ্বাস করে নি। কারণ কুরআনের মাধ্যমে এবং অগণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত তাঁর দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাকে অস্বীকার ও অমান্য করলে আর তাঁর নুবুওয়াতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ থাকে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে নুবুওয়াতের দাবি করে কেউ ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। কারণ এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সচেতনতা ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী যাবত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকগণের কূটকৌশলের কারণে এ সকল ভণ্ড মুসলিম সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে এবং অসংখ্য মুসলিমকে ধর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ভণ্ডের অন্যতম পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ খৃ)।

এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমদ ও তার মত ভণ্ড নবীরা সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে নি; কারণ তাহলে কোনো মুসলিমই তার দাবি গ্রহণ করবে না। বরং তারা প্রথমে বেলায়াত, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি দাবি করে। এরপর তারা নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। এগুলি সবই ইসলামী পরিভাষা ও ইসলাম স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু এগুলির অর্থ ও মর্ম না জানার কারণে অনেকেই এ সকল কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এভাবে তারা যখন কিছু মানুষকে তাদের একান্ত ভক্ত হিসেবে পেয়ে যায়, তখন বিভিন্ন কৌশলে নুবুওয়াত দাবি করে। আর তার অনুসারী ভক্তরা বিভিন্ন অজুহাত ও ব্যাখ্যা দিয়ে তার দাবি মেনে নেয়।

এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, খাতমুন নুবুওয়াতের একটি দিক এই যে, ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কোনো 'ব্যক্তির' কোনো 'ইসমাত' (অভ্রান্ততা), কাদাসাত (পবিত্রতা) বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই।

ইসলামকে জানার জন্য কুরআন হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজতিহাদ করবেন, কিন্তু কোনো মুজতাহিদ দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁর মতটি কোনোভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং সেটিই ইসলামের একমাত্র অভ্রান্ত ব্যাখ্যা, অথবা মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ কোনো পদমর্যাদা প্রদান করেছেন। উম্মাতের মধ্যে আলিম-মুজতাহিদগণ থাকবেন। তাঁদের যোগ্যতা তাঁদের ইলম ও ইখলাসে, আল্লাহর বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো বাণী বা নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে নয়। কাজেই কোনো আলিম বা বুজুর্গ বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি এরূপ কোনো 'পদমর্যাদা', 'ইসমাত' বা 'অভ্রান্ততা' দাবি করেন, বা নিজের মতটি সরাসরি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য আলিমদের মতামত এদিক থেকে অধিকতর

মর্যাদাময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে দাবি করেন তবে তিনি ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

ইসলামে কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও সত্য স্বপ্ন রয়েছে। তবে এগুলি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ব্যক্তিগত সম্মান, কারামত ও নিয়ামত মাত্র। এগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কোনো মানুষের জন্য দীন বুঝার বা দীনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ বা ভিত্তি নয়। যদি কেউ নিজেকে এরূপ কাশফ, ইলকা বা ইলহাম-ধারী বলে দাবি করেন বা এই দাবির ভিত্তিতে নিজের মতটির নির্ভুলতা, অভ্রান্ততা (ইসমাত) বা বিশেষত্ব দাবি করেন তবে তিনিও ভণ্ড, প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক আসবেন বলে আবূ দাউদ সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কেউ কখনোই নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করেন নি। আলিমদের কর্ম বিবেচনা করে সাধারণত তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে পরবর্তী যুগের আলিমগণ কাউকে কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন। এ-ই 'মনে করা' বা ধারণা করাও একান্তই ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কোন্ যুগে কে বা কারা মুজাদ্দিদ ছিলেন সে বিষয়ে আলিমদের অনেক মতভেদ রয়েছে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বে কেউ কখনো নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন নি। যদি কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে, অথবা তার অনুসারীগণ তার জীবদ্দশাতেই তাকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি ও প্রচার করে আর তিনি তা সমর্থন করেন এবং তার এই 'পদমর্যাদা'-র কারণে তার মতের বিশেষত্ব, অভ্রান্ততা বা পবিত্রতা দাবি করেন তবে তিনিও অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতারক বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

এগুলি সবই নুবুওয়াত দাবি করার বিভিন্ন পর্যায় ও পদক্ষেপ। এগুলির পরে কেউ যদি সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে তবে সে নিঃসন্দেহে প্রতারক ভণ্ড ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ কাফির।

৩. ২. ৪. তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা

একজন মুসলিম সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নুবুওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিছুই তিনি গোপন করেন নি। আমরা দেখেছি আল্লাহ তাকে প্রচারের দায়িত্ব দান করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না।"[২২৭]

নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন এবং তাঁর প্রচারের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ

"আর (কাফিরেরা) যদি আপনার আহবানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষাকর্তারূপে প্রেরণ করি নি। আপনার উপরে তো শুধু প্রচারের দায়িত্ব।"[২২৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীদের সামনে প্রশ্ন করেন: আমি কি আল্লাহ বাণী সকল প্রচার করেছি? সাহাবীগণ একবাক্যে বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন:

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ

"তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কি বলবে? তার বলেন: "আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামলায় তাদের মঙ্গলের সকল উপদেশ তাদেরকে জানিয়েছেন।"[২২৯]

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[২৩০]

ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلا هَالِكٌ

"আমি তোমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল পরিস্কার চকচকে ধবধবে রাস্তার উপর রেখে গেলাম, যেখানে রাতও দিনের মত আলোকিত উজ্জ্বল। শুধুমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্তরাই আমার পরে এই রাস্তা থেকে সরে অন্য পথে যাবে।"[২৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন;

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

"আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন, এবং তিনি তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলি থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।"[২৩২]

আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ إِلى الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

"জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।"[২৩৩]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসে বিশেষভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। উম্মাতের মুক্তি ও কল্যাণের সকল তথ্য সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরেও যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, তিনি কোনো শিক্ষা গোপন রেখে গিয়েছেন, গোপনে কাউকে জানিয়ে গিয়েছেন অথবা ইসলামের যে শিক্ষা তিনি সবাইকে দান করেছেন তাতে অপূর্ণতা আছে, অথবা তার পরে কেউ ইসলামের পূর্ণতা দান করতে পারে, তাহলে তিনি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এই কথা বিশ্বাস করেন নি। বরং তিনি দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন নি (নাউযুবিল্লাহ!)।

৩. ২. ৫. তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা

একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে শিখিয়েছেন ও জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তার সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উম্মতের দায়িত্ব হলো, কথাটি তিনি বলেছেন কিনা, কর্মটি তিনি করেছেন কিনা বা শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা তা যাচাই করা। কোনো কথা, শিক্ষা বা কর্ম তাঁর বলে প্রমাণিত হলে তা সত্য বলে গ্রহণ করায় কোনো মুমিন দ্বিধা করতে পারেন না। এ হলো তাঁকে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন এবং তোমাদেরকে তিনি নুর (আলো বা জ্যোতি) দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[২৩৪]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার (কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[২৩৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিরাজিত সকল বিষয়ে তোমার বিধানের স্মরণাপন্ন হবে, তোমার দেওয়া বিধানের ব্যাপারে তাদের মনের গভীরে কোনো আপত্তি অনুভব করবে না এবং সর্বান্তঃকরণে আপনার বিধান মেনে নেবে।"[২৩৬]

কাজেই কোনো বিধান রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে কুরআন বা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে সে বিষয়ে আর কোনো মুমিনের হৃদয়ে দ্বিধা বা আপত্তি থাকতে পারে না। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিধান দান করলে সে ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর আর কোনো পছন্দ করার বা বাছাই করার অধিকার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল সে স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হল।"[২৩৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"[২৩৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন না করলে, তাঁর সকল শিক্ষা ও সকল কথাকে সত্য বলে না মানলে আল্লাহকে মানা বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কোনো মূল্য থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা তাঁর কোনো প্রমাণিত শিক্ষাকে অবিশ্বাস বা অবজ্ঞা করার অর্থ চূড়ান্ত কুফ্‌রী এবং তার পরিণতি ভয়ংকর। আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

"আর যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[২৩৯]

কাজেই কোনো কথা বা শিক্ষা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে প্রমাণিত হলে তা অবিশ্বাস করা, অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা বা বিকৃত করা কোনো মুসলিমের কর্ম নয়। আমরা জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দুটি সূত্র থেকে আমরা পাই: কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ। যদি কোনো কথা বা শিক্ষা পবিত্র কুরআনে আছে বা সহীহ হাদীসে আছে বলে আমরা জানতে পারি, তবে তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করাই মুসলিমের দায়িত্ব।

৩. ২. ৬. তাঁর আনুগত্য

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাকে স্থান দেওয়া।

তাঁর আনুগত্যই ঈমানের আলামত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর- যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"[২৪০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে রহমত করা হয়।"[২৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।"[২৪২]

আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا

"আর যদি কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর সাথী হিসেবে তারাই উত্তম।"[২৪৩]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করে তারাই কৃতকার্য।"[২৪৪]

এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুমিনের জাগতিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর আনুগত্য মূলত তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তার আদেশ নিষেধ জানতে হবে। আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। এভাবে

আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। বিষয়টি কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে:

مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"[২৪৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِين

"বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা তাঁর (রাসূল) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সঠিক পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।"[২৪৬]

এখানেও আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

জাগতিক বিষয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা 'আদেশ-নিষেধের অধিকারীদের' আনুগত্য প্রয়োজনীয়। তবে এ বিষয়ে যে কোনো মতভেদ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করতে অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর শিক্ষার কাছে ফিরে আসতে হবে। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যকার সকল মতবিরোধের নিষ্পত্তি করা তার নির্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে। কুরআনে বা হাদীসে যে নির্দেশ থাকবে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে হবে। নিজেদের মতামতের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে তাঁর সিদ্ধান্তকে। এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'আদেশের মালিক' তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।"[২৪৭]

৩. ২. ৭. তাঁর অনুকরণ

ইতা'আত বা আনুগত্য অর্থ আদেশ নিষেধ পালন করা। আর আদেশ-নিষেধের বাইরেও কর্মে ও বর্জনে অনুকরণকে আরবীতে 'ইত্তিবা' বলা হয়। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দাবি হলো কর্মে ও বর্জনে হুবহু তাঁর অনুকরণ করা। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার সাথে সাথে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল পর্যায়ে কর্মে ও বর্জনে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তিনি যা যেভাবে করেছেন তা করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা। কর্মে ও বর্জনে তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য।"[২৪৮]

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শুধু যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র কাফিররাই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। শুধু কাফেরদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয়। মুমিনদের জন্য তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ। আর হুবহু তাঁর আদর্শে জীবন পরিচালনাই ঈমানের আলামত।

তাঁর আদর্শের অনুসরণ ও জীবন গঠনই আল্লাহর প্রেম, ক্ষমা ও মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ

কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।"[২৪৯]

এভাবে আমরা দেখি যে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাসের অর্থ হলো, চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি বা ভয় ও আশা মিশ্রিত অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অর্থ হলো প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক আনুগত্য ও অনুসরণ একমাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য। কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ আছে যে তাঁর আনুগত্যের উর্ধ্বে বা সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণ না করলেও তার চলে, অথবা তাঁর আনুগত্য-অনুকরণ ছাড়াও আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যদিও সে কোনো বিষয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে মুমিন বিশ্বাস করেন না। 'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল' একথা বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাঁকে পেতে হলে, তাঁর বন্ধুত্ব, বেলায়াত, সাওয়াব, প্রেম ও করুণা লাভ করতে হলে, তাঁর ইবাদত করতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকলে বা ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) আদেশের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।"[২৫০]

'মুখালাফাহ' (**مخالفة**) অর্থ ব্যতিক্রম করা বা বিরোধিতা করা (to contradict, to be at variance)। 'খিলাফ' (**خــلاف**) অর্থ ব্যতিক্রম, বিপরীত বা অসমঞ্জস (difference, dissimilarity)। এ থেকে আমরা বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম, শিক্ষা বা আদর্শের ব্যতিক্রম বা তাঁর পথের ব্যতিক্রম চলা বা তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[২৫১]

আমরা জানি যে, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করেছি। কাজেই আল্লাহর রাসূলের সামনে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রবর্তী হওয়ার অর্থই আল্লাহর সামনে অগ্রণী হওয়া। কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা, আদর্শ, পথ ও মত থেকে একটু সামনে অগ্রবর্তী হবে বা দীন বুঝতে, পালন করতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে তাঁর অতিরিক্ত কিছু কর্ম করবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[২৫২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক হাদীসে তাঁর পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁর রীতি, পদ্ধতি বা কর্মের বাইরে কোনো কর্ম করলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর কর্মের বা আদর্শের বাইরে নব-উদ্ভাবিত কর্ম বা পদ্ধতিকে 'বিভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।"[২৫৩]

এ বিষয়ক আরো অনেক হাদীস আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা মূলনীতি হিসেবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম মুমিনের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর। জীবনের প্রতি বিষয়ে ও প্রতি কর্মেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ রয়েছে। আদেশ নিষেধ ছাড়াও তাঁর কর্মরীতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রতি বিষয়েই তাঁর কর্মরীতি অনুসরণ প্রয়োজন। অন্তত তাঁর কর্মরীতিকে অপছন্দ করার পর্যায়ে কোনো মুমিনই যেতে পারেন না। আনাস

বিন মালেক (রা.) বলেন :

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".

"তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর স্ত্রীগণের নিকট যেয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পবরর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত করা)। তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (রাতের বা তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব, কখনই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন: তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে (নফল) সিয়াম পালন করি, আবার মাঝেমাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি- স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[২৫৪]

এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা তাঁর রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও নিয়েছিলেন, তবে তাঁদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেক আমলের জন্য তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালনও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো পুরুষের প্রয়োজন না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির বাইরে বা অতিরিক্ত কোনো রীতির অনুসরণ করা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্ম করলে বোধহয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না। অবিকল সুন্নাত অনুসরণকারীর চেয়ে অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম রীতিটি তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে। মনে হতে পারে তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করার চেয়ে সারারাত এই মহান ইবাদতে মাশগুল থাকাই উত্তম। রাতের অনেকখানি সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি। আর একেই রাসূলুল্লাহ ﷺ 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন:

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"যখন উসমান বিন মাযউন (রা) দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন: আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি, কখনো করি না, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।"[২৫৫]

এ অর্থে অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমার আব্বা আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু ইবাদতের আগ্রহের কারণে আমি রাতদিন নামায রোযায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতাম না। তখন আমার আব্বা আমাকে অনেক রাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ... ثُمَّ قَالَ ﷺ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন সিয়াম পালন কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে সালাত আদায় কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে বাদ

দিই, রাতে সালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার স্থিতি-প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার স্থিতি-প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[২৫৬]

এখানে প্রশ্ন হলো, উপরের হাদীসগুলিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সুন্নাত অবহেলা করা' বা 'সুন্নাত অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করলেন কেন? আমরা সুনিশ্চিত যে, উপরের হাদীসগুলিতে উল্লেখিত সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা এমন কিছু করতে ইচ্ছা করেন নি যা ইসলামের নিষিদ্ধ। বরং তাঁরা কিছু নেক আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে পালন করতে আগ্রহ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কেন বারংবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করাকে 'তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করলেন এবং বললেন যে, যে তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করবে সে তাঁর উম্মাত নয় বা তাঁর সাথে সম্পর্কিত নয়?

বিষয়টি অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহ, বিদ'আতী আকীদা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় প্রসঙ্গে সুন্নাত বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে সুন্নাতের ব্যতিক্রমে ঈমানের বিচ্যুতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে নিম্নের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি:

(১) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন তা ততটুকু ও সেভাবে করাই সুন্নাত এবং তিনি যা করেন নি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত।

(২) তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতি ইসলামের অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে জরুরীও হতে পারে, তবে তা কখনোই দীনের অংশ হতে পারে না। তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রম, খেলাফ বা অতিরিক্ত কোনো কর্ম, রীতি বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ বলে মনে করা বা তা পালন না করলে দীন, বেলায়াত, ভক্তি, সাওয়াব বা আখিরাতের মর্যাদা সামান্য পরিমাণ ব্যাহত হবে বলে ধারণা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতি দীনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করা। এরই অর্থ সুন্নাত অপছন্দ করা। এরূপ বিশ্বাস পোষণ কারী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়। ফলে সে আর তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে না।

(৩) তাহাজ্জুদের সালাত কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত ফযীলতের ইবাদত। এ সকল সাধারণ দলীলের আলোকে বেশি বেশি তাহাজ্জুদ আদায় বা সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় নিষিদ্ধ নয়। কোনো আবিদ যদি ইবাদতের উদ্দীপনায় তা কখনো করেন তবে তা ক্ষতিকর নয়। তবে তার কর্মের স্থিতি ও নিয়মিত অবস্থান যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির ব্যতিক্রম হয় তবে তা ক্ষতিকর। কারণ এ পর্যায়ে তিনি 'সারারাত' তাহাজ্জুদ আয়ায়কে রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর চেয়ে অধিক ফযীলত বলে মনে করবেনই এবং বিভিন্ন দলিল দিয়ে নিজের এরূপ কর্মকে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে বাকি সময় তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকবেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় না করে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটান তার প্রতি তিনি কিছুটা হলেও কষ্ট বোধ করবেন এবং তাঁর বেলায়াত, সাওয়াব বা কামালাত কিছুটা হলেও অপূর্ণ বলে অনুভব করবেন। তার কাছে মনে হবে, এভাবে কিছু সময় ঘুমিনে নষ্ট না করে একটু কষ্ট করে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করলে আরো বেশি কামালাত তিনি অর্জন করতেন! এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ও রীতিকে 'অপূর্ণ' বলে মনে করলেন!! আর এই হলো সুন্নাত অপছন্দ করা।

(৪) সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম বা নেক কর্মের বা রীতির উন্মেষ, উৎপত্তি ও বিকাশ সাধারণত 'সুন্নাত অবহেলা করা' বা সুন্নাত অপছন্দ করা'-র কারণে হয় না, বরং ইসলাম নির্দেশিত ও সুন্নাত সম্মত নেক আমল বেশি করে পালনের জন্য এবং বেশি করে আল্লাহর পুরস্কার ও বরকত লাভের জন্যই তা হয়ে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সকল খেলাফে সুন্নাতই 'সুন্নাত অপছন্দ করার' পর্যায়ে চলে যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি।

(৫) ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দিত হওয়া, তাঁর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করা বা তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সম্মত ইবাদত। তবে এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী কয়েক শতকের মুসলিমগণের পদ্ধতি ছিল সাধারণ। মীলাদে নববীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্নাত পদ্ধতি ছিল সোমবার সিয়াম পালন করা। আর তাঁর জন্ম জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে যে যখন যেভাবে পেরেছেন তাঁর জন্ম, জীবনী, সীরাত, শামাইল ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। ৭ম হিজরী শতাব্দী থেকে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পদ্ধতি চালু হয়। কয়েক শতাব্দী পরে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটে।

(৬) মুসলিম্ উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল 'বিদ'আত' বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম। তাঁদের কেউ তা বিদ'আতে হাসানা এবং কেউ তা বিদ'আতে সাইয়েয়াহ বলে গণ্য করেছেন। যারা তা বিদ'আতে সাইয়েয়াহ বলেছেন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ, জন্ম, জীবনী, সীরাত-শামাইল আলোচনা ও দরুদ-সালাম পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেন নি। বরং তারা এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের তাকিদ দিয়েছেন। যারা একে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন তারাও এ সকল ইবাদত পালনের জন্য এ পদ্ধতিকে জরুরী বলে গণ্য করেন নি, বরং এ পদ্ধতিকে তারা জায়েয বা বৈধ বলে গণ্য করেছেন।

(৭) কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যারা ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন করেন তারা বিশেষ পদ্ধতিকে দীনের অবিচ্ছেদ্য

অংশ বলে গণ্য করেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে বা সাহাবীগণের মত সোমবারে সিয়াম পালন করেন, সর্বদা দরুদ-সালাম পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করেন, কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন না করেন তবে তারা কখনোই তাকে কামিল মুত্তাকি মুমিন বলে মনে করবেন না। তাদের মধ্যে কেউ মনে করবেন লোকটি ভাল, তবে আমাদের মত মীলাদ করলে আরো ভাল হতো। আর কেউ হয়ত বলবেন, যত কিছুই কর না কেন, মীলাদ পালন না করে জান্নাতে যেতে পারবে না। জেনে অথবা না জেনে তিনি 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বা 'মীলাদ মাহফিল'কেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ বলে গণ্য করছেন।

(৮) আরো লক্ষণীয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ সুন্নাতের ব্যতিক্রম, খিলাফে সুন্নাত বা 'বিদ'আত' কর্ম বা পদ্ধতির অনুসারী তার মধ্যে এরূপ কর্ম বা পদ্ধতির মুহাব্বত বা ভালবাসা সাধারণত সুন্নাতের ভালবাসার চেয়ে অনেক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। যিনি মীলাদ মাহফিল বা ঈদ মীলাদুন্নবী পালন করেন তিনি প্রতি সোমবারে সিয়াম পালন করে অথবা সাহাবীগণের পদ্ধতিতে সীরাত-শামাইল আলোচনা করে তত তৃপ্তি, হাল বা 'ফায়েয' লাভ করবেন না যতটা তৃপ্তি, হাল বা ফায়েয তিনি লাভ করবেন আনুষ্ঠানিক মীলাদ পালন করে। এভাবে তার মনের গভীরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে যে, হুবহু সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনে পূর্ণতা লাভ সম্ভব নয়।

(৯) খেলাফে সুন্নাতের প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসার একটি বিশেষ দিক এই যে, এরূপ কর্মই মুসলিম উম্মার দলাদলি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। যতদিন মীলাদের উদ্ভাবন হয় নি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হয় নি। বিষয়টি ছিল উন্মুক্ত। যে যখন যেভাবে পেরেছেন তা পালন করেছেন। ঈদে মীলাদুন্নবী এবং মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবনের পরে অনেক আলিমই এ বিষয়ক বিতর্ক হাল্কা করে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিভক্তি রোধ করা যায় নি। সাধারণভাবে 'মীলাদের পক্ষের ব্যক্তি' মীলাদকেই 'স্বদল' ও 'বেদলের' মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। যদি কেউ আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত পূর্ণভাবে পালন করেন কিন্তু মীলাদ না করেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি আরকানুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদতে অবহেলা করেন, কিন্তু মীলাদ পালনের পক্ষে থাকেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের মানুষ বলেই মনে করেন।

(১০) এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের জন্য, তাঁর জন্ম ও জীবনী আলোচনার জন্য বা তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের শেখানো ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বরং সুন্নাত পদ্ধতিটি অপূর্ণ বা অচল, নতুন পদ্ধতিতে তা পালন না করা পর্যন্ত মুমিন তার কামালাত, বেলায়াত বা সাওয়াবের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। আর এ-ই হলো 'সুন্নাত অপছন্দ করা'।

(১১) এভাবে দীনের যে বিষয়েই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক আমল বা নেক আমলের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেখানেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে দীনের অংশ বলে গণ্য হয়েছে এবং সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

(১২) এভাবে আমরা দেখছি যে, যত ভাল নিয়্যাতেই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম করা হোক চূড়ান্ত পর্যায়ে তা 'সুন্নাত অপছন্দ করা'র পর্যায়ে চলে যায়। আর বাহ্যত এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম নেক কর্ম করতে আপত্তি করেছেন। বরং সুন্নাত পালন না করলে যতটুকু আপত্তি করেছেন তার চেয়ে বেশি আপত্তি করেছেন সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে নেক কর্ম করলে। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ মোটেও আদায় করতেন না তিনি তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু ধমক দেন নি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে ইচ্ছা করেছেন তাকে ধমক দিয়েছেন। কারণ সাধারণভাবে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথচ এরূপ সম্ভাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রবল। বাহ্যত এজন্যই কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখালাফাত বা ব্যতিক্রম করতে এবং অগ্রবর্তী হতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এজন্য মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কর্মের, রীতির বা আদর্শের অতিরিক্ত, ব্যতিক্রম বা বিরোধী কোনো কর্ম, রীতি বা আদর্শ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ। আল্লাহর নৈকট্য, কামালাত, তাকওয়া, বেলায়াত, সাওয়াব বা জান্নাত লাভের জন্য তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করার অর্থ তাঁর রিসালাতের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করা। মুমিন হয়ত কোনো কারণে কোনো সুন্নাত পালনে অক্ষম হতে পারেন, অথবা বৈধ বা অবৈধ ওজরে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম করতে পারেন, তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রমকে তিনি কখনোই সুন্নাতের চেয়ে উত্তম, সুন্নাতের সমতুল্য, দীন, সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারেন না। মুমিন কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি তা না করলে তার দীনের কোনো ক্ষতি হবে বা অপূর্ণতা থাকবে।

৩. ২. ৯. তাঁর ভালবাসা

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এ বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালবাসবেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

"যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা ও সন্তান থেকে বেশি ভালবাসবে।"[২৫৭]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালবাসবে।"[২৫৮]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি তখন উমারের (রা) হাত ধরে ছিলেন। উমর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তখন তিনি বলেন,

لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الآنَ يَا عُمَرُ

"হলো না উমার, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। তখন উমার (রা) বলেনঃ আল্লাহর কসম, আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাঁ, উমর, এখন (তোমার ঈমান পূর্ণতা পেল)।"[২৫৯]

এখানে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালবাসা কোনো মুখের দাবির ব্যাপার নয়। তার নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তার শরীয়াতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই হলো তার মহব্বতের প্রকাশ। যে যত বেশী তার শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তার সুন্নাত মত জীবন যাপন করবেন, তার ভালবাসা তত বেশী গভীর হবে। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগ, ইমামগণ কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাকে ভালবেসেছেন।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসার অর্থ হলো তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল নবীর নেতা, সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তাঁর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা এবং সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে সম্মান দান করা, তাঁর জন্য বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা, তাঁর জীবনী, শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ ভালভাবে জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। এভাবেই মুসলিমের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখন জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে, সকল মানুষের উর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম। আমরা আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত অনুসরণের ও প্রকৃত ভালবাসার তাওফীক দান করেন। আমীন!

৩. ২. ১০. তাঁর আহলু বাইত ও সাহাবীগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরদেরকে, তাঁর উম্মাতকে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার প্রকাশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহলূ বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ২. ১০. ১. আহলু বাইত

কুরআনের আলোকে আমরা দেখি যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। এখানে কোনো বংশ, রক্ত, বর্ণ বা দেশের কোনো 'পবিত্রতা', 'অলৌকিকত্ব' বা বিশেষ অধিকার ঘোষণা করা হয় নি। হাদীসের শিক্ষাও অনরূপ। কুরআন কারীমে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয়।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, দীন পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের মানুষেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁকে ভালবাসা, সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অগ্রণী ছিলেন। এছাড়া কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়তার ভালবাসা রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

"বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।"[২৬০]

যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। এরপর তিনি ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ

أَمَّا بَعْدُ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي... ثلاثا.

"হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। .... এরপর তিনি বললেন : 'এবং আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে

রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"[২৬১]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَحِبُّوا اللَّهَ (لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ) وَأَحِبُّونِي (بِحُبِّ اللَّهِ) وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي (بِحُبِّي)

"তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার বাড়ির মানুষদের (পরিবার, বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে।"[২৬২]

৩. ২. ১০. ২. সাহাবীগণ

ইসলামের শত্রুগণ বাহ্যিক বিরোধিতা, যুদ্ধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে সক্ষম না হয়ে মুসলিম সেজে গোপনে ইসলামের মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্র রোধ করতে চেষ্টা করে। এ ছাড়া কোনো কোনো মুসলিম নিজের আবেগ তাড়িত উদ্দীপনায় অন্ধ হয়ে সাহাবীগণের মর্যাদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নেয়।

আমরা ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর ফিরকা ও দলাদলির বিষয়ে আলোচনার সময় দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর প্রথম দুটি বিভক্তি ও বিভ্রান্তি- খারিজীগণের বিভক্তি ও শিয়াগণের বিভক্তি- ছিল এ বিষয় কেন্দ্রিক। খারিজীগণ কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে ও পালন করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তার নিজেরা কুরআন পড়ে বা হাদীস পড়ে যা বুঝত তাই চূড়ান্ত ও সঠিক বুঝ বলে মনে করত এবং তাদের বুঝের বিপরীতে সাহাবীগণের বুঝকে বিভ্রান্তি ও কুফ্‌র বলে আখ্যায়িত করত।

অন্যদিকে শীয়াগণ ইহূদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। কারণ সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়; কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল ভিত্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের জামা'আত অনুসরণ করা। এ বিষয়ে আমরা কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা ইসলামী আকীদার উৎস অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ইফতিরাক বা বিভক্তি বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করছি।

(১) কুরআন কারীমে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক স্থানে স্পষ্টত তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[২৬৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফ্‌রী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"[২৬৪]

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: "মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[২৬৫]

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট 'বাইয়াত' গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[২৬৬]

তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন:

لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম।"[২৬৭]

(৪) মহান আল্লাহ কুরআনে মুমিনগণকে তিনভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"তাদের পরে যারা আগমন করল তার বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু।"[২৬৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৫) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ (فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ)، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।"[২৬৯]

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক পরিমান দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।"[২৭০]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন:

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তি আলোচনাকালে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' বিশ্বাস ও মূলনীতি বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

৩. ২. ১১. তাঁর মর্যাদা ও সম্মান

রিসালাতের সাক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মান করা। তিনি সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা।

অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মর্যাদা সবই তিনি লাভ করেছেন। তিনি নিষ্পাপ, মনোনীত ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও নবুয়তের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

"তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা-অনুগ্রহ রয়েছে।"[২৭১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلا إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

"ওহীর মাধ্যমে আমি তোমার প্রতি যা নাযিল করেছি তা আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, সে অবস্থায় তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী বা কর্মবিধায়ক পেতে না। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দয়া; নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ মহান।"[২৭২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি তো তোমাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্ব জগতের জন্য রহমত-রূপে।"[২৭৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেই নি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক। এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"[২৭৪]

তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[২৭৫]

তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্যকর এবং সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[২৭৬]

সকল মানুষের উর্ধ্বে তাঁর সম্মান। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

"মুমিনদের নিকট নবী তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের ঘনিষ্টতর।"[২৭৭]

এভাবে আল্লাহ সকলের উর্ধ্বে তাঁকে সম্মান দান করেছেন এবং কোনো ভাবে তাঁকে কষ্ট দান করা বা তার মনোকষ্টের কারণ হওয়া মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর বিশেষ মর্যদার অংশ হিসাবে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

"তোমাদের জন্য সংগত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নীদিগকে বিবাহ করবে। আল্লাহর নিকট তা ঘোরতর অপরাধ।"[২৭৮]

অন্যান্য সকল মানুষের থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করো না।"[২৭৯]

তাঁর সাথে আদব রক্ষার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"হে মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে জোরে কথা বল সেরূপ জোরে বা সশব্দে তাঁর সাথে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কার।"[২৮০]

পাঠক, চিন্তা করুন! কত বড় সাবধানতার প্রয়োজন! কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অগ্রণী হওয়া যাবে না। তাঁর কথার উপরে কথা বলা যাবে না। নিজেদের মতামত, যুক্তি, কর্ম, পছন্দ ইত্যাদি দিয়ে তাঁর আগে যাওয়া যাবে না। বরং মতামতে, কর্মে, ইবাদতে, দাওয়াতে, পছন্দে-অপছন্দে সকল বিষয়ে তাঁর পিছে থাকতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা যাবে না। তাঁর মত, কর্ম, রীতি, নির্দেশ কোনো কিছু মুমিনের নিকট পৌঁছালে মুমিন আর তার সামনে নিজের মতামত বা পছন্দ বিকল্প হিসেবে দাঁড় করান না। বরং নিজের মত ও পছন্দকে নীচু করে তাঁর মতকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। এ-ই ঈমানের দাবি। এ-ই আল্লাহর নির্দেশ। না হলে আমাদের বড় বড় কথা, মহা মহা কর্ম আমাদের অজান্তে-অজ্ঞাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে! কী করুণ পরিণতি!

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মর্যাদার কথা উম্মাতকে জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিজের অহংকার প্রকাশের জন্য নয়, উম্মাতকে তাদের বিশ্বাসের ও কর্মের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাদেরকে জানিয়েছেন। ইতোপূর্বে আমরা এ অর্থে কয়েকটি হাদীস দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন দিক থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অন্যান্য সকল নবী-রাসূল থেকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ বিষয়ক আরো কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে আলোচনা করব। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلا فَخْرَ

"মানুষ যখন কিয়ামতের সময় পুনরুত্থিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম বের হব, মানুষেরা যখন হাজিরা দেবে তখন আমিই তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করব এবং সেদিন আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার ঝাণ্ডা। আদম সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতিপালককে কাছে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত, আর এতে কোনো অহংকার নেই।"[২৮১]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ

"কিয়ামদের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুড়ে আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব, আমিই প্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে।"[২৮২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلا فَخْرَ

"কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, তবে এতে কোনো অহংকার নেই। আমার হাতেই প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে, তবে এতে কোনো অহংকার নেই। আদম থেকে শুরু করে যত নবী আছেন তারা সবাই আমার ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হবেন। আমিই প্রথম মাটি ফুড়ে পুনরুত্থিত হব, তবে এতে কোনো অহংকার নেই।[২৮৩]

তাঁর মর্যাদা সুপ্রাচীন। প্রথম মানব আদম (আ)-এর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তার জন্য নুবুওয়াত ও খাতিমুন্নাবিয়ীনের মর্যাদা সংরক্ষিত করেছেন। আবু হুরায়রা বলেন:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন: যখন আদম দেহ ও আত্মার মধ্যে ছিলেন।"[২৮৪]

ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ (بِأَوَّلِ ذَلِكَ) دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

"আদম যখন তাঁর কাদার মধ্যে ভূলুণ্ঠিত ছিলেন তখনই আমি আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফূযের মধ্যে সর্বশেষ নবী ছিলাম। আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম শুরুর কথা বলব: আমার পিতা ইব্রাহীমের (আ) দু'আ, ঈসার (আ) জাতিকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমার আম্মার স্বপ্ন; তিনি দেখতে পান যে তাঁর ভিতর থেকে একটি নূর (আলো) নির্গত হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহকে আলোকিত করে তোলে। এভাবেই নবীগণের (আ) মায়েরা দেখেন।"[২৮৫]

আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ

"নিশ্চয় আল্লাহ নবীগণের উপরে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।"[২৮৬]

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ওসীলা, মাকাম মাহমূদ ও শাফা'আত-এর মর্যাদা প্রদান করবেন। ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য। এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহর নিকটতম ও সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানকে "ওসীলা" বলা হয়, যা মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রদান করবেন। আমর ইবনূল আস (রা) এবং আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন;

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ (في حديث الترمذي وأبي داود: أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ) لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে (তার আযান) শুনবে তখন সে যেরূপ বলে সেরূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে আল্লাহ তাঁর উপর দশবার রহমত করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে। ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্তবা (তিরমিযী ও আবূ দাউদের বর্ণনায়: জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা) যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউ লাভ করবে না। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে তার জন্য শাফা'আত প্রাপ্য হবে।"[২৮৭]

মাকাম মাহমূদ অর্থ প্রশংসিত অবস্থান, যে অবস্থানে সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এ তোমার জন্য অতিরিক্ত, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন 'মাকামে মাহমূদে' বা প্রশংশিত স্থানে।"[২৮৮]

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, 'মাকাম মুহামদ' বলতে কিয়ামদের দিন মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আতের মাকাম।

৩. ২. ১২. তাঁর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ

মুসলিমের দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঠিক মর্যাদা নিরূপনে এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা অবগত হওয়া মুমিনের ঈমানের অংশ ও মৌলিক বিষয়। সকল মুমিনের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সমান। কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বিষয়টি আল্লাহ কুরআন কারীমে সহজভাবে সকলের বোধগম্য করেই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি তাঁর সাহাবীগণকে জানিয়েছেন। তাঁরাও মুমিনের ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য এভাবেই গুরুত্বের সাথে তা তাবিয়ীগণকে শিখিয়েছেন। এভাবে বিষয়গুলি অবশ্যই কুরআনে বা মুতাওয়াতির-মাশহূর সহীহ হাদীস সমূহে স্পষ্ট ও সর্বজনবোধগম্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও

আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শেখান হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তাঁর ব্যাপারে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ আমরা বা উম্মাতের আলিমগণ যা কিছুই বলেন না কেন সবই মানবীয় ইজতিহাদ। আর বিশ্বাস ও আকীদার ভিত্তি ওহী। মানবীয় কথাকে ওহীর সাথে সংমিশ্রণ করলে বা ওহীর মর্যাদা দিলে সীমালঙ্ঘন ঘটতে পারে।

পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাত এরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘনের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে বলে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারি। নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদেরকে ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালঙ্ঘন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারের উপরে বক্তৃতায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

"খৃস্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না। আমি তো তাঁর বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[২৮৯]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। বাড়াবাড়ির অর্থ হলো তাঁর বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু বড়িয়ে বলা যা তিনি আমাদেরকে বলেন নি। তিনি খৃস্টানদের বাড়াবাড়ির দিকে উম্মাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ খৃস্টানদের এই বাড়াবাড়ির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ

"হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না 'তিন'...।[২৯০]

ঈসা (আ)-এর বিষয়ে খৃস্টানদের বাড়াবাড়ির স্বরূপ ছিল তাঁর বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া এ সকল বিশেষণকে বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির অপচেষ্টা করা। আল্লাহ তাঁর বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি 'আল্লাহর কালিমা' এবং 'আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ'। 'কালিমাতুল্লাহ', 'রূহুল্লাহ' ইত্যাদি শব্দ শুনে কিছু ভক্তের মনে যে অতিভক্তির প্লাবন তৈরি হয়, সেগুলিই ক্রমান্বয়ে ভয়ানক শিরকে পরিণত হয়। তারা দাবি করেন যে, আল্লাহর কালিমা আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ যা তাঁর সত্তার অংশ ও তাঁরই মত অনাদি, সেহেতু 'ঈসা' (আ) আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ। আর আল্লাহর রূহ আল্লাহরই সত্তার অংশ। এভাবে তারা দাবি করে যে, ঈশ্বরের সত্তার তিনটি ব্যক্তিত্ব 'আল্লাহ বা 'পিতা', কালিমাতুল্লাহ বা ইবনুল্লাহ অর্থাৎ পুত্র এবং রূহুল্লাহ বা পবিত্রআত্মা। এ তিন ব্যক্তি সমন্বয়ে এক ঈশ্বর (নাঊযু বিল্লাহ)।

তাদের এ ব্যাখ্যাভিত্তিক আকীদা বাইবেলের কোথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি। বরং বাইবেলের অগণিত নির্দেশনা এর সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। তারা তাদের এরূপ ব্যাখ্যাভিত্তিক মতামতকে মূল আকীদা হিসেবে গ্রহণ করে এর সাথে সাংঘর্ষিক তাওরাত ও ইঞ্জিলের তাওহীদ বিষয়ক ও ঈসা (আ)-এর মনুষ্যত্ব বিষয়ক অগণিত সুস্পষ্ট আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে। এ সকল অপব্যাখ্যা গেলানোর জন্য অনেক দার্শনিক যুক্তি পেশ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে ঈসা (আ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন, ঈসার (আ) বিষয়ে আল্লাহ যতটুকু বলেছেন তোমরা ততটুকুই বল, কারণ ততটুকুই হক্ক ও সত্য। তার অতিরিক্ত বলো না, কারণ ব্যাখ্যা তাফসীরের নামে তোমরা যা বলছ তা বাতিল ও অসত্য। তোমরা তাঁকে কালিমাতুল্লাহ এবং রূহুল্লাহ বল, তবে কালিমাতুল্লাহ বা রূহুল্লাহর ব্যাখ্যা করে বাড়িয়ে কিছু বলো না। অন্যত্র আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বাড়াবাড়ির পিছনে রয়েছে কতিপয় 'পণ্ডিতের' প্রতি পরবর্তীদের অন্ধ ভক্তি ও তাদের অন্ধ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের মর্জিমাফিক মতামতের অনুসরণ করো না।"[২৯১]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খৃস্টানগণের অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ির স্বরূপ ছিল ওহীর মধ্যকার কতিপয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দের অতিভক্তিমূলক অর্থকে দীনের ও আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ঈসা (আ)-এর বিষয়ে ওহীর বাইরে অতিরিক্ত গুণাবলি আরোপ করা এবং সেগুলির বিপরীতে অগণিত দ্ব্যর্থহীন ওহীর বাণীকে ব্যাখ্যা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে তাঁর বিষয়ে কি বলতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে আল্লাহ দুটি মূল বিশেষণে বিশেষিত করেছেন: আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল। তোমরা আমার বিষয়ে এরূপই বলবে। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কুরআনে বা হাদীসে তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছে হুবহু তাই আমাদেরকে

বলতে হবে। এগুলিকে ব্যাখ্যা করা বা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এগুলির সাথে আরো কিছু কথা যোগ করা আমাদেরকে বাড়াবাড়ির পথে নিয়ে যেতে পারে।

উপরের হাদীসের ন্যায় অন্যান্য অনেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর প্রশংসা বা ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে এবং ওহীর ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلا قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা (সাইয়েদ), আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মধ্যে সর্বত্তোম, আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমি ভালবাসি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তোমরা আমাকে তার ঊর্ধ্বে ওঠাবে।"[২৯২]

অর্থাৎ শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার মাধ্যমে অনেককে সে বিভ্রান্ত করে। আবার তাঁদের ভক্তি ও প্রশংসায় সীমা লঙ্ঘন করিয়েও শয়তান অনেককে বিভ্রান্ত করে। কাজেই সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান অনেক সময় কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, নবী-রাসূলকে বেশি প্রশংসা করলে বা ভক্তি করলে তিনি হয়ত খুশি হবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, এরূপ ভক্তি বা প্রশংসায় তিনি খুশি হন না। বরং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তিনি খুশি হন।

এখানে লক্ষণীয় যে, উপর্যুক্ত হাদীসে বক্তা সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সবই সত্য ও সেগুলি বলা ইসলামে কোনোভাবেই আপত্তিকর নয়। তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাঁকে যে বিশেষ দুটি পদমর্যাদা প্রদান করেছেন তার বাইরে কিছু ব্যবহার করা অপছন্দ করছেন। বাহ্যত তিনি বাড়াবড়ির দরজা বন্দ করতে চেয়েছেন।

এ অর্থের অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর (রা) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّيِّدُ اللَّهُ قَالَ أَنْتَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَوْلا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طَوْلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطَانُ

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, আপনি কুরাইশদের নেতা বা প্রধান (সাইয়েদ)। তিনি বলেন নেতা বা প্রধান (সাইয়েদ) তো আল্লাহ। লোকটি বলে: আমাদের মধ্যে কথায় আপনিই সর্বোত্তম এবং মহত্বে-মর্যাদায় আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কথা বলতে চাইলে বলুক, তবে শয়তান যেন তাকে টেনে নিয়ে না যায়।"[২৯৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো মানুষকে সাইয়েদ (নেতা বা প্রধান) বলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সাহাবীগণ একে অপরকে কখনো কখনো 'সাইয়েদুনা' (আমাদের নেতা) বলে উল্লেখ করেছেন। এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি।[২৯৪] পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক আসগার বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাসদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মনিব বা মালিককে রাব্ব (প্রভু) না বলে সাইয়েদ (নেতা) বলে ডাকতে। এতদসেত্বও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের বিষয়ে 'সাইয়েদ' শব্দ ব্যবহার করতে আপত্তি করছেন। বাহ্যত তিনি এ বিষয়ে বাড়াবাড়ির দরজা বন্ধ করতে চেয়েছেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর বিষয়ে যে শব্দ ও উপাধি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উম্মাতকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ওহীর ব্যবহৃত শব্দ আর মানবীয় আবেগ-বিবেকের ভিত্তিতে ভাষাজ্ঞানের আলোকে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ঈমানের জগতে অনেক পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলী (রা) বলেন,

أَحِبُّوْنَا بِحُبِّ الإِسْلاَمِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ حَقِّيْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى اتَّخَذَنِيْ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِيْ رَسُوْلاً

"তোমরা আমাদেরকে ইসলামের ভালবাসায় ভালবাসবে; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে আমার প্রাপ্যের উপরে উঠাবে না; কারণ আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার আগেই আমাকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[২৯৫]

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভক্তি ও মর্যাদা প্রদান আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও ঈমানের অন্যতম দাবি। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, শয়তান বিভিন্ন ভাবে মানুষকে অবিশ্বাসের ন্যায় অতিভক্তির মাধ্যমেও বিভ্রান্ত করতে পারে। এজন্য আমাদেরকে ওহীর হুবহু অনুসরণ করতে হবে।

এছাড়া আরো বুঝতে হবে যে, বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস

ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তির আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁর উম্মাতের মধ্যেও পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীদের যুগ এবং মুসলিম উম্মাহর সোনালী যুগগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বিষয়ে ওহীর নির্দেশ লঙ্ঘন ও ওহীর সাথে বিভিন্ন ব্যাখ্যা যোগ করে আকীদা তৈরির প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো আলিম মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে ওহীর একটি বক্তব্যের নিজের পছন্দমত অর্থকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বিকৃত বা বাতিল করেন এবং ওহীর অতিরিক্ত এবং সাহাবীগণের বক্তব্যের ব্যতিক্রম অনেক বিষয়কে আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি:

৩. ২. ১২. ১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক

কুরআন-হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদের মতই মানুষ। আবার কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেক মুজিযা, অলৌকিক কর্ম, ও অলৌকিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়-তাবিতাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি। তাঁরা সর্বান্তকরণে সকল আয়াত ও হাদীসকে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। তিনি মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে মহান আল্লাহ তাকে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে দুটি মতবাদ তৈরি হয়, যারা এক অর্থের আয়াত ও হাদীসকে অন্য অর্থের আয়াত ও হাদীসের বিপরীত বা সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এবং একটি অর্থকে বিশ্বাস করার নাম করে অন্য অর্থের সকল আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেয়।

প্রথম মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতকের মু'তাযিলা ও সমমনা ফিরকাসমূহের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং পরবর্তীকালে দার্শনিক ও আধুনিক যুগে কোনো কোনো পাশ্চাত্যপন্থী পণ্ডিতের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলিকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর অলৌকিকত্ব বিষয় আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের আকীদার মূল এই যে, তিনি একান্তই অন্য সকলের মত মানুষ ছিলেন, তিনি কুরআন ছাড়া অন্য কোনো মুজিযা দেখান নি এবং তাঁর কোনো অলৌকিক বৈশিষ্ট্যও ছিল না। এ বিষয়ক যে সকল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অমুক বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর মুজিযা বিষয়ক ও তাঁর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির এমন ব্যাখ্যা করেন যে তাতে প্রকৃত পক্ষে তা সবই অস্বীকার করা হয়।

অন্য মতটি অনেক পরে জন্মলাভ করে। ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা, অলৌকিক কর্ম ও অলৌকিক বৈশিষ্টাবলি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এগুলির ভিত্তিতে তারা তাঁরা বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের মতামতের মূল কথা এই যে, তিনি মূলত বাশার বা মানুষ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অলৌকিক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একান্তই রূপক অর্থে বা দাওয়াতের প্রয়োজনে তাকে মানুষ বলা হয়েছে। তার মানবত্ব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসগুলির অমুক বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর বাশারিয়্যাত বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, সেগুলি মূলত সবই বাতিল হয়ে যায়।

আমরা এখানে এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি আলোচনা করব।

'বাশার' (**بَشَــرٌ**) অর্থ মানুষ, মানুষগণ বা মানুষজাতি (man, human being, men, mankind)। কুরআন কারীমে প্রায় ৪০ স্থানে 'বাশার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই একই অর্থে। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা দেখব যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাও'আত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের প্রধান দাবি ছিল যে, নবীগণ তো 'মানুষ' মাত্র, এরা আল্লাহর নবী হতে পারেন না। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতেই চাইতেন তবে ফিরিশতা পাঠিয়ে দিতেন। যেহেতু এরা মানুষ সেহেতু এদের নুবুওয়াতের দাবি মিথ্যা। এদের কথার প্রতিবাদে নবীগণ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, 'আমরা তোমাদের মত মানুষ' এ কথা ঠিক, তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ হলে আল্লাহর ওহী ও নুবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা যায় না। বরং আল্লাহ মানুষদের মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছ নবী বা রাসূল হিসেবে বেছে নেন এবং মানবত্বের সাথেই তাকে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও ওহী প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়েও কুরআনে একথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বাশার' বা মানুষ। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি 'অন্যদের মত মানুষ'। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولا

“এবং তারা বলে, ‘কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে একটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত করবেন। অথবা আপনার একটি খেজুরের ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে আপনি নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবেন, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করবেন। অথবা আপনার একটি অলংকৃত স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে। অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন, তবে আমরা আপনার আকাশ আরোহণে কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের (আসমান থেকে) একটি কিতাব অবতীর্ণ করবেন যা আমরা পাঠ করব।’ বল, ‘পবিত্র আমার প্রতিপালক (সুবহানাল্লাহ!)! আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ, একজন রাসূল। আর মানুষের কাছে যখন হেদায়েতের বানী আসে তখন তো তারা শুধু একথা বলে ঈমান আনয়ন করা থেকে বিরত থাকে যে, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?!”[২৯৬]

অর্থাৎ কাফিরদের দাবি যে, আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতার কিছু অংশ লাভ করা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ জানালেন যে, রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর নিদের্শ অনুসারে প্রচারের দায়িত্ব লাভ, ক্ষমতা লাভ নয়; ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“বল: ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ (উপাস্য) একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।”[২৯৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

“বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব তোমরা তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর। যারা শির্কে লিপ্ত তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।”[২৯৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার তাঁর উম্মতকে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা তাঁর উম্মতরক জানিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে বারবার তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, তিনি একজন মানুষ।

এক হাদীসে নবী-পত্নী উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

“আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে মানুষেরা আসে। বাদী ও বিবাদীর মধ্য থেকে একজন হয়ত অধিকতর বাকপটু হয়, ফলে তাকে সত্যবাদী মনে করে হয়ত আমি তার পক্ষেই বিচার করি। যদি আমি ভুল করে একের সম্পদ অন্যের পক্ষে বিচার করে দিই, তবে সে সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। বরং তা হবে তার জন্য আগুনের একটি পিণ্ড, তার ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক, আর ইচ্ছা হলে তা পরিত্যাগ করুক।”[২৯৯]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে ভুল করেন। সালামের পরে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতের কি কোনো নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন: তোমরা এ প্রশ্ন করছ কেন? তারা বলেন: আপনি এমন এমন করেছেন। তখন তিনি সালাত পূর্ণ করেন এবং বলেন:

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

“সালাতের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন ভুল কর আমিও তেমনি ভুল করি। যদি আমি কখনো ভুল করি তবে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দেবে।”[৩০০]

রাফি ইবনু খাদীজ (রা) বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলেন তখন মদীনার মুসলমানেরা খেজুরের মাওসুমের শুরুতে পুরুষ খেজুরের রেণুর সাথে স্ত্রী খেজুরের রেণু মেলাতেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন: আমরা সবসময় এভাবে করে আসছি। তিনি বলেন: এ না করলেই বোধহয় ভাল হবে। তখন তারা তা ত্যাগ করেন, ফলে সে বৎসর খেজুরের উৎপাদন কম হয়। তখন তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

"আমি তো একজন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দান করব, তখন তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি আমি কোনো জাগতিক বিষয়ে আমার ধারণা বা মতামত বলি তবে তো আমি একজন মানুষ মাত্র।"[৩০১]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন:

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'জন লোক আসেন। তারা কি বলেন আমি জানি না, তবে তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন। তিনি তাদেরকে গালি দেন এবং বদ দোয়া করেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই দুইজন লোক কখনো কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন: কেন? আমি বললাম: কারণ আপনি তাদেরকে গালি দিয়েছেন এবং বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন: তুমি কি জান না আমার প্রতিপালকের সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে? আমি তো আল্লাহকে বলেছি: 'হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তাই যদি কোনো মুসলিমকে আমি কখনো বদদোয়া করি বা গালি দিই, তাহলে আপনি তা সেই ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা ও সওয়াব বানিয়ে দেবেন।"[৩০২]

উপরের অর্থে আবূ হুরাইরা, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনু মালিক, আবু বাক্রাহ ও অন্যান্য সাহাবী (ﷺ) থেকে অনেক হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এ সকল আয়াত ও হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক মুজিযা ও বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও অন্যান্য মুজিযা বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে অনেক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন যা কোনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। এগুলিকে আরবীতে 'খাসাইস' বা 'বৈশিষ্ট্যসমূহ' বলা হয। ইতোপূর্বে তার মর্যাদা বিষয়ক হাদীসগুলিতে তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যেভাবে সামনের দিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুসমূহ দেখে তিনি অনুরূপভাবে পিছনদিকেও দেখতেন[৩০৩], তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকত[৩০৪], সাধারণ মানুষের মত তার শরীরে ঘামে কোনো দুর্গন্ধ ছিলনা, বরং তার শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধ, সাহাবীগণ যা আতর হিসেবে ব্যবহার করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন।[৩০৫] এ ছাড়া আরো অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান মর্যাদার একটি দিক যে, মহান আল্লাহ তাকে 'সিরাজুম মুনীর': 'জ্যোতির্ময় প্রদীপ' বা 'নূর-প্রদানকারী প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকোজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।"[৩০৬]

আমরা কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনায় দেখব যে, মহান আল্লাহ বারংবার কুরআন কারীমকে 'নূর' বা জ্যোতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো কোনো স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' এর কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা 'আল্লাহর নূর' ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ 'তাঁর নূর' পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"[৩০৭]

এখানে 'আল্লাহর নূর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

এখানে 'আল্লাহর নূরের' ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। ইবনু আব্বাস ও ইবনু যাইদ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। সুদ্দী এ কথা বলেছেন। (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ), কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায়। দাহ্হাক এ কথা বলেছেন। (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায়। ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন। (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য। অর্থাৎ ফুৎকারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা

করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত। ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন।[৩০৮]

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' বলা হয়েছে এবং সেখানে নূর অর্থ 'কুরআন', 'ইসলাম' 'মুহাম্মাদ (ﷺ)' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাস্সিরগণ[৩০৯]। এরূপ এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

يَاأَهْلَ الْكِـتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُـبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِـيـرٍ قَـدْ جَـاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيــنٌ

"হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।"[৩১০]

এই আয়াতে 'নূর' বা জ্যোতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)।[৩১১]

এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যারা 'নূর' অর্থ ইসলাম বলেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআন কারীমে অনেক স্থানে 'নূর' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।[৩১২]

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে 'কুরআন কারীমকে' বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে এবং 'স্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিশেষণ একত্রিত করা হয়েছে।[৩১৩]

যারা এখানে 'নূর' অর্থ 'মুহাম্মাদ (ﷺ) বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)- কে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন,

يعني بالنور محمدا ﷺ الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب.

"নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, যাঁর দ্বারা আল্লাহ হক্ক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শিরককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো। তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর হক্ককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহূদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।"[৩১৪]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী, হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্ট। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ, ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, 'জড়', ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মূর্ত 'আলো' নয়। এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

কিন্তু ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বা মাটির মানুষ নন; রবং প্রকৃতপক্ষে তিনি নূর এবং নূরেরই তৈরি। এরপর কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন, যদি কেউ তাঁর নূর থেকে তৈরি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বা তাকে মানুষ বলে বা মাটির মানুষ বলে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। তাঁরা উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্যকে তাদের দাবির পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এছাড়া আরো দু প্রকারের দলিল তারা পেশ করেন:

(১) নূর-মুহাম্মাদী (ﷺ) বিষয়ক 'হাদীস' নামে প্রচারিত কিছ কথা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ 'নূর' থেকে বা 'আল্লাহর নূর' থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থে প্রচারিত কিছু সনদ-বিহীন ভিত্তিহীন বা জাল বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয়। যেমন বলা হয় যে, জাবির (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَوَّلُ مَا خَـلَـقَ اللهُ نُـوْرَ نَبِيِّـكَ مِـنْ نُـوْرِهِ....

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।"

এরপর এই লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয় ।....

হাদীস নামে কথিত এ কথাগুলি কোনো একটি হাদীসের গ্রন্থেও সনদ-সহ পাওয়া যায় না । প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থ, বা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তো দূরের কথা পরবর্তী যুগগুলিতে সংকলিত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন-গ্রন্থগুলিতেও এর কোনো উল্লেখ নেই । সপ্তম হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস বা সীরাতের গ্রন্থে এর সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় না । "হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে, দশম-একাদশ হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি আব্দুর রায্যাক সান'আনী তার মুসান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, বাইহাকী তা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এ দু আলিমের কোনো গ্রন্থের কোথাও এ হাদীসটির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না । দশম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম সুয়ূতী স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য ।[৩১৫]

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ আরবীয় সূফী গবেষক মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক আল-গুমারী সুয়ূতীর এ কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, সুয়ূতী এ হাদীসটিকে 'অনির্ভরযোগ্য' বলে এর অবস্থা সঠিকভাবে জানাতে পারেন নি, বরং তাঁর বলা দরকার ছিল যে, 'হাদীসটি সন্দেহাতীতভাবে জাল' । তিনি বলেন: "ইমাম সুয়ূতীর এ কথাটি আপত্তিকর অবহেলা । বরং হাদীসটি সুস্পষ্টতই জাল বা বানোয়াট । এর ভাষা ও অর্থ আপত্তিকর । হাদীসটি আব্দুর রায্যাক উদ্ধৃত করেছেন বলে সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন । অথচ আব্দুর রায্যাক সান'আনী রচিত 'আল-মুসান্নাফ', 'তাফসীর' এবং 'আল-জামি' কোনো গ্রন্থেই হাদীসটির অস্তিত্ব নেই । এর চেয়েও অবাক বিষয় মরোক্কোর শানকীত এলাকার কোনো কোনো আলিম আব্দুর রায্যাকের নামে আব্দুর রায্যাক থেকে জাবির পর্যন্ত এর একটি সনদও বানিয়েছেন । আল্লাহ জানেন যে, এ সবই ভিত্তিহীন কথা । জাবির (রা) কখনোই এ হাদীস বর্ণনা করেন নি এবং আব্দুর রায্যাকও এ হাদীসটি কখনো শুনেন নি । প্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি হলেন ইবনু আরাবী হাতিমী (৬৩৮ হি) । ... আমি জানি না তিনি কোথা থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন । অবশ্যই কোনো সূফী দরবেশ হাদীসটি বানিয়েছে ।"[৩১৬]

এ 'হাদীস' এবং 'নূর মুহাম্মাদী' বিষয়ক অন্যান্য 'হাদীস'-এর সনদের অবস্থা আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । যে কোনো বিবেকবান আলিম স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নূর দ্বারা তৈরি বিষয়ক একটি হাদীসও কোনো সহীহ বা হাসান সনদ তো দূরের কথা আলোচনা করার মত যয়ীফ সনদেও বর্ণিত হয় নি । হাদীসের কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না । এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত সবই হয় সনদবিহীন প্রচলিত কথা অথবা মুহাদ্দিসগনের ঐকমত্যে জাল ও বানোয়াট কথা ।

(২) এ বিষয়ে গত কয়েক শতাব্দীর কোনো কোনো আলিমের মত

এ বিষয়ে হাদীস নামে কথিত কথাগুলি ইসলামের প্রথম ৫/৬ শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয় নি । গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ হাদীস বলে কথিত বক্তব্যগুলি প্রচারিত হওয়ার পরে অনেক আলিম এগুলির সনদ সম্পর্কে খোঁজাখুজি না করে সাধারণভাবে এগুলির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন । এ সকল ব্যাখ্যা বা মতামতকে এ মতের স্বপক্ষে 'দলিল' হিসেবে পেশ করা হয় ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর থেকে সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে এ বিতর্কটি একেবারেই কৃত্রিমভাবে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইসলামের প্রথম অর্ধ-সহস্র বৎসর যাবৎ বিষয়টি আকীদার অন্তর্ভূক্ত হওয়া তো দূরের কথা মুসলিম উম্মাহর সাধারণ আলোচনার বিষয়ও ছিল না । এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহর ''আব্দ'' বা বান্দা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং 'আল্লাহর বান্দা' বলতে মানুষকে বুঝানো হয় । তাই এই বিশ্বাসের সরল অর্থ এই যে, তিনি মানুষদেরই একজন । তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে তিনি মানবতার ঊর্ধ্বে উঠেন নি ।

(২) কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তাঁর আবদিয়্যাত (দাসত্ব) ও বাশারিয়্যাত (মানবত্ব)-এর কথা বারংবার সুস্পষ্টরূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এর বিপরীতে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলনু 'আমি নূর' । কোথাও বলা হয় নি যে, 'মুহাম্মাদ নূর' । শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তোমাদের কাছে 'নূর' এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে । এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্সির একথা বলেছেন ।

(৩) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের উর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম । সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা । পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া । আব্দিয়্যারেত ও বাশারিয়্যাতের ওজুহাতে মুজিযা ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি । অনুরূপভাবে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত-হাদীস বা এ বিষয়ক বানোয়াট কথা বা আলিমদের মতামতের ভিত্তিতে আবদিয়্যাত বা বাশারিয়্যাত অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা বা কুরআন-হাদীসে যে কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি সে কথাকে বিশ্বাসের অংশ বানানোও অনুরূপ বিভ্রান্তি ।

(৪) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই

বুঝতে পারছেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাস্সিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব।

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা 'কুরআন'-কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে স্পষ্টত 'কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তাঁর বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাঁকে নূর বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে নুবুওয়াতের নূর বিদ্যমান ছিল।

(৫) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি 'হাকীকতে' বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই তাঁকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

(৬) 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-নূরের তৈরি' বলে বিশ্বাস করাকে ঈমানের অংশ বানানো, অথবা এ কথা অস্বীকার করাকে কুফরী বলে গণ্য করা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা। যে কথা কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয় নি, যে কথা স্পষ্টভাবে কোনো মুতাওয়াতির হাদীস তো দূরের কথা কোনো সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি, সে কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে সকল সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করা এবং কুফরী ফাতওয়া দেওয়া বিভ্রান্ত সম্প্রদায়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমরা দেখব, ইনশা আল্লাহ।

(৭) বস্তুত নূরের তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা আছে বলে মনে করাই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। সৃষ্টির মর্যাদা তার সৃষ্টির উপাদানে নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদায় এবং তার নিজের কর্মে। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিম নূরের তৈরি ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরি মানুষকে অধিক মর্যাদাশালী বলে গণ্য করেছেন।

এভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতিতে তিনি অন্য সবার মতই মানুষ। তার মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে ও তাঁর মহোত্তম চরিত্রে। উপাদানে, সৃষ্টিগত প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও যে তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসায় ও ইবাদতে অবিচল, অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন, তাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব ছাড়াও অনেক অলৌকিক বা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তাঁর যে সকল অতিমানবীয় বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। এর বাইরে কোনো অতিমানবীয় গুণাবলী তারা তাঁর প্রতি আরোপ করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে কথা যতটুকু বলা হয়েছে সে কথা ততটুকু বললেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করা হয়। মানবীয় যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. ২. ১২. ২. তাঁর ইলম বিষয়ক বিতর্ক

উপরের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাইবী জ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক। কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র অদৃশ্য বা গাইবী ইলমের অধিকারী বা 'আলিমুল গাইব'। তিনি ছাড়া কেউ গাইবী ইলমের অধিকারী নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইলমুল গাইব জানতেন না। কেবলমাত্র যে জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আসত তিনি তাই অনুসরণ করতেন ও প্রচার করতেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইব বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[৩১৭]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না।"[৩১৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِع

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গাইব তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা!"[৩১৯]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে।"[৩২০]

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণীই জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।"[৩২১]

এভাবে কুরআন কারীমে বহু স্থানে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে গাইবের বিষয় ও ভবিষ্যতের বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কোনো প্রাণীই নয়। এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যতটুকু জানিয়েছেন এর অতিরিক্ত কোনো গাইবী জ্ঞান নবীগণের ছিল না। ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ফিরিশতাগণ এসেছেন তিনি চিনতে পারেন নি। অনুরূপভাবে লূত, দাঊদ, সুলাইমান, মূসা, ইয়াকূব, ঈসা (আ) সকলের ক্ষেত্রেই বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল নবী-রাসূলগণের বিষয়ে একত্রে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

"যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমারা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই, তুমিই তো অদৃশ্য সম্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৩২২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন না বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

"তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।"[৩২৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ

"বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই অনুসরণ করি।"[৩২৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।"[৩২৫]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ

"বল, আমি তো প্রথম রাসূল নই। আর আমি জানি না, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমি আমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয় কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করি। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।"[৩২৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ আরো বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

"এবং আমি তো তোমাকে কেবল বিশ্ব-জগতের রহমত-রূপেই প্রেরণ করেছি। বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র একজনই, অতএব তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হয়ে যাও। আর যদি তারা (আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা শীঘ্রই আসবে না দেরী করে আসবে তা আমি জানি না। নিশ্চয় আল্লাহ যা কথায় ব্যক্ত করা হয় এবং যা তোমরা গোপন কর তা সব জানেন। আর আমি জানি না, হয়ত তা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের বিষয়।"[৩২৭]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

"মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি।"[৩২৮]

لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন।"[৩২৯]

সাহাবী মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রা) বলেন,

إِنَّ نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ ضَلَّتْ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ اللَّصِيْتِ: يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ نَاقَتُهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ رَجُلاً يَقُوْلُ كَذَا وكَذَا، وَإِنِّيْ وَاللهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَقَدْ دَلَّنِي اللهُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِيْ شِعْبِ كَذَا قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ فَذَهَبُوا فَجَاءُوْهُ بِهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি উটনী হারিয়ে যায়। তখন যাইদ ইবনুল লাসীত নামক একব্যক্তি বলে, মুহাম্মাদ (ﷺ) দাবি করেন যে, তিনি নবী এবং তোমাদেরকে তিনি আকাশের খবর বলেন, অথচ তাঁর নিজের উটটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন না! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলেছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে যা জানান তা ছাড়া আমি কিছুই জানি না। আল্লাহ আমাকে উটনীটির বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেটি অমুক প্রান্তরে অমুক গাছের সাথে আটকে আছে। তখন তারা তথায় যেয়ে উটনীটি নিয়ে আসেন।"[৩৩০]

এ হাদীস উল্লেখ করে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

فان بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي ﷺ على جميع المغيبات ... فاعلم النبي ﷺ أنه لا يعلم من الغيب الا ما علمه الله

"যাদের ঈমান পূর্ণ হয় নি এরূপ কেউ কেউ ধারণা করত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইলমুল গাইব জানেন। এমনকি তারা মনে করত যে, নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য নবীকে সকল গাইব জানতে হবে। .... এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ যা জানান তা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না।"[৩৩১]

সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ বুজুর্গ সাহাবী ছিলেন উসমান ইবনু মাযঊন (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-ভাই ছিলেন এবং জাহিলী যুগেও তিনি মদপান বা মুর্তিপূজা করেন নি। তিনি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন। মহিলা সাহাবী উম্মুল আলা উসমান ইবনু মাযঊনের (রা) ওফাতের পরের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قَالَتْ قُلْتُ (لا أَدْرِي) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ

"তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আবুস সাইব (উসমান ইবনু মাযঊন) আমি আপনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন, আমি তো জানি না, তবে তাঁকে যদি আল্লাহ সম্মানিত না করেন তবে আর কাকে করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম, তার কাছে একীন এসেছে, আল্লাহর কসম, আমি তার বিষযে ভাল আশা করি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল, আমিও জানি না যে, আমার বিষয়ে কি করা হবে।' উম্মুল আলা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কাউকে ভাল বলি না।"[৩৩২]

মহিলা সাহাবী রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয বলেন:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَتَانِ ... وَتَقُولانِ فِيمَا تَقُولانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ

"আমার বিবাহের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমার কাছে দ'জন বালিকা বসে গীত গাচ্ছিল। তারা তাদের কথার মাঝে মাঝে বলছিল: 'আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছেন যিনি আগামীকাল (অর্থাৎ ভবিষ্যতে) কি আছে তা জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন: 'এ কথা বলো না, আগামীতে (ভবিষ্যতে) কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।"[৩৩৩]

আয়েশা, উম্মু সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইবনু সা'দ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (ﷺ) থেকে অনেকগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে:

إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ

"আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"নেকবান্দা ঈসা ইবনু মারিয়াম (আ) যা বলেন আমি তখন তা-ই বলব[৩৩৪]: "যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের শাহীদ-সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (শাহীদ)।"[৩৩৫]

এ সকল নির্দেশনার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

"বল, আমি জানি না তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন। তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞানী, তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সেই রাসূলের আগে ও পিছে প্রহরী নিয়োগ করেন, যেন তিনি জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের প্রভুর রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়েছেন কি না। তাদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।"[৩৩৬]

এভাবে আমারা জানতে পারছি যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাঁর মনোনিত রাসূলদেরকে গায়েবের জ্ঞান প্রকাশ করেন। সাথে সাথে আমরা জানতে পারছি যে, সার্বিক গায়েব বা ভবিষ্যতের কথা তিনি রাসূলদেরকেও জানান না। কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে তা কি শীঘ্রই আসবে না দেরী করে আসবে তা তিনি জানেন না।

আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায়ের পরে বলেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

"যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছিল না তা সবই আমি আমার এই অবস্থানে থেকে দেখেছি, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও।"[৩৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، وفي رواية:فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وفي رواية: حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الأَرْضِ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ). قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. ...

"আজ রাতে আমার মহিমাময় প্রতিপালক সর্বোত্তম আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেন: স্বপ্নের মধ্যে। তখন তিনি বলেন: হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোন্ বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: না। তখন তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যে রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আকাশমণ্ডলীর মধ্যে যা আছে এবং যমিনের মধ্যে যা আছে তা জানলাম। অন্য বর্ণনায়: পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যা আছে তা আমি জানলাম। তৃতীয় বর্ণনায়: তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা আমার কাছে উদ্ভাসিত হলো। তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন: "এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"[৩৩৮] তখন তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোন্ বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন, তারা কাফ্ফারা বা পাপের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিতর্ক করছেন। আর কাফ্ফারা হলো সালাত আদায়ের পরে মসজিদে অবস্থান করা, পায়ে হেটে জামাতে সালাত আদায়ের জন্য গমন করা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা। যে ব্যক্তি এগুলি করবে সে কল্যাণের সাথে জীবন যাপন করবে, কল্যাণের সাথেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের সময় তার পাপ যেরূপ ছিল তদ্রূপ হয়ে যাবে।"[৩৩৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে আসমান-যমিনের ও পূর্ব-পশ্চিমের অদৃশ্য বিষয়াদি জানিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন। এ দেখানোর অর্থ স্বভাবতই সকল গাইবী ইলম প্রদান করা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে তা স্পষ্টতই বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর এই দর্শনকে ইবরাহীম (আ)-এর দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখান। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাঁকে সকল গাইবী জ্ঞান প্রদান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখি যে, ইবরাহীম (আ)-এর শেষ জীবনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সুসংবাদ নিয়ে এবং লূত (আ)-এর দেশের মানুষদের ধ্বংসের দায়িত্ব নিয়ে যখন ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে আগমন করেন, তখন তিনি ফিরিশতাদেরকে চিনতে পারেন নি, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও কিছু জানতে পারেন নি, তাঁর নিজের সন্তান হবে তাও তিনি জানতেন না এবং সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে তিনি খুবই আশ্চার্যান্বিত হন। এ সকল বিষয় সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এরূপ দর্শনের অর্থ গাইবী জগতের অনেক বিষয় দেখা, সকল বিষয়ের স্থায়ী জ্ঞান লাভ নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি সাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুসলিমগণ। এ সকল নির্দেশ সবই সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন তারা। আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। পাশাপাশি মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসেবে নুবওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইবের বিষয়াদি দেখিয়েছেন ও জানিয়েছেন- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যতটুকু জানিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বলে কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই সরল অর্থে তারা বিশ্বাস করেছেন। এর বাইরে কিছু জানা বা না জানা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা-চিন্তা করা মুমিনের দায়িত্ব নয়।

৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামগ্রিক ইলমুল গাইবের অধিকারী ছিলেন বা তিনি 'আলিমুল গাইব' ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে যে সকল মিথ্যা কথা বলা হয় তার অন্যতম হলো:

إن النبي ﷺ أعطي علم الأولين والأخرين مفصلا ووهب له علم كل ما مضى وما يأتي كليا وجزئيا وأنه لا فرق بين علمه وعلم ربه من حيث الاحاطة والشمول ، وإنما الفرق بينهما أن علم الله أزلي أبدي بنفس ذاته بدون تعليم غيره بخلاف علم الرسول فإنه حصل له بتعليم ربه

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন। যা কিছু অতীত হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জ্ঞান তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপকতায় ও গভীরতায় রাসূলুল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান অনাদি ও স্বয়ংজ্ঞাত, কেউ তাঁকে শেখান নি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাঁর প্রভুর শেখানোর মাধ্যমে।"[৩৪০]

এ কথা উল্লেখ করার পর আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: "এগুলি সবই সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। ইবনু হাজার মাক্কী তার 'আল-মিনাহুল মাক্কিয়াহ' গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ আলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই কথাগুলি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

একমাত্র তিনিই সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গাইব। এই জ্ঞান একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব ও তাঁরই গুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এই গুণ প্রদান করা হয় নি। হ্যাঁ, আমাদের নবী (ﷺ)-এর জ্ঞান অন্য সকল নবী-রাসূলের (আ) জ্ঞানের চেয়ে বেশি। গাইবী বা অতিন্দ্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর প্রতিপালক অন্যান্য সবাইকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ও পূর্ণতর শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে। তিনি জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণতম এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির নেতা।[৩৪১]

মোল্লা আলী কারীও অনুরূপ কথা বলেছেন। কুরআন কারীমের যে সকল আয়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'গাইব' জানতেন না সেগুলি তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের বিভিন্নন ঘটনা, যেমন আয়েশা (রা)-এর গলার হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদের ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, এরূপ গাইব কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন না এবং এরূপ জানার দাবি তিনি কখনোই করেন নি, বরং তিনি বারংবার বলেছেন যে, আমি গাইব জানি না। এরপর তিনি বলেন: "নিঃসন্দেহে তাদের এরূপ অতিভক্তি ও সীমালঙ্ঘনের কারণ হলো, তারা মনে করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গোনাহগুলি মাফ করে দিবে এবং তাদেরকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবেন। তারা এভাবে তাঁর বিষয়ে যত বেশি অতিভক্তি ও অতিরিক্ত কথা বলবে ততই তারা তাঁর বেশি প্রিয় হবে। এভাবে ভক্তির নামে এরা তাঁর সবেচেয়ে বেশি অবাধ্যতা করছে এবং তাঁর সুন্নাত সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করছে। খৃস্টানদের সাথে এদের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট, যারা ঈসা মাসীহের (আ) বিষয়ে অতিভক্তি করেছে, তাঁর শরীয়ত লঙ্ঘন করেছে এবং তার দীনের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, এরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসগুলি সত্য বলে গ্রহণ করে আর সহীহ হাদীসগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বাতিল করে।"[৩৪২]

এক নযরেই আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইব বিষয়ক উপরের এ মতটি একটি বিদ'আতী বা বিভ্রান্ত মত। কারণ কুরআন কারীমে, কোনো সহীহ মুতাওয়াতির বা আহাদ হাদীসে বা সাহাবীগণের বাণীতে কোথাও এরূপ কথা বলা হয় নি। অন্যান্য বিভ্রান্ত বিদ'আতী আকীদার ন্যায় কুরআনের কোনো কোনো কথার ব্যাখ্যা, কোনো কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ 'আকীদা' তৈরি করা হয়েছে।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই 'আলিমুল গাইব' এবং তিনি ছাড়া আসমান-যমীনের মধ্যে অন্য কেউ গাইব জানেন না। এ কথা বলা হয় নি যে, 'আল্লাহর মত গাইব' কেউ জানেন না, বরং বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউই গাইব জানেন না।

(২) কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানেন না। এর বিপরীতে একটি স্থানেও একটি বারের জন্যও দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি যে, তিনি 'আল্লামুল গুইউব', বা 'আলিমুল গাইব' বা সকল গাইবের জ্ঞান তাঁরা আছে।

(৩) অনেক সহীহ হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানেন না। এর বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি বলেন নি যে, 'আমি গাইব জানি' বা 'আমি আলিমুল গাইব'।

(৪) এই মতটিতে যে কথাগুলি দাবি করা হয়েছে সে কথাগুলি কখনোই এরূপভাবে বা এ ভাষায় কখনো কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীসেও বলা হয় নি।

৩. ২. ১২. ৩. হাযির-নাযির প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইবের দাবির আরেকটি পরিভাষা তাঁকে 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করা। হাযির-নাযির দুইটি আরবী শব্দ। (**حاضر**) হাযির অর্থ উপস্থিত। (**ناظر**) নাযির অর্থ দর্শক, পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক। 'হাযির-নাযির' বলতে বোঝান হয় 'সদাবিরাজমান ও সর্বজ্ঞ বা সবকিছুর দর্শক'। অর্থাৎ তিনি সদা-সর্বদা সবত্র উপস্থিত বা বিরাজমান এবং তিনি সদা সর্বদা সবকিছুর দর্শক। স্বভাবতই যিনি সদাসর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' দাবি করেন, তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, এই গুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ বারংবার এরশাদ করেছেন যে, বান্দা যেখানেই থাক্ তিনি তার সাথে আছেন, তিনি বান্দার নিকটে আছেন... ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্পর্কে কখনোই ঘুনাক্ষরেও কুরআন বা হাদীসে বলা হয় নি যে, তিনি সর্বদা উম্মাতের সাথে আছেন, অথবা সকল মানুষের সাথে আছেন, অথবা কাছে আছেন, অথবা সর্বত্র উপস্থিত আছেন, অথবা সবকিছু দেখছেন। কুরআনের আয়াত তো দূরের কথা একটি যয়ীফ হাদীসও দ্ব্যর্থহীনভাবে এই অর্থে কোথাও বর্ণিত হয় নি। কোনো একটি সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি বলেছেন 'আমি হাযির-নাযির'। অথচ তাঁর নামে এ মিথ্যা কথাটি বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা ইমাম কখনোই বলেন নি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাযির-নাযির'।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে বারংবার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গোপন জ্ঞানের অধিকারী নন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করা উক্ত সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট

বিরোধিতা করা।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন হাদীসে তিনি বলেছেন, উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কবরে উপস্থিত করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাযির-নাযির বলে দাবি করার অর্থ হলো, এ সকল হাদীস সবই মিথ্যা। উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না, বরং তিনিই উম্মাতের কাছে উপস্থিত হন!! কাজেই যারা এ দাবিটি করছেন, তাঁর শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। উপরন্তু তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাঊযু বিল্লাহ!

চতুর্থত, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইব ও সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার মত পোষণ করেছেন, তারা একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফযীলত বা মর্যাদা বিষয়ক মতামত হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং একে মুমিনের ঈমানের অংশ বলে দাবি করেছেন।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, দশাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ওফাতের পরে মহাবিশ্বের সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে 'হাযির-নাযির' থেকে তাদের সকল পরিবর্তন বা অন্যায়-অপকর্ম অবলোকন করার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে দেন নি। অনুরূপভাবে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, অতীত উম্মাতগুলির নিকটও তিনি উপস্থিত বা হাযির-নাযির ছিলেন না। আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

"এ গাইবের সংবাদ যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে তার জন্য যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।"[৩৪৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ... وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا

"মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন পশ্চিম প্রান্তে তুমি উপস্থিত ছিলে না এবং তুমির শাহিদ বা প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। ... তুমি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পার্শে উপস্থিত ছিলে না...।"[৩৪৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

"এ গাইবের সংবাদ যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সংগে ছিলে না।"[৩৪৫]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী, সীরাত, সাহাবীগণের কর্ম, মতামত ইত্যাদি সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে তিনিও বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি নিজে কখনো কোনোভাবে দাবি করেন নি যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে 'হাযির-নাযির' বা তাদের কাছে উপস্থিত থেকে তাদের সব কিছু দেখছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও কখনোই এরূপ কোনো কথা কল্পনা করেন নি।

তাদের এ মতের পক্ষে পেশকৃত দলিলগুলি নিম্নরূপ:

স্বভাবতই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে কোনো একটি সুস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যও তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা-ভিত্তিক যুক্তি-তর্কই তাদের দলিল। তাঁদের এ জাতীয় দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে:

প্রথম দলীল: কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'শাহিদ' ও 'শাহীদ' (**شاهد وشهيد**) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪৬] এই শব্দ দুইটির অর্থ 'সাক্ষী', 'প্রমাণ', 'উপস্থিত' (witness, evidence, present) ইত্যাদি। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাস্সিরগণ এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (ﷺ) দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে ও সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর প্রচারিত দ্বীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ যে তাদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তাঁর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন। অনেকে বলেছেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁর একত্বের বা ওয়াহদানিয়্যতের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন।[৩৪৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য 'শাহীদ' বলা হয়েছে।[৩৪৮] অনেক স্থানে আল্লাহকে 'শাহীদ'

বলা হয়েছে।[৩৪৯]

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী' বা 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করেন তাঁরা এই 'দ্ব্যর্থবোধক' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী বাতিল করে দেন। তাঁরা বলেন, 'শাহিদ' অর্থ উপস্থিত। কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত। অথবা 'শাহিদ' অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাঁকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাযির ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁদের এই ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত, তাঁরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামত গ্রহণ না করে নিজেদের মর্জি মাফিক ব্যাখ্যা করেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের ব্যাখ্যা বাতিল করে দেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন। তাঁরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও কখনো এ কথা বলেন নি।

তৃতীয়ত, তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'ইলমে গাইবের অধিকারী' ও হাযির-নাযির বলে দাবি করতে হবে। কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে 'শাহীদ' অর্থাৎ 'সাক্ষী' বা 'উপস্থিত' বলা হয়েছে এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। আর উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কারণ না দেখে তাঁরা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন?!

দ্বিতীয় দলীল: কুরআন কারীমে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (closer) এবং তাঁর স্ত্রী তাদের মাতা। এবং আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।"[৩৫০]

এখানে 'আউলা' (**أولى**) শব্দটির মূল হলো 'বেলায়াত' (**الولاية**), অর্থাৎ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (**الولي**), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। 'আউল' অর্থ 'অধিকতর ওলী'। অর্থাৎ অধিক বন্ধু, অধিক নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer)।

এখানে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (closer) বলতে ভক্তি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হচ্ছে। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাঁদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হক্কদার বলে জানেন। এই 'আপনত্বের' একটি দিক হলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরদ ও প্রেম তার আপনজনদের চেয়েও বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। জাবির, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي (فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، عَلَيَّ قَضَاؤُهُ) فَأَنَا مَوْلاهُ

"প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: "নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর"। কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সেই সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি সে ঋণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে। কারণ আমিই তার আপনজন।"[৩৫১]

কিন্তু 'হাযির-নাযির'-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই তিনি সকল মুমিনের নিকট হাযির আছেন।

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাঁর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না। সর্বোপরি তাদের এই ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বাতিল। কারণ এই আয়াতেই বলা হয়েছে যে "আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর"। অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, "আত্মীয়গণ একে অপরের ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর।"[৩৫২] তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হাযির নাযির। কারণ সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয়। কাজেই তার সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও

শুনছেন!

অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) ও মুমিনগণ মানুষদের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে 'নিকটতর' বা 'ঘনিষ্ঠতর' (**أولى**) ।[৩৫৩] এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত...!

তৃতীয় দলীল: আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رَقِيَ الْمِنْبَرَ) فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ (أَتِمُّوا الصُّفُوفَ) فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (خَلْفَ ظَهْرِي/مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)، فِي الصَّلاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ (مِنْ أَمَامِيْ) (أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ)

"একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (অন্য বর্ণনায়: মিম্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেন: হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে না, দাঁড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না। অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলি পূর্ণ করবে। কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর। অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি। অন্য বর্ণনায়: তোমরা রুকু এবং সাজদা পূর্ণ করবে; কারণ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে আমার পরেও, অথবা বলেন: আমার পিঠের পরেও দেখি যখন তোমরা রুকু কর এবং সাজদা কর।"[৩৫৪]

এ অর্থে আবূ হুরাইরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

"তোমরা কি এখানে আমার কিবলাহ দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকু, সাজদা এবং বিনম্রতা আমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না এবং আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছনে দেখি।"[৩৫৫]

এ হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি। এ হাদীসের আলোকে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য মানুষ যেভাবে সামনে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনেও দেখতেন। এখন কেউ 'বাশারিয়্যাত' বা মানবত্বের বিশেষণকে ভিত্তি করে পিছনে দেখার এই বৈশিষ্ট্যটির ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন যে, এখানে 'দেখি' অর্থ 'ধারণা করি', কারণ 'দেখা' আরবীতে 'ধারণা' বা মনের দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথবা দেখি অর্থ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়... ইত্যাদি। তবে এরূপ ব্যাখ্যা ও অর্থ-করণ ওহীর সীমা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। বরং বাশারিয়্যাত ও পশ্চাত-দর্শন উভয়কেই স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করা এবং উভয়কে সরলভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে যদি কেউ দেখা অর্থ জানা বলেন এবং সামনের মত পিছনে দেখা বলতে অতীতের মত ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা বলেন তবে তা নিঃসন্দেহে মনগড়া অর্থ হবে।

হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে। মানুষ সামনে যেরূপ সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এই দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রুকু সাজাদরা মধ্যে। অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তা সত্ত্বেও যদি তা মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সবকিছু দেখতে পেতেন। তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এই হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। মূলত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়মত রাসূল (ﷺ)-কে এইরূপ ঝামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

ظاهر الحديث إن ذلك يختص بحالة الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة

"হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এ অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস। অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে পেতেন।.... দাউদী[৩৫৬] নামক ব্যাখ্যাকার একটি উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি এ বর্ণনায় 'পরে' শব্দটির অর্থ 'মৃত্যুর পরে' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে পেশ করা হবে। সম্ভবত তিনি আবূ হুরাইরার (রা) হাদীসের সামগ্রিক অর্থ চিন্তা করেন

নি, যেখানে এ কথার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে... ।[৩৫৭]

এখানে লক্ষণীয় যে, দাউদীর যুগ বা হিজরী ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যাকারীরাও 'দেখা' বলতে 'উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে দেখেন' বলে দাবি করতেন। তিনি নিজে মদীনায় থেকে সবত্র সবকিছু দেখতেন অথবা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সব কিছু দেখতেন বলে কেউ কল্পনা করে নি। কিন্তু যুগের আবর্তন, ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়, পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব ও অতিভক্তির প্লাবনে পরবর্তী যুগে 'ইলমুল গাইব' বা 'হাযির-নাযির' দাবিদারগণ এখানে 'তোমাদেরকে দেখতে পাই' কথাটির ব্যখ্যায় বলেন যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বস্থানে সর্বজনকে দেখতে পান। আমরা দেখছি যে, এই ব্যখ্যাটি শুধু হাদীসটির বিকৃতিই নয়, উপরন্তু অগণিত আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী।

সর্বোপরি সামনে ও পিছনে 'দেখা' বা 'গায়েবী দেখা' দ্বারা 'সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি' বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ

"সে ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।"[৩৫৮]

এখানে কি কেউ দাবি করবেন যে, যেহেতু "তেমাদিগকে দেখে' (**يـراكم**) বর্তমান কালের ক্রিয়া, সেহেতু শয়তান ও তার দলের প্রত্যেকে সদা সর্বদা সকল স্থানের সকল মানুষকে একই ভাবে দেখতে পাচ্ছে বা দেখেখেই চলেছে?!

চতুর্থ দলীল: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি) বলেন:

أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا رجل من الأنصار، عن المِنْهَال بن عمرو، حدثه أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبِ يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي ﷺ أمته غُدْوة وعَشيّة، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم،

"(প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন, আনসারী এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছেন, মিনহাল ইবনু আমর তাকে বলেন, তিনি (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯০ হি)-কে বলতে শুনেছেন: প্রতি দিনই সকালে বিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর উম্মাতকে পেশ করা হয়, ফলে তিনি তাদেরকে তাদের নামে ও কর্মে চিনতে পারেন। এজন্য তিনি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।"[৩৫৯]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যকে 'হাযির-নাযির' মতবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যটি তাঁর থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কথাটি মিনহালের সূত্রে জেনেছেন বলে দবি করেছেন। হাদীসের সনদ বিচার সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এরূপ বর্ণনার কোনোরূপ নির্ভরযোগ্যতা নেই মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের নিকট।

(২) ৭ম হিজরী শতকে আল্লামা কুরতুবী ২য় শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সূত্রে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সুপরিচিত গ্রন্থসমূহে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অপরিচিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে লিপিকারগণ অনেক সংযোজন বিয়োজন করত। কাজেই বক্তব্যটি আদৌ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক সংকলিত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া কষ্টকর।

(৩) সর্বাবস্থায় এ বক্তব্যটি তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িাবের ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা কোনো সাহাবীর বক্তব্য নয়।

(৪) ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, দশজনেরও অধিক সাহাবী থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর ওফাতের পরে সাক্ষী বা হাযির-নাযির হয়ে উম্মাতের সকল কর্ম দেখাশুনা করার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাকে দেন নি। বরং তাদের অনেকের পরিবর্তন-উদ্ভাবন তিনি জানবেন না। এর পাশাপাশি কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় নি যে, উম্মাতের সকল কর্ম তাঁর নিকট পেশ করা হয়।

(৫) ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাযির-নাযির' (সদা-সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান ও সবকিছুর দর্শক) নন; বরং তিনি রাওযা মুবারাকার মধ্যে বিদ্যমান এবং উম্মাতের কর্ম তাঁর নিকট হাযির করা হয়, তিনি উম্মাতের নিকট হাযির (উপস্থিত) হন না।

পঞ্চম দলীল: মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

"এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে ....।"[৩৬০]

এ আয়াত দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বত্র বিরাজমান। অথচ এ আয়াতের অর্থ খুবই স্পষ্ট। সুস্পষ্টতই

এখানে সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াত ও আগের ও পরের আয়াতগুলি থেকে তা সুস্পষ্ট। সাহাবীগণও কখনো বুঝেন নি যে, 'তোমাদের মধ্যে রয়েছেন' অর্থ প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন বা সর্বত্র রয়েছেন।

ষষ্ঠ দলীল: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে কবরস্থ ব্যক্তিকে ফিরিশতাগণ তার প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এ বিষয়ে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে:

مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ

"তোমার প্রতিপালক কে? এবং তোমার দীন কী? এবং তোমার নবী কে?"[৩৬১]

এ হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তৃতীয় প্রশ্নটির ভাষা হবে নিম্নরূপ:

مَا هَذَا الرَّجُلُ؟

"এই ব্যক্তি কে (তাঁর পদমর্যাদা কী)?"[৩৬২]

হাযির-নাযির মতের অনুসারিগণ দাবি করেন যে, এখানে 'হাযা' (**هــذا**) বা 'এই' (this) বলা হয়েছে, আর নিকটবর্তী কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করতেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকটেই থাকবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান ও সব কিছুর দর্শক, অর্থাৎ হাযির-নাযির!

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, তাঁদের এ দাবিটি প্রমাণ করে যে, তাঁরা কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যবহার বিধির সাথে ভালভাবে পরিচিত নন, অথবা এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান গোপন করতে চান। 'হাযা' বা 'এই' শব্দটি কেবলমাত্র দৈহিকভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করতেই ব্যবহার করা হয় না, উপরন্তু মানসিকভাবে নিকটবর্তী বা দৈহিক ও মানসিকভাবে দূরবর্তীর প্রতি ইঙ্গিতের জন্যও ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনো উদাহরণ না দিয়ে অবিকল এই বাক্যটিই বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত অন্য হাদীস থেকে উদ্ধৃত করছি। আমর ইবনু সালামা (রা) মরুবাসী আরব গোত্রের মানুষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচার শুরু করলে এ খবর তাদের কানেও পৌঁছায়। তারা সেই দূর মরুপ্রান্তরে বসেই তাঁর বিষয়ে বিভিন্ন কাফেলার মানুষদেরকে প্রশ্ন করতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন,

كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ <u>مَا هَذَا الرَّجُلُ؟</u> فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ

"আমরা মানুষের যাতায়াতের পথে এক জলাধারের পাশে বসবাস করতাম। আমাদের নিকট দিয়ে কাফেলাগুলি অতিক্রম করত। আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতাম: মানুষদের খবর কি? মানুষদের খবর কি? <u>"এই ব্যক্তি কে (তাঁর পদমর্যাদা কী)?"</u> তারা বলত, তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন...।"[৩৬৩]

এখানে আমরা দেখছি যে, সুদূর মক্কায় অবস্থিত মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে প্রশ্ন করতে 'হাযা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই শুধু 'হাযা' শব্দের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে এরূপ একটি ধর্ম বিশ্বাস তৈরি করার প্রক্রিয়া সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকটবর্তী হবেন তবুও এদ্বারা কোনোভাবেই 'হাযির-নাযির'-এর তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় না। পারলৌকিক জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জগৎটি সম্পূর্ণভাবেই এ পার্থিব জীবন ও জগত থেকে ভিন্ন। সে জগতের দর্শন, নৈকট্য ইত্যাদি এ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এরূপ দর্শন বা নৈকট্যের অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু মৃতকে প্রশ্নের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দর্শন করা বা নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা সদা-সর্বদা তিনি মৃতদের নিকট উপস্থিত বা সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবি করার মত কল্পনা কারো মনে উদয় হয়েছে বলে জানা যায় না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মত যারা পোষণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের কথাগুলির পক্ষে একটিও দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করছেন না। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্ব্যর্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর এরূপ ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তাঁরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন। যারা এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যে ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি। সর্বোপরি তারা এমন কিছু কথা দাবি করছেন যেগুলিকে সঠিক প্রমাণ করতে শুধু কুরআন ও হাদীসের অগণিত শিক্ষাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমগ্র জীবনের সকল ঘটনারই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ সর্বপ্রকারের ইলমুল গাইবের অধিকারী হলে এবং সদাসর্বদা সবত্র বিরাজমান হলে নুবুওয়াত, ইসরা, মি'রাজ, হিজরত, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি সবই অর্থহীন হয়ে যায়।

কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবীগনের পদ্ধতি ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির ভিত্তিতে মুমিনের দায়িত্ব হলো এ বিষয়ে ওহীর সকল নির্দেশনা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা। মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদির অনেক কিছু জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, বরং অন্য সকল নবী-রাসূলের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে

অনেক জ্ঞান তাঁকে আল্লাহ দান করেন। আমরা আগেই দেখেছি তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাঁর আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে বলে প্রতিটি মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তবে আল্লাহর জানানো জ্ঞানের বাইরে কোনো গাইবী ইলম তাঁর ছিল না। তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাকে কতটুকু জানিয়েছেন তা নিয়ে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের অতিরিক্ত কোনো কল্পনা বা ব্যাখ্যা মুমিন করতে চান না। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে, তাই আমরা এভাবেই বিশ্বাস করব, এর বাইরে কিছু বাড়িয়ে কিছু বলব না আমরা, কারণ তাতে আমরা বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তির মধ্যে নিপতিত হব, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন। কুরআন ও হাদীসে যে শব্দ, বাক্য বা বিশেষণ ব্যবহার করা হয় নি বা সাহাবীগণ যে কথা তাঁর বিষয়ে বলেন নি সেগুলি না বললে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা, পথ ও আদর্শের ব্যতিক্রমের অপরাধে অপরাধী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. ২. ১২. ৪. তাঁর ওফাত বিষয়ক বিতর্ক

কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল"[৩৬৪]

তিনি আরো বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।"[৩৬৫]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

"আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব বা অনন্ত জীবন প্রদান করি নি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কী চিরজীবী হয়ে থাকবে?"[৩৬৬]

কুরআনে অনেক আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদগণ মৃত নন, তারা জীবিত ও রিয্ক প্রাপ্ত হন। নবীগণের বিষয়ে কুরআন কারীমে কিছু না বলা হলেও সহীহ হাদীসে তাঁদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّون

"নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা সালাত আদায় করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৬৭]

অন্য একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ الأَنْبِيَاءُ لاَ يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدِ أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ولكنهم يُصَلُّون بين يدي الله عز وجل حتى ينفخ في الصور

"নবীগণকে ৪০ রাতের পরে তাঁদের কবরের মধ্যে রাখা হয় না; কিন্তু তারা মহান আল্লাহর সম্মুখে সালাতে রত থাকেন; শিংগায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত।"

হাদীসটির বর্ণনাকারী আহমদ ইবনু আলী আল-হাসনবী মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে পরিচিত। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস একে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস এই অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে একে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৮]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ)-কে নিজ কবরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং ঈসা (আ)-কেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আল্লামা বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এই দর্শনকে উপরের হাদীসের সমর্থনকারী বলে গণ্য করেছেন।[৩৬৯]

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোনো কোনো পূর্ববর্তী নবীকে হজ্জ পালনরত অবস্থায় দেখেছেন। এ সকল হাদীসকেও কোনো কোনো আলিম নবীগণের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

এই দর্শনের বিষয়ে কাযী ইয়ায বলেন, এই দর্শনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, নবীগণ শহীদগণের চেয়েও মর্যাদাবান। কাজেই নবীগণের জন্য ইন্তিকালের পরেও এইরূপ ইবাদতের সুযোগ পাওয়া দূরবর্তী কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা জীবিত অবস্থায় যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার সূরাত দেখানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে তাকে তিনি দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন।[৩৭০]

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ওফাত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"যখনই কোনো মানুষ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের প্রতিউত্তর দিতে পারি।"[৩৭১]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

من صلى عليَّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أعلمته

"কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয়।"[৩৭২]

হাদীসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সনদের কারণে ইবনু হাজার, সাখাবী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩৭৩]

আউস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .... فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّـهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: "মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।"[৩৭৪]

আরো অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিন বিশ্বের যেখানে থেকেই দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন, ফিরিশতাগণ সেই সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছিয়ে দেবেন।

উপরের হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁকে এক প্রকারের জীবন দান করা হয়েছে। এই জীবন বারযাখী জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান ও গায়েবী জগতের একটি অবস্থা। এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বলতে হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বলব, এই অপার্থিব ও অলৌকিক জীবনে তাঁর সালাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কেউ সালাম দিলে আল্লাহ তাঁর রূহ মুবারাককে ফিরিয়ে দেন সালামের জবাব দেওয়ার জন্য। রাওযার পাশে কেউ দরুদ বা সালাত পাঠ করলে তিনি তা শুনেন, আর দূর থেকে পাঠ করলে তা তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। এর বেশি কিছুই বলা যাবে না। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। বুঝতে হবে যে, উম্মাতের জানার প্রয়োজন নেই বলেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকি বিষয়গুলি বলেন নি।

কিন্তু বর্তমান যুগে কেউ কেউ এ বিষয়ে ওহীর অতিরিক্ত কথা বলেন, এবং সেগুলিকে 'আকীদা' বা বিশ্বাসের অংশ বলে গণ্য করেন। এরূপ বিষয়গুলির অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও নবীগণের ইন্তিকাল পরবর্তী এই বারযাখী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক জীবনের মতই মনে করা। এ বিষয়ে তাঁরা যা কিছু বলেন সবই ওহীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা যুক্তি মাত্র, এবং তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ও যুক্তি সাহাবীগণের মতামত ও কর্মধারার বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরের ঘটনাগুলি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পাঠ করলেই আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। খলীফা নির্বাচনের বিষয়, গোসলের বিষয়, দাফনের বিষয়, পরবর্তী সকল ঘটনার মধ্যেই আমরা তা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবদ্দশায় তাঁর পরামর্শ, দোয়া ও অনুমতি ছাড়া তাঁরা কিছুই করতেন না। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পরে কখনো কোনো সাহাবী তাঁর রাওযায় দোয়া, পরামর্শ বা অনুমতি গ্রহণের জন্য আসেন নি। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযা মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে

দোয়া-পরামর্শ চাননি।

আবু বকরের (রা) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শত্রু, অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রাওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী (রা)। অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি বা আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য রাওযা শরীফে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে ফাতিমা, আলী ও আব্বাস (রা) খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চেয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও মনোমালিন্য হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) সাথে আমীরুল মুমিনীন আলীর (রা) কঠিন যুদ্ধ হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। এসকল যুদ্ধে অনেক সাহাবী সহ অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন। কিন্তু এসকল কঠিন সময়ে তাঁদের কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে পরামর্শ চান নি। তিনি নিজেও কখনো এসকল কঠিন মুহূর্তে তাঁর কন্যা, জামাতা, চাচা, খলীফা কাউকে কোনো পরামর্শ দেন নি। এমনকি কারো কাছে রূহানীভাবেও প্রকাশিত হয়ে কিছু বলেন নি। আরো লক্ষণীয় যে, প্রথম শতাব্দীগুলির জালিয়াতগণ এ সকল মহান সাহাবীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে, কিন্তু কোনো জালিয়াতও প্রচার করে নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তিকালের পরে রাওযা শরীফ থেকে বা সাহাবীগণের মাজলিসে এসে অমুক সাহাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৭৫]

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিকট দু'আ চাইতেন। কুরআন বা হাদীসে কোথাও ঘুনাক্ষরেও নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, তোমরা বিপদে পড়লে রাওযা শরীফে যেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দু'আ চাইবে। সাহাবীগণও কখনো এরূপ করেন নি।

মহান আল্লাহ কুরাআন কারীমে বলেছেন

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"যদি তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরে আপনার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী করুণাময় হিসাবে পেত।"[৩৭৬]

এখানে পাপী মুমিনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করতে। সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করতেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরে একটি ঘটনাতে একজন সাহাবীও তাঁর রাওযায় যেয়ে বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল আমি পাপ করেছি, তাওবা করছি আপনি আমার জন্য ক্ষমা চান। সাহাবীগণের যুগের অনেক পরে কোনো কোনো মানুষের মধ্যে এরূপ কর্ম প্রকাশ পেয়েছে।[৩৭৭] এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত পরবতী জীবনকে কখনোই সাহাবীগণ জাগতিক জীবনের মত মনে করেন নি।

৩. ২. ১২. ৫. তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক

উপরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে সাধারণভাবে এবং মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশেষভাবে অনেক মর্যাদা, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযা দান করেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এবং বিশেষত শিরক-কুফর বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযাকে 'ক্ষমতা' ও অধিকার ধারণা করে পূর্ববর্তী উম্মাতের মানুষেরা শিরকে নিপতিত হয়। এ জন্য কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে মুজিযা, শাফা'আত বা অন্য কোনো কিছুই নবী-রাসূলগণের ইচ্ছাধীন বা ক্ষমতাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাধীন। বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অমঙ্গলের ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দেন নি। এ বিষয়ে অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই।"[৩৭৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।"[৩৭৯]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ

وَرِسَالاتِهِ

"বল, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা বা মালিকানা আমার নেই। বল: আল্লাহ থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পরবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না, কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার (আমাকে রক্ষা করবে)।"[৩৮০]

কুরআন ও হাদীসে বারংবার দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি ছাড়া আর কেউই কোনো মানুষকে বিপদ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এর বিপরীতে কখনোই কোনোভাবে কুরআন ও হাদীসে একটি স্থানেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্য কোনো নবী বা ওলী কোনোভাবে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে এরূপ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এ অর্থের আয়াত ও হাদীস অনেক। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ

"বল, কে তোমাদের ত্রাণ করে স্থলভাগের এবং সমুদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তার নিকট অনুনয় কর: 'আমাদেরকে এ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হব'? বল, 'আল্লাহই তোমারেদকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ থেকে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তার শরীক কর।"[৩৮১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ

"তিনিই আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীত (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।"[৩৮২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ তোমাকে বিপদ-কষ্ট দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"[৩৮৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ

"এবং আল্লাহ তোমাকে বিপদ-আপদ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।"[৩৮৪]

এরূপ বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে একটি আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন নি যে, আমি বিপদ ত্রানের বা কষ্টদুঃখ দূর করার দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা মুহাম্মাদ (ﷺ) বা অন্য কোনো নবী, নবী বংশের ইমাম বা কোনো ওলীকে প্রদান করেছি। উপন্তু বারংবার বলা হয়েছে যে, এরূপ কোনো অধিকার, সুযোগ বা ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে কখনোই প্রদান করেন নি। উপরে উল্লিখিত অনেক আয়াত ও হাদীসে তা আমরা দেখেছি।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণের এবং বিশেষত মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দু'আ কবুল করতেন। তবে দু'আ কবুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ারে। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তার অনেক দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আবার কখনো কখনো কবুল করেন নি। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের শেষ রাকাতের রুকু থেকে ওঠার পরে কতিপয় কাফিরের জন্য বদদোয়া করে বলতেন: হে আল্লাহ, আপনি অমুক, অমুককে লানত করুন। তখন আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন[৩৮৫]:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

"এ বিষয়ে আপনার কোনো অধিকার নেই, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা জালিম।"[৩৮৬]

কুরআনে আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের হিসাব, শাস্তি,

কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির ঝামেলায় ফেলেন নি। এগুলি সবই মহান আল্লাহর একক দয়িত্ব। মহান আল্লাহ যদি অপারগ হতেন বা তাঁর কারো সহযোগিতার প্রয়োজন হতো তবে অবশ্যই তিনি সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা গ্রহণ করতেন তাঁর প্রিয়তম রাসূল থেকে। কিন্তু তিনি যেহেতু কারো সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয়তমকে এ সকল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেন নি।

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

"তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা (তার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।"[৩৮৭]

তাঁর দু'আয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে মাফ করেছেন। তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তাঁর দু'আ ও শাফায়াত কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর রাসূলের দু'আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ বলেছেন:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা। আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।"[৩৮৮]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন: "তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও"[৩৮৯] তখন তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়দের একত্রিত করে বলেন:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ... اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, তোমরা (নিজের ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে ক্রয় কর; আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আবদ মানাফ গোত্রের মানুষেরা, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমার কোনোই উপকারে আসব না।"[৩৯০]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

"নবী (ﷺ) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে যাকাত বা সরকারী সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করার বা মালিকানায় নেওয়ার বিষয়ে কথা বললেন। তিনি এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন এমন না পাই যে, তার কাঁধে একটি চিৎকার রত মেষ অথবা ঘোড়া রয়েছে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব: তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তাঁর কাঁধে চিৎকার রত উট থাকবে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তার কাঁধে নীরব (জড়) সম্পদ থাকবে এবং সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম।"[৩৯১]

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একজন মুনাফিক মুসলমানদের খুব কষ্ট দিত। তখন আবূ বাকর (রা) বলেন, চল, আমরা এ মুনাফিক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِيْ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ

"আমার কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয় না, একমাত্র আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয়।"[৩৯২]

এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ এখানে উদ্ধার প্রার্থনা বলতে জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের কথার স্বাভাবিক অর্থ, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি, বা তাঁকে অনুরোধ করি, এ মুনাফিকের শাস্তির ব্যবস্থা করে আমাদেরকে এর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। এরূপ জাগতিক সাহায্য, সহযোগিতা বা ত্রাণ প্রার্থনার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শেখালেন যে, সকল বিষয়েই একমাত্র আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয়।

মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনগুলিতে কোনো কোনো আলিম এ সকল আয়াত ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। বিষয়টিকে তাঁরা মুমিনের ঈমানের অংশ বানিয়ে নেন। এরূপ দাবির ভিত্তিতে তারা দাবি করেন যে, বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় এবং তিনি যাকে ইচ্ছা অলৌকিকভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক এ মতটির পক্ষে তারা কোনোরূপ সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসকে তাঁদের মতের দলিল হিসেবে পেশ করেন নি। বরং দ্ব্যর্থবোধক কিছু কথার তাঁরা বিশেষ একটি অর্থ গ্রহণ করেন এবং সেই 'অর্থ'-কে ভিত্তি করে দ্ব্যর্থহীন অগণিত আয়াত ও হাদীসকে বাতিল করে দেন। তাঁদের এ জাতীয় দলিলের দু একটি নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টি জগতের রহমত-স্বরূপ।"[৩৯৩]

এখানে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত বা তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠানো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁর অনুসরণই আল্লাহর রহমত লাভের একমাত্র পথ। কিন্তু এ আয়াতের অর্থে তারা বলেন, বিশ্বজগতের রহমত তার অধিকারে রাখা হয়েছে। কাজেই রহমত বণ্টনের ক্ষমতা ও অধিকার তাঁরই। আরবী ভাষা, নাহউ ও 'তারকীব' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এরূপ ব্যাখ্যা আয়াতটির অর্থ বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় দলীল: ইমাম বুখারী (রাহ) বলেন[৩৯৪]:

بَاب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

মহান আল্লাহর বাণী "(যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত লাভ কর) তার একপঞ্চমাংশ আল্লাহর এবং রাসূলের) এ বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ এই একপঞ্চমাংশ সম্পদ বণ্টন করার দায়িত্ব রাসূলের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি বণ্টনকারী ও খাজাঞ্চি এবং আল্লাহই প্রদান করেন।"

ইমাম বুখারী এ অধ্যায়ে নিম্নের হাদীসগুলি উল্লেখ করেন:

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন আনসারী সাহাবীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন:

سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا (فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তবে আমার কুনিয়াতে (আবুল কাসিম) কুনিয়ত রাখবে না; কারণ আমাকে কাসিম অর্থাৎ বণ্টনকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বণ্টনকারী মাত্র) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।[৩৯৫]

(২) মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ) (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي).

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বিষয়ে প্রজ্ঞা (ফিক্হ) প্রদান করেন। আর আল্লাহই প্রদান করেন আর আমি বণ্টনকারী (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বণ্টনকারী মাত্র প্রদান করেন আল্লাহ)"[৩৯৬]

(৩) আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

"আমি তোমাদের প্রদানও করি না, তোমাদের প্রদান করা বন্ধও আমি করি না। আমি তো বণ্টনকারী মাত্র, যেখানে আমাকে আদেশ করা হয় সেখানেই আমি প্রদান করি।'[৩৯৭]

(৪) খাওলা আনসারিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ رِجَالا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কিছু মানুষ আল্লাহর সম্পদ স্বেচাচারিতামূলকভাবে অন্যায় খাতে খরচ করে, তদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম।"[৩৯৮]

এ সকল হাদীসের অর্থ সূযের আলোর মতই পরিষ্কার। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধলব্ধ বা যাকাতের যে সকল সম্পদ বণ্টন করা দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করা হয় সেগুলি বণ্টনের বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কিছুই করতেন না। নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে তিনি কাউকে কিছু দিতেন না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসারেই তা বণ্টন করতেন।

এ বণ্টনের সাথে গাইবী সাহায্য, রহমত বা অলৌকিক কিছু বণ্টনের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ মতের অনুসারীরা এ হাদীসের একটি বাক্য (আমি বণ্টনকারী) উল্লেখ করে দাবি করেন যে, তিনি বণ্টনকারী অর্থ আল্লাহর রহমত বা অলৌকিক সাহায্য বণ্টন করার দায়িত্ব তাঁর।

নিঃসন্দেহে তাদের এ ব্যাখ্যা পদ্ধতি হুবহু খৃস্টানগণের পদ্ধতির মতই। এভাবে তাঁরা একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে সম্পূর্ণ মনগড়া বিকৃত অর্থ করে তার ভিত্তিতে অগণিত দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন উদ্ভট ও অবাস্তব ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন।

তৃতীয় দলীল: আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا

"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি দেখলাম যে, আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হলো এবং তা আমার সামনে রাখা হলো। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গিয়েছেন এখন তোমরা সে ভাণ্ডারগুলি পরিতৃপ্তির সাথে ভোগ করছ।"[৩৯৯]

এখানে খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি বলতে পৃথিবীর ধনসম্পদ তার উম্মাতের নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে বুঝানো হয়েছে। সাহাবী আবূ হুরাইরা (রা) তাই বুঝেছেন। এজন্য তিনি বলছেন যে, পৃথিবীর ভান্ডারগুলি এখন তোমরা ভক্ষণ করছ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وفي رواية: مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

"নবী (ﷺ) একদিন বের হয়ে উহদের শহীদের উপর জানাযার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বারের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর আমি আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে, অন্য বর্ণনায়: আমাকে পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা সেগুলি (ভাণ্ডারগুলি) নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।"[৪০০]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, তাঁর উম্মাত তাঁকে দেওয়া পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাণ্ডারগুলির চাবি বা ভাণ্ডারগুলি নিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে তিনি ভয় পান। এভাবে আমরা দেখি যে, 'পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ বা পৃথিব ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহ বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, কোনো গাইবী ক্ষমতার ভাণ্ডার বুঝানো হয় নি। কারণ গাইবী ক্ষমতার ভাণ্ডার নিয়ে উম্মাত প্রতিযোগিতা করে না এবং এরূপ প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকলে তা শিরকের মত কোনো খারাপ বা ভয়ের কারণ না।

আবূ মুহাইহিবা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন,

يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَنِيْ أَنْ يُؤْتِيَنِيْ خَزَائِنَ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيْهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّيْ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ فَخُذْ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ هذِهِ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيْهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ. قَالَ: كَلاَّ، يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ لَقَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عز وجل

"আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, দুটি বিষয়ের একটি আমি বেছে নেব: (১) পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত, অথবা (২) আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত এবং জান্নাত। তখন আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন! তাহলে আপনি পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত বেছে নিন। তিনি বলেন, কখনোই না! আবূ মুহাইহিবা, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত বেছে নিয়েছি।"[৪০১]

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ

"মহান আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন এবং আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমগুলি দেখতে পাই, আর আমার জন্য যতটুকু সংকুচিত করা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছাবে। আর আমাকে লাল ও সাদা উভয় ধনভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে।"[৪০২]

এভাবে কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি প্রদান করা হয়েছিল। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ স্বভাবতই 'ভাণ্ডারসমূহের চাবি' বলতে 'ধন-সম্পদের অধিকার' বুঝিয়েছেন যা তাঁর উম্মাত তাঁর ওফাতের পরে লাভ করে। কিন্তু গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ কেউ কেউ এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে মহান আল্লাহর সকল গাইবী ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, উপরে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: "বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই... ।" এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে "আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের চাবি' প্রদান করা হয়েছে। বরং এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাঁকে 'পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি' প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এ সকল হাদীসকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলির বিপরীতে দাঁড় করানোর কোনোরূপ সুযোগ নেই। ওহীতে যতটুকু বলা হয়েছে আমরা ততটুকুই বলব। কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, 'আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নয়।' আর উপরের হাদীসগুলির নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, 'পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁকে প্রদান করা হয়, যেগুলি পরবর্তীতে তাঁর উম্মাত ভোগ ও ভক্ষণ করেছে এবং তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।' ওহীর মাধ্যমে যা বলা হয়েছে ততটুকুই যিনি বলবেন তিনি নিরাপদ। ওহীর বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলা বা ব্যাখ্যার নামে ওহীর নির্দেশনা বাতিল করা মুমিনের জন্য কঠিন বিভ্রান্তির পথ উন্মোচন করে, তা যে যুক্তিতে বা যে নিয়্যাতেই করা হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত, এ সকল হাদীসের স্পষ্ট ও সরল অর্থ তারা পরিত্যাগ করেছেন। এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অর্থ বলেছেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ যে অর্থ বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে মনগড়া একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা এরূপ একটি মনগড়া ব্যাখ্যাকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের বহুসংখ্যক দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করেছেন।

চতুর্থত, তাঁরা এমন একটি আকীদা উদ্ভাবন করেছেন যে আকীদা কুরআন বা হাদীসে কোথাও নেই এবং সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ বা পূর্ববর্তী কোনো আলিম কখনোই বলেন নি। যেমন তারা বলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল হাজত প্রয়োজন বণ্টন করেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বে যা কিছু প্রকাশিত হয় সবই একামাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রদান করেন, তাঁর হাতেই 'চাবিসমূহ', আল্লাহর ভাণ্ডারগুলি থেকে কিছুই তাঁর হাত ছাড়া বের হয় না, তিনি যদি কিছু ইচ্ছা করেন ততে তার বিপরীত কিছু হতে পারে না, তার নির্দেশের বিরোধিতা করার মত বিশ্বে কিছু নেই। 'বিশ্বের সবকিছু পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর', তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রয়োজন মেটান, আল্লাহর কাছে তাঁর একত্ব ছাড়া আর কি আছে, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা কর, 'তাঁর কতৃত্ব ছাড়া কোনো কাজই হয় না', তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তার বিপরীতে কিছুই হয় না, তিনিই দেন এবং তিনিই আটকে দেন, তিনিই সকল বিপদগ্রস্থের বিপদ কাটান এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করান, ইত্যাদি... ইত্যাদি ... ইত্যাদি।'

কুরআন কারীম, সকল সহীহ হাদীস, দুর্বল হাদীস এবং জাল ও বানোয়াট হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আপনি এ কথাগুলি কোথাও পাবেন না। সাহাবীদের জীবন খুঁজে দেখুন, এ সকল কথার সামান্যতম ইশারাও তাদের কোনো কথায় পাবেন না। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনে যা কিছু পাবেন সবই এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে পাঠক দেখবেন যে, এ সকল বিষয় সবই একমাত্র এবং কেবল মাত্র মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কেবলমাত্র তিনিই এসকল ক্ষমতার মালিক। এর বাইরে কিছুই বলা হয় নি।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা নির্দেশনা আমরা উপরে দেখেছি। সকল আয়াত ও হাদীস আলোচনা করতে গেলে বইয়ের কলেবর আরো অনেক বেড়ে যাবে। উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয় নি বলে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও উল্লেখ করা হয় নি যে, তাঁকে এরূপ কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমত: কুরআন ও হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এরূপ 'আকীদা' তৈরি করার পরে তাঁরা এর ভিত্তিতে বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য বা ত্রাণ প্রার্থনা করার রীতি প্রচলন করেছেন।

প্রতিদিন অগণিতবার আমরা বলছি: "আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই।" এ হলো মুমিনের ঈমান। কুরআন ও হাদীসের সর্বত্রই এ শিক্ষাই বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জীবনে প্রায় আড়াই বৎসর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচার্যে থাকেন। বিশেষত বিদায় হজ্জের সময় তিনি তাঁর সাথে

উটের পিঠে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِـدْهُ تُجَاهَـكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَـيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

"আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : 'হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।"[৪০৩]

এভাবে কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুমিনগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল বিপদে কষ্টে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। আমি আমার লেখা 'রাহে বেলায়াত' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস ও মাসনূন দু'আ আলোচনা করেছি। এর বিপরীতে একটি নির্দেশও নেই যে, বিপদে-আপদে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যে বলবে, হে রাসূল, আপনি আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচান।

ষষ্ঠত: সাহাবীগণের জীবন দেখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁর কাছে দু'আ চেয়েছেন, তবে কখনোই তাঁর কাছে যেয়ে বলেন নি, আমাদের বিপদ আপনি কাটিয়ে দেন। তাঁর ওফাতের পরে তাঁর রাওযা মুবারাকায় যেয়ে তাঁরা কখনোই তাঁর কাছে বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন নি। এমনকি কখনো তাঁরা তাঁর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে স্বাভাবিক দু'আও চান নি। কখনোই তাঁরা রাওযায় যেয়ে বলেন নি, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুতি অর্থই ধ্বংস। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন, "কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করিব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[৪০৪]

এখানে 'মুমিনগণ' পথ বলতে স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের মুমিন অর্থাৎ সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যদি কেউ সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তবে তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

সপ্তমত: এখানে খৃস্টানদের অবস্থা উল্লেখ্য। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল ভালমন্দের ক্ষমতা ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তার কাছেই সব কিছু চাইতে হবে। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমান তোমাদের মধ্যে প্রচলিত বিকৃত বাইবেল থেকেই একটি আয়াত বের করে দেখাও যেখানে ঈসা (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর বা আমার কাছে ভালমন্দ প্রার্থনা কর। তারা বলে, তিনি ইহূদীদের ভয়ে এবং মানুষ বুঝবে না বলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি, তবে অমুক স্থানে এ বিষয়ে 'ইঙ্গিত' আছে, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে তা বুঝা যায় ... ইত্যাদি। এভাবে ইঙ্গিত, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটি আকীদা তারা বানিয়েছে যার অস্তিত্ব বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও নেই।

অষ্টতম: মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনের এ সকল মানুষের অবস্থা দেখে আরবের মুশরিকদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত হালকা মনে হতে পারে! ফিরিশতাগণকে দায়িত্ব প্রদানের কথা এবং তাদের শাফা'আত কবুল করার কথা মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সুস্পষ্টতই বলেছেন। আরবের মুশরিকগণ একটু বাড়িয়ে ফিরিশতাগণের দায়িত্বকে ক্ষমতা ও শাফা'আতের সুযোগকে অধিকার বলে মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদেরকে ডেকে এবং তাদের নামে নযর-মানত করে শিরকে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নবী-ওলীগণকে আল্লাহ কোনোরূপ অলৌকিক দায়িত্ব বা বিশ্ব পরিচালনা দায়িত্ব দিয়েছেন বলে কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলেন নি। তার পরেও কিছু ফযীলত জ্ঞাপক অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজের কেউ কেউ দাবি করছেন যে, মহান আল্লাহ নবী-ওলীগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এরপর তাঁরা সে দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে দাবি করছেন। এরপর তাঁরা তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন।

এখানে মুমিনকে বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্বল। তবে এ জন্য কুরআন কারীমের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে- এ ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বিষয়ক উপরের বিভ্রান্তিকর আকীদাগুলির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা আকীদার উৎসে বিভ্রান্তি। এখানে মূলত কিছু মানুষের বক্তব্যকে এবং নিজের পছন্দকে আকীদার মুল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের যা কিছু বলা হয়, তা একান্তই এ সকল বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমর্থন করার জন্য। এরূপ আকীদা পোষণকারীকে যদি আপনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

সকল গাইব জানতেন না, তিনি মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা রাখেন না, তাঁর কাছে গাইবী সাহায্য, বিপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা যাবে না, তবে তিনি আপনার 'আকীদা' বিভ্রান্ত বলে গণ্য করবেন। আপনি যদি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি তাকে বলেন তবে তিনি বলবেন: এগুলি আছে ঠিকই, তবে এগুলির অন্য ব্যাখ্যা আছে। আপনি যদি বলেন, এ ব্যাখ্যা কি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন? সাহাবীগণ বলেছেন? তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এরূপ কোনো ব্যাখ্যা তাঁদের থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন যে, অমুক বা তমুক এ কথা বলেছেন।

এবার আপনি যদি তাঁর 'আকীদা'র বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে, আপনি যে আকীদা বিশুদ্ধ বলে দাবি করছেন তা কি কুরআন বা হাদীসে কোথাও সুস্পষ্টভাবে আছে? তিনি বলবেন, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বা অমুক হাদীস থেকে তা বুঝা যায়। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, এ সকল ব্যাখ্যা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে? তিনি পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন, অমুক বা তমুক বলেছেন।

এ জাতীয় সকল আকীদার ক্ষেত্রেই এরূপ দেখতে পাবেন। বিদ'আত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে শীয়া, মুতাযিলী ইত্যাদি সকল বিভ্রান্ত ফিরকার আকীদার অবস্থা একইরূপ।

এ সকল ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য নাজাতের একমাত্র উপায় হলো, সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এখানে মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে নেই। একান্ত প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'খবর ওয়াহিদ' একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মশহূর হাদীস বাতিল করা যাবে না। প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্ব্যর্থ বোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানোই মুমিনের নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ।

চতুর্থ অধ্যায়
আরকানুল ঈমান

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বারংবার ৬টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলিকে যথাযথভাবে বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এ ৬টি বিষয়ের মূল। এ জন্য আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথকভাবে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা ঈমানের আরকান বা স্তম্ভগুলির বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করব।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, যে সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা বলে প্রমাণিত তা সবই সবই বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই এ ৬টি বিষয়ের উপর যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় তার তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের দাবী মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হবে।

৪. ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের আলোচনায় 'আল-ঈমান বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থই 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। তাওহীদের পর্যায় ও প্রকারগুলি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪. ২. মালাইকার প্রতি ঈমান

৪. ২. ১. মালাক: অর্থ ও পরিচয়

আরবী ভাষায় "মালাক" শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফার্সী শব্দই প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন খোদা, নামায, রোযা, দরুদ ইত্যাদি। এগুলি কোনোটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলির ইসলামীকরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষার প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায়ও এ সকল পরিভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ। গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফার্সী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার প্রচলনের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাযের পরিবর্তে সালাত, রোযার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে 'ফিরিশতা' শব্দটিই সবত্র ব্যবহৃত। 'মালাক' শব্দটির প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা। আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আরবী 'মালাক' (مَلَــك) শব্দটির অর্থ পত্র, চিঠি বা দূত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শব্দটি মূলত 'আলাক' (أَلَــك) ধাতুমূল থেকে গৃহীত, মীম অক্ষরটি 'হারফ যাইদ' বা অতিরিক্ত অক্ষর। মূল শব্দটি ছিল 'মাঅ্লাক' (مألــك)। পরবর্তী কালে 'হামযা' অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পরে নিয়ে একে 'মাল্আক' (مــلأك) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে 'হামযা' অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে 'মালাক' (مَلَك) বলা হয়। বহুবচনে 'হামযা' অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং বলা হয় 'মালাইকা' (ملائكــة)। সর্বাবস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয় নি। মালাক, মালআক, মাঅ্লাক সবগুলি শব্দেরই মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (angel)।[৪০৫]

৪. ২. ২. মালাকগণের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা

আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বারংবার মালাকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মালাকগণে অবিশ্বাসকারীর বিভ্রান্তির কথা জানান হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মালাকগণে বা ফিরিশতায় বিশ্বাস করা ইসলামী ঈমানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ।

৪. ২. ৩. মালাকগণের প্রতি ঈমানের মূলনীতি

মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট গাইব বা অদৃশ্য জগতের অংশ। আল্লাহ অদৃশ্য জগতের শুধুমাত্র সে সকল বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস আমাদেরকে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে বা এক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনে। মালাকগণ সম্পর্কে আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি যতটুকু কুরআনুল করীমে বা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এর অতিরিক্ত তথ্য জানা আমাদের প্রয়োজন নেই বলেই আল্লাহ আমাদের ওহীর মাধ্যমে জানান নি। কাজেই ওহীর অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা করলে, অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্তি, তর্ক দিয়ে বললে বা কুরআন হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে

নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তাতে ভুল হওয়ার ও গাইবী বিষয়ে ওহীর বাইরে কথা বলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে অনেক জাতি ওহীর কথা বিকৃত হওয়ার কারণে, ওহীর নামে বানোয়াট কথা প্রচলন হওয়ার কারণে এবং ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা ও মতামত প্রচলনের কারণে মালাকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন। কুরআন কারীমে তাদের কিছু বিভ্রান্তির বর্ণনা রয়েছে। আমরা প্রথমে মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বর্ণনা করব এবং এরপর এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করব।

৪. ২. ৪. মালাকগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ

আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণে বিশ্বাসের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ: "সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক মালাইকা বা ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা, তার নির্দেশ সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম।"

ঈমান বিল-মালাঈকা বা মালাকগণের প্রতি ঈমানের বিস্তারিত চারটি দিক রয়েছে: (১) মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) তাঁদের নামে বিশ্বাস, (৩) তাঁদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস এবং (৪) তাঁদের কর্মে বিশ্বাস।

৪. ২. ৫. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস

ফিরিশতাদের সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মুসলিম সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবালি, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মুমিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন।

৪. ২. ৬. মালাকগণের নামে বিশ্বাস

আল্লাহর সৃষ্ট মালাকগণের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয়। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মালাকগণের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে ধারণা পাই আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে। মালিক ইবনু সা'সা'আ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন:

رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ

"আমার সামনে বাইতুল মা'মূর উত্থিত হলো। আমি বললাম, হে জিবরীল, এটি কী? তিনি বললেন: 'এটি বাইতুল মা'মূর। প্রতিদিন এর মধ্যে ৭০ হাজার মালাক প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনোই এখানে ফিরে আসে না।"[৪০৬]

অন্য হাদীসে আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ

"আকাশ (ভারাক্রান্ত হয়ে) শব্দ করছে এবং তার শব্দ করার অধিকার আছে, সেখানে এমন ৪ আঙ্গুল স্থানও খালি নেই যেখানে একজন মালাক (ফিরিশতা) তাঁর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য সাজদাবনত নেই।"[৪০৭]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ

"তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"[৪০৮]

এদের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জিবরাঈল (জিবরীল), মীকাঈল (মীকাল), ও মালিক নামগুলি কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

"যে কেউ আল্লাহর, তাঁর মালাকগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকালের (মীকাঈলের) শত্রু, (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু।"[৪০৯]

জিবরীল (আ)-কে কুরআন কারীমে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁকে আর-রূহুল আমীন (**الروح الأمين**) বা বিশ্বস্ত আত্মা (পবিত্র আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর শক্তি-মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরীল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহী শিক্ষা দানের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ

"তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন-সুন্দর।"[৪১০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

"আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (আর-রূহুল আমীন: জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।"[৪১১]

জাহান্নামের প্রহরী বা অধিকর্তার নাম উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ

"তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে: তোমরা এভাবেই থাকবে।"[৪১২]

কোনো কোনো হাদীসে 'ইসরাফীল' নামটি এসেছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত শুরু করে শুরুর দু'আ বা 'সানা' পাঠে বলতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আপনি ফয়সালা করবেন আপনার বান্দাদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আপনার অনুমোদন দিয়ে আমাকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করুন।"[৪১৩]

এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতের প্রহরী বা অধিকর্তা মালাকের নাম 'রিদওয়ান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তা বা প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হাদীসে নামটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি। তবে ৪র্থ-৫ম শতকের কোনো মুহাদ্দিসের সংকলিত দু-একটি হাদীসে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১৪]

'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর মালাকের নাম 'আযরাঈল' বলে কোনো কোনো মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন। প্রথম ৪ জন মালাকের নামই শুধু মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং অগণিত হাদীসে এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু মালাককে আল্লাহ কর্মভিত্তিক নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মালাকুল মাওত', 'মুনকার-নাকির', 'কিরামান কাতিবীন' ইত্যাদি।

৪. ২. ৭. মালাকগণের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুর বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই জানিয়েছেন, যতটুকু জানলে এবং বিশ্বাস করলে আমরা জাগতিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারব। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মালাকগণ সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও হাদীস মূলত আল্লাহর সাথে মালাকগণের সম্পর্ক, সৃষ্টি পরিচালনায় ও আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তাঁদের দায়িত্ব এবং মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়েই আালোচনা করা হযেছে। তাঁদের সৃষ্টি ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণত বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপ:

৪. ২. ৭. ১. মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট

কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির পূর্বে মালাকগণকে সৃষ্টি করেন, মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা আদমকে সাজদা করেন। যেমন একস্থানে আল্লাহ বলেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

"তোমার প্রতিপালক যখন মালাকগণকে বলেছিলেন: 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি মাটি থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো।' তখন মালাকগণ সকলেই সাজদাবনত হলেন।"[৪১৫]

৪. ২. ৭. ২. মালাকগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা

মক্কার কাফিরগণ মালাকগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা-সন্তান বলে কল্পনা করত, তাঁদের ইবাদত করত এবং দাবি করত যে, তাঁদের ইবাদত করলে তাঁরা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। তাদের এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[৪১৬]

৪. ২. ৭. ৩. মালাকগণ নূরের তৈরি

মানুষ ও জিন্ন জাতির সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে মানুষকে মাটি থেকে এবং জিন্ন-কে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মালাকগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে কিছুই বলা হয় নি। তবে একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁদেরকে নূর বা আলো থেকে তৈরি করা হয়েছে।

خُلِقَتْ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"মালাকগণকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিন্নদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মানুষকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো তোমাদেরকে জানানো হয়েছে।"[৪১৭]

৪. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি

মালাকগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি, তবে আমরা জানি যে, তাঁদের কম-বেশি বিভিন্ন সংখ্যার পাখা আছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা-বিশিষ্ট মালাকগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।"[৪১৮]

তাঁদের পাখার প্রকৃতি বা সংখ্যা আল্লাহই জানেন। তবে জিবরাঈল (আ)-এর বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ৬০০ পাখা আছে। মহান আল্লাহ সূরা নাজমে বলেছেন:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

"অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান থাকল, অথবা তারও কম।"[৪১৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ

"নবী (ﷺ) জিবরীলকে দেখেন তার ছিল ৬০০ টি পাখা।"[৪২০]

আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জিবরীল (আ)-এর আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে জানা যায়। তাবিয়ী মাসরূক বলেন:

كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ)، (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ (وفي رواية: أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ) فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ)

"আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেন, হে আবূ আয়েশা (মাসরূক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা যদি কেউ বলে তবে সে আল্লাহ নামে জঘন্য মিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে। আমি বললাম: সে কথাগুলি কী কী? তিনি বলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যচারী বলে গণ্য হবে। মাসরূক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম। তাঁর কথায় আমি উঠে বসলাম এবং বললাম: হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে একটু কথা বলতে দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না। আল্লাহ কি বলেন নি: "সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল"[৪২১], "নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল"[৪২২]?

আয়েশা (রা) বলেন: এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেন: "এ হলো জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর কখনো তাঁকে তাঁর সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।" আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত"[৪২৩]? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"[৪২৪]?

আয়েশা (রা) বলেন, আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাবের কিছু বিষয় গোপন রেখে গিয়েছেন সেও আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন: "হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"[৪২৫] তিনি আরো বলেন: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগামীকাল (ভবিষ্যতে) কি হবে তা বলতেন (অন্য বর্ণনায়: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি আগামীকালে (ভবিষ্যতে) কী আছে তা জানতেন) তবে সেও আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন[৪২৬]: "আপনি বলুন: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[৪২৭]

৪. ২. ৭. ৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মালাকগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ঈসা (আ)-এর আম্মা মারইয়াম (আ)-এর মাতৃত্বের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"তখন আমি তার (মারইয়ামের) কাছে আমার রূহকে (পবিত্র আত্মা: জিব্রাঈল) প্রেরণ করলাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।"[৪২৮]

হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এ সকল বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সময় জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হতেন। কখনো মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন। কখনো মানুষের বেশে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে সাহাবীদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যাতে উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানতে পারেন।[৪২৯]

৪. ২. ৮. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস

৪. ২. ৮. ১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ

মালাইকা বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ইতোপূর্বে একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, মালাকগনের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: "তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।" অন্যত্র আল্লাহ তাঁদের বিষয়ে বলেন:

لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তাঁরা পালন করে।"[৪৩০]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই (আল্লাহরই)। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।"[৪৩১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

"যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না, তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সাজদাবনত হয়।"[৪৩২]

৪. ২. ৮. ২. কর্মনির্বাহ ও কর্মবণ্টন

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবীহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও মালাকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

"শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা কর্ম নির্বাহ করে।"[৪৩৩]

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মালাকগণকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করেন, কেউ মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করেন, কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলি নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ, চলাচল বা যাতায়াত করেন এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

"শপথ কর্মবণ্টনকারীগণের (কর্মবণ্টনকারী মালাকগণের)।"[৪৩৪]

এভাবে আমরা সাধারণভাবে ফিরিশতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা তাঁদের বিভিন্ন বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁদের এ সকল দায়িত্ব ও কর্মের মধ্যে রয়েছে:

৪. ২. ৮. ৩. ওহী পৌঁছানো

মালাকগণের একটি মৌলিক দয়িত্ব নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর ওহী পৌঁছান। জিবরাঈল (আ)-এর নাম ও পরিচয় বিষয়ক আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি আয়াত দেখেছি।[৪৩৫]

৪. ২. ৮. ৪. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ

মালাকগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

"মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।"[৪৩৬]

৪. ২. ৮. ৫. মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ... ثُمَّ قَرَأَ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) الآيَة

"শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার মালাকও (ফিরিশাতও) মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শয়তানের প্রেরণা অশুভ ও অকল্যানের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা। মালাকের প্রেরণা হলো কল্যাণের ও মঙ্গলের ওয়াদা করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া। ... এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি[৪৩৭] পাঠ করেন: "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্ললতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়,

সর্বজ্ঞ।"[৪৩৮]

৪. ২. ৮. ৬. মুমিনদের জন্য দু'আ করা

মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ, এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪৩৯]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করেন।

৪. ২. ৮. ৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা

কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে মালাক নিয়োগ করেছেন তার সৎ-অসৎ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআন কারীমে তাঁদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বা সম্মানিত লেখকগণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"দুই গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।"[৪৪০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর।"[৪৪১]

৪. ২. ৮. ৮. মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ

কুরআন- হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদল মালাককে। আল্লাহ বলেন:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।"[৪৪২]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"আপনি বলুন, তোমাদের জন্য নিয়ুক্ত 'মালাকুল মাওত' (মৃত্যুর মালাক) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।"[৪৪৩]

কুরআনে বা নির্ভরযোগ্য হাদীসে 'মালাকুল মাউতের' নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে কোনো কোনো মুফাস্‌সির তাঁর নাম আযরাঈল বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যামানার মুসলিমদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ।[৪৪৪]

৪. ২. ৮. ৯. আরশ বহন করা

মালাইকা বা ফিরিশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম মহান আর্‌শ বহন করা। এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ বলেছেন: "যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের

প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে... ।" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

"এবং সেইদিন আটজন (মালাক) তাদের প্রতিপালকের আর্‌শকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে ।"[৪৪৫]

৪. ২. ৮. ১০. অন্যান্য কর্ম

এছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানি যে, আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মালাককে দায়িত্ব দিয়েছেন। চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুনের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের শাস্তিদানের জন্য, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তিদানের জন্য বিভিন্ন মালাককে দয়িত্ব প্রদান করেছেন আল্লাহ ।

মুসলিমদের জিকিরের মাজলিস, আলোচনার মজলিস, ইলমের মাজলিস, সালাতের জামাত ইত্যাদি সৎকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু মালাক, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর রওযা মুবারকে পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার নাকির নামক মালাক। 'মালিক' (আ)-কে দিয়েছেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। ইস্রাফিল (আ)-কে দিয়েছেন কিয়ামতের সিংগায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব। মিকাঈল ফিরিশতা বৃষ্টিপাত ও ফল-ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনি এসকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ। সকল সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রনে, সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁরই সৃষ্টি, ফিরিশতাগণ তাঁরই দাস। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনে। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[৪৪৬]

৪. ২. ৯. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক অনুসরণ ও বিশ্বাসই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। গাইবী বিষয়ে ওহীর সাথে কল্পনা, ধারণা, যুক্তি ইত্যাদি মিশ্রিত করে ওহীর অতিরিক্ত কিছু বলা বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করে। মালাকগণের বিষয়ে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো কোনো জাতি।

৪. ২. ৯. ১. দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেন নি। এই দায়িত্বকে অতীত কালের অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় 'ক্ষমতা' বলে বিশ্বাস করেছে। এরপর তারা এ সকল 'মালাক' বা ফিরিশতাকে ভক্তির নামে ইবাদত করেছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করেছে। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ মালাকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান নি। কিন্তু অনেক বিভ্রান্ত জাতি তাদের মধ্যকার অনেক নবী, ওলী, 'বীর' 'সাধু' বা 'সৎ' মানুষকে মৃত্যুর পরে 'মালাকগণের' মত 'দায়িত্বপ্রাপ্ত' বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি করেছে। এরপর তারা দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। এরপর তারা তাদের ইবাদত করেছে বা তাদের কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চেয়েছে।

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও নির্দেশকে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মত সেই ফিরিশতাকে বৃষ্টির দেবতা মনে করে তার কাছে বৃষ্টি চেয়ে প্রার্থনা করেন না। অনুরূপভাবে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ প্রাণ সংহারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে তারা সেই ফিরিশতাকে প্রাণ সংহারের ক্ষমতাশালী মনে করে দীর্ঘায়ূ চেয়ে তার কাছে প্রার্থনা করেন না।

এভাবে আমরা মালাকগণ সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতে পারছি। একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আল্লাহর। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি যেমন আলো ও তাপ দানের জন্য সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, জীবনের উৎস হিসেবে পানিকে সৃষ্টি করেছেন, বাতাস প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আলোছায়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মালাকগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই সূর্য ছাড়াই আলো ও তাপ দিতে পারেন বা পানি ছাড়াই ফসল দিতে পারেন। তবে তিনি এই মহাবিশ্বকে একটি সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের আর সব সৃষ্টির মত ফিরিশতারাও আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাঁরই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। তাই আমরা ফিরিশতাকে সম্মান করি, তাঁদেরকে ভালবাসি, আল্লাহর কাছে তাঁদের কল্যাণ ও শান্তি চেয়ে দু'আ করি এবং বলি (আলাইহিমু সালাম: তাঁদের উপর শান্তি হোক), কিন্তু কখনই তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি না, তাঁদেরকে উপাসনা করি না, তাঁদেরকে ডাকি না।

৪. ২. ৯. ২. সম্পর্ক ও সুপারিশ

কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা মালাক বা ফিরিশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তাদের এই বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত। তারা বিশ্বাস করত যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত। আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের রয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতা বা ঐশ্বরিক শক্তি।

কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিকগণ মালাকগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত।[৪৪৭] এতেই তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং তাঁদের শাফায়াত ও সুপারিশ লাভের আশায় তারা তাদের ইবাদত উপাসনা করত বা তাদেরকে ডাকত। এছাড়া অন্য অনেক মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন সৎ মানুষ বা নবী-রাসূলকে আল্লাহর সন্তান বলে বিশ্বাস করে তাদের শাফায়াত-সুপারিশ লাভের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করত। কারণ, যেহেতু এরা বিশেষ সৃষ্টি ও বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী, সেহেতু আল্লাহ এদের সুপারিশ ফেলবেন না। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে 'আমি ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত', তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"[৪৪৮]

মহান আল্লাহ মালাকগণের বা আল্লাহর অন্যান্য সম্মানিত সৃষ্টির 'শাফা'আতের' সুযোগ অস্বীকার করেন নি। তবে এক্ষেত্রে কাফিরদের 'বিকৃতি'র প্রতিবাদ করেছেন। কাফিরগণ আল্লাহর সাথে মালাকগণ বা আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত বান্দাগণের সম্পর্ককে পৃথিবীর রাজাবাদশার সাথে আমলা-চামচাদের সম্পর্কের মত মনে করেছে। পৃথিবীর শাসক বা রাজার অজ্ঞাতে অন্যায়কারী তার কোনো প্রিয়পাত্রকে তোয়াজ করে সুপারিশ আদায় করে নিতে পারে। আর এরূপ সুপারিশে শাসক বা রাজা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আর এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রার্থী উক্ত 'আমলা'-কে যেকোনো প্রকারে ভক্তি বা তোয়াজ করে সুপারিশ আদায়ের চেষ্টা করেন। উক্ত রাজাকে যেমন ভক্তি তোয়াজ করেন, আমলাকেও তদ্রূপ বা তার চেয়ে বেশি করলেও অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তাদের এ সকল বিভ্রান্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রথমত ফিরিশতাগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণ 'আল্লাহর বান্দা', আল্লাহর সন্তান নন, বা আল্লাহর সাথে তাদের সৃষ্টিগত কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই বা তাঁদের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। তাঁদের কেউ তাঁর অবাধ্য হলে বা কোনো প্রকারের ইশ্বরত্ব বা উপাস্য হবার দাবী করলে তাদেরকে ও অন্য সকল অত্যাচারী পাপীর মত শাস্তি পেতে হবে।

মালাকগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণের সুপারিশ কখনোই জাগতিক রাজা-বাদশাহগণের কাছে আমলাদের সুপারিশের মত নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ফিরিশতাগণ বা নেক বান্দাগণ সদা সর্বদা তাঁরই ভয়ে ভীত। তাঁরা শুধু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যই আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন। যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন না। কাজেই পাপ, শিরক ও অবিশ্বাসে লিপ্ত থেকে ফিরিশতাদের শাফাআতের আশা করা কাফিরদের অবাস্তব কল্পনা। আর কোনো কাফির যদি ভক্তির নামে বা শাফা'আতের আশায় তাদের কাউকে 'ইবাদত' করে আর তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয় তবে আল্লাহ তার জন্যও ভয়ঙ্কর শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

"আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুমতি না দেন।"[৪৪৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"তবে কি তারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন: তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকওে এবং তারা না বুঝলেও?' বলুন: 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।"[৪৫০]

এভাবে কুরআন মালাকগণের শাফা'আত অস্বীকার করছে না। তবে তাদের শাফা'আতের মালিকানা বা ক্ষমতার ধারণার ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করছে। শাফা'আতের মালিকানা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা যখন অনুমতি প্রদান করবেন সে তখন কেবলমাত্র যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন তাদেরই সুপারিশ করবেন।

৪. ২. ১০. মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ

আমরা দেখেছি যে, অদৃশ্য জগতের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র সে সকল বিষয়ই জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে

নির্দেশ দিয়েছেন যার বিশ্বাস আমাদের জীবনে কল্যাণ ও পূর্ণতা বয়ে আনে। আমরা একটু চিন্তা করলেই মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ অনুভব করতে পারব।

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কল্যাণ, আমরা আল্লাহর এই সম্মানিত বান্দাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করি এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের কুসংস্কার, অলীক বিশ্বাস, অতিভক্তি, শিরক ইত্যাদি থেকে আমরা রক্ষা পাই, যে সকল কুসংস্কার মানুষের ইহলৌকিক জীবনকে অস্থিরচিত্ত, ভীত সন্ত্রস্থ করে তুলে, কল্যাণের কামনায় তারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়, তাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বহুবিভক্ত। উপরন্তু এসকল কুসংস্কার তাদের জন্য বয়ে আনে পরলৌকিক ধ্বংস ও সর্বনাশ, কারণ আমরা জানি যে, শিরকের একমাত্র পরিণতি জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি।

এছাড়া ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব জানতে পারি। এ বিশ্বাস আমাদের মনে শান্তি বয়ে আনে। একজন বিশ্বাসী কখনই নিজেকে অসহায় মনে করেনা। একাকিত্বের অনুভূতি কখনই তাকে গ্রাস করবে না। তিনি সর্বদা অনুভব করেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তাকে ঘিরে রেখেছেন, তাঁদের দু'আ তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। সকল কষ্ট, সকল বেদনা উত্তরণে তিনি সাহস ও প্রেরণা পাবেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সকল হতাশাকে জয় করতে পারবেন।

মালাকগণে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণ ও সততার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি জানেন যে, কল্যাণ-কর্মে রত মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন মালাকগণ। একজন মুসলিম অন্যান্য মুসলিমের কল্যাণের জন্য তাদের অনুপস্থিতে অন্তরের আকুতি দিয়ে দু'আ করেন, কারণ তিনি জানেন যে, এ দু'আর ফলে তিনিও লাভবান হবেন। আল্লাহর মালাকগণ তার জন্য দু'আ করেন। এমনিভাবে সকল ন্যায় ও কল্যাণের কাজে তিনি প্রেরণা ও উৎসাহবোধ করেন।

এ ছাড়া মালাকগণের ঈমান আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ঈমান দান করুন।

৪. ৩. আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস

ঈমানের অন্যতম রুকন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা। আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 'আল্লাহর গ্রন্থসমূহে' বিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার সাধারণ প্রকাশ এই যে, মুমিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের নিকট ওহীর মাধ্যমে 'কিতাব' প্রেরণ করেছেন, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হেদায়াত, মানবজাতির পথনির্দেশক নূর। তবে সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন' নাযিল করেছেন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পূরণ করতে এবং পূর্ববতী সকল কিতাবকে রহিত করতে। এই সর্বশেষ কিতাব কুরআনের মধ্যেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানব জাতির মুক্তির পথ রয়েছে।

আল্লাহর কিতাবসমূহের ঈমানের বিস্তারিত দিকগুলি নিম্নরূপ:

৪. ৩. ১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন

মানব জাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে-যুগে তাঁর নবী রাসূলদের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে ছিল সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের জন্য সত্য ও সৎ পথের দিশা। আমরা তাই সাধারণভাবে বিশ্বাস করি যে, যুগে-যুগে নবী রাসূলগণের কাছে আল্লাহ তাঁর বাণী গ্রন্থ আকারে প্রেরণ করেছেন, যার মধ্যে তিনি তৎকালীন মানব সমাজের জন্য সত্য, সৎ কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের নির্দেশনা দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভূক্ত। অত:পর আল্লাহ সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।"[৪৫১]

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যে সকল গ্রন্থে মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে পারি না। অন্যত্র আল্লাহ কতিপয় নবীর (আ) নাম উল্লেখ করে তাঁদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের উপররে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে, সবকিছুর উপরে আমরা বিশ্বাস আনয়ন করেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাঁর (আল্লাহ) নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।"[৪৫২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

"এ তো আছে পূর্ববর্তী 'সাহীফা'গুলিতে; ইবরাহীম ও মূসার 'সহীফা'গুলিতে।"[৪৫৩]

'সাহীফা' অর্থ 'লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ', 'পুস্তিকা' বা গ্রন্থ। এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবরাহীম ও মূসাকেও সাহীফা বা গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিল।

৪. ৩. ২. জানা ও অজানা কিতাব

এভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীগণের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর সকল গ্রন্থই ছিল সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারী। কিন্তু আমরা এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। আমরা কেবল আল্লাহর অপার করুণা, মানব জাতির হেদায়াতের জন্য গ্রন্থ নাযিলের ধারায় বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি যে যুগে যা কিছু নাযিল করেছেন সব কিছুই সংশ্লিষ্ট মানুষদের জন্য সুনিশ্চিত সত্য ও কল্যাণের দিশারী ছিল।

৪. ৩. ৩. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব

কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে 'তাওরাত', 'যাবূর' ও 'ইনজীল'- এই তিনটি পুস্তকের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

প্রথমত: আল্লাহ তিনজন প্রসিদ্ধ নবীকে গ্রন্থত্রয় প্রদান করেছিলেন।

(১) তাওরাত: কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আ)-এর কাছে তাওরাত নামক গ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

"এবং মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়া-স্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।"[৪৫৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও নূর (আলো)। নবীগণ যারা আল্লাহ অনুগত ছিল তারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ (আল্লাহওয়ালাগণ) এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৪৫৫]

(২) যাবুর : মহান আল্লাহ তাঁর নবী দাউদ (আ)-কে যাবূর গ্রন্থ প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

"আমি নবীগণকে কারো উপরে কারো অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছি; এবং দাউদকে আমি যাবূর প্রদান করি।"[৪৫৬]

(৩) ইনজীল : কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর নবী ঈসা (আ)-কে যে গ্রন্থ প্রদান করেন তার নাম ছিল "ইনজীল"। আল্লাহ বলেন:

وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

"মারয়াম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও নূর (আলো)।"[৪৫৭]

দ্বিতীয়ত: তাঁদের অনুসারীগণ গ্রন্থগুলি বিকৃত করেছে।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করি যে, উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থকেই তাদের অনুসারীগণ বিকৃত করেছে। 'বনী ইসরাঈল' বা 'আহলু কিতাব' তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করে বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের অবস্থা তো এই যে, তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবন করত এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।"[৪৫৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এ আল্লাহর নিকট হতে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের।"[৪৫৯]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।"[৪৬০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

"যারা বলে 'আমরা খৃস্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তার ভুলে গিয়েছে।"[৪৬১]

ইহূদী-খৃস্টানগণ কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরত্ব' দাবি করে এবং তাদের ইবাদত করে। বিশেষত খৃস্টানগণ দবি করে যে, ঈসা (আ) নিজেকে 'আল্লাহ' বলে দাবি করেছেন। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, এ সকল বক্তব্য যা কিছু তাদের কিতাবে রয়েছে সবই বিকৃতি ও সংযোজন। কোনো নবী কখনোই আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করতে বলতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

"তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে: 'তা আল্লাহর পক্ষ হতে', কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে। কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মত ও নুবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমার আমার বান্দা হয়ে যাও'- তা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা রাব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।"[৪৬২]

তৃতীয়ত: বিকৃত অবস্থায় সেগুলির অস্তিত্ব আছে এবং সেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মূল তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলের অনেক অংশ তারা ভুলে, অবহেলায় ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করেছে। আবার কিছু পুস্তক তারা নিজেরা লিখে ওহী বলে চালিয়েছে। তবে অন্যান্য গ্রন্থের মত তা একেবারে হারিয়ে যায় নি। বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, বিলুপ্তি, ভুয়ে যাওয়া, গোপন করা ইত্যাদির পরেও 'আহলু কিতাব' বা ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল নামে কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের বিষয়ে, তাওহীদ ও রিসালাতের বিষয়ে, শরীয়ত বা ব্যবস্থার বিষয়ে এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে অনেক সঠিক শিক্ষা এখনো বিদ্যমান। এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আল্লাহ 'আহলু কিতাব'-দেরকে আহ্বান করেছেন। কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাস বা কর্মের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন; কারণ অনেক বিকৃতি তারা তাওরাত, যাবূর বা ইনজীলের মূল পাঠে সংযোগ করেছিল এবং কিছু বিষয় তার অর্থ ও তাফসীরের নামে বিকৃতি করলে মূল পাঠের মধ্যে তা ছিল না। মহান

আল্লাহ বলেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"ইহূদীরা বলে, 'খৃস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই', এবং খৃস্টানগণ বলে, 'ইহূদীদের কোনো ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে! এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মিমাংসা করবেন।"[৪৬৩]

অর্থাৎ তাদের গ্রন্থাবলি বিকৃত করার পরেও যা তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে তাও সুস্পষ্ট বা আক্ষরিকভাবে তাদের এই দাবি প্রমাণ করে না। বরং তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাব প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি আছে এবং উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত। যাদের কোনোই কিতাব নেই তারা যেমন আন্দাযে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বলে এরাও তেমনি কথা বলে।

ইহূদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিব্রত করার জন্য তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

"তারা কিভাবে তোমার উপর বিচারভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ বিদ্যমান? তার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়।"[৪৬৪]

অর্থাৎ যে বিষয়ে তারা বিচার প্রার্থনা করছে সে বিষয়ক বিধান তাওরাতেই বিদ্যমান। অথচ তদানুসারে বিচার না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিচার চাওয়া প্রমাণ করে যে, তারা অবিশ্বাস ও প্রতারণার জন্যই এরূপ করেছে।

ইহূদীরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম। বিষয়টি তাদের বানোয়াট ব্যাখ্যা মাত্র, তাওরাতে তা ছিল না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার ইসরাঈল (ইয়াকূব) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন তা ব্যতীয় বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বল: 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আন এবং পাঠ কর।"[৪৬৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

"বলুন, হে কিতাবীগণ, তাওরাত, ইন্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (আল-কুরআন) তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তিই নেই।"[৪৬৬]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক (সত্যত্যাগী)।"[৪৬৭]

চতুর্থত: ওহী ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্যের মাপাকাঠি কুরআন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তাঁর তিন নবীকে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল নামে তিনটি আসামানী গ্রন্থ প্রদান করেন, যেগুলিতে নূর ও হেদায়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বেই তাঁদের অনুসারীগণ বিভিন্নভাবে পুস্তকগুলির কিছু অংশ ভুলে যায় ও বিলুপ্ত করে এবং বিদ্যমান অংশ বিকৃত ও পরিবর্তিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং বর্তমানে এ নামে যে পুস্তকগুলি বিদ্যমান সেগুলির মধ্যে কিছু ওহী এবং কিছু ওহীর নামে মানবীয় সংযোজন, পরিবর্তন বা বিকৃতি বিদ্যমান। এগুলির মধ্যে ঠিক কোন্ কথাটি সঠিক ওহী এবং কোন্ কথাটি বিকৃতি তা বুঝার বা যাচাই করার কোনো নিরপেক্ষ উপায় নেই। এজন্য আল-কুরআনই সত্যাসত্য যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-

নিয়ন্ত্রক (watcher) রূপে।"[৪৬৮]

এভাবে আমরা জানছি যে, আল-কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের নিয়ন্ত্রক, পর্যবেক্ষক ও পরীক্ষক। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোনো তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্য বলে প্রমাণিত তাকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে আমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকি; কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সহজ মূলনীতি শিখিয়েছেন। ইহূদী-খৃস্টানদের কিতাবে যা কিছু রয়েছে তা কুরআনের আলোকে বিচার করা সাধারণভাবে সকলের জন্য হয়ত সহজ নয়। কাজেই এ সকল পুস্তকের কিছুই সঠিক বলে গ্রহণ করার বা মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে না। বরং বলতে হবে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা সঠিক। তোমাদের গ্রন্থে কোন্ কথাটি সঠিক এবং কোন্টি বিকৃতি তা তিনিই ভাল জানেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ... الآيَة.

কিতাবীগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে তা আররীতে অনুবাদ করে মুসলিমদের শুনাতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা কিতাবীদেরকে সত্য বলেও বিশ্বাস করবে না এবং মিথ্যা বলেও ঘোষণা দিবে না। বরং বলবে: "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের উপরে[৪৬৯]...... আয়াত।"[৪৭০]

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন নাযিলের সময় এবং পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর যাবত ইহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করত যে, তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদি গ্রন্থ সবই আক্ষরিকভাবে বিশুদ্ধ। এর মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি হয় নি। কিন্তু গত কয়েকশত বৎসরের গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইহূদী খৃস্টানগণই প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের অনেক পুস্তিকা হারিয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার স্থানে পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাদের এ আবিষ্কার কুরআন কারীমের অলৌকিক সত্যতার আরেকটি প্রমাণ। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোকে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল নামক গ্রন্থগুলির বা বর্তমানে 'বাইবেল' নামে পরিচিত গ্রন্থটির মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, অসঙ্গতি, পরস্পর বিরোধিতার অসংখ্য নমুনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রমাণাদি জানার জন্য আমি পাঠককে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৮৯১ খৃ) রচিত 'ইযহারুল হক্ক' নামক কালজয়ী গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহর তাওফীকে আমি পুস্তকটি অনুবাদ করেছি এবং ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ তা প্রকাশ করেছে।

৪. ৩. ৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন

আল-কুরআনুল কারীমের পরিচয় সম্পর্কে এ পুস্তকের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। মানবজাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে আহবানের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ গ্রন্থ। কুরআন কারীমে মানবজাতির সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল ও সকল সফলতার উৎস। আল্লাহর এই সর্বশেষ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলিকে দেননি। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে কুরআন করীমের এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব:

৪. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব

কুরআন কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অলৌকিকত্ব। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক 'আয়াত' বা মুজিযা প্রদান করেছেন। সেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাঁদের সমসাময়িক মানুষেরা সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে পরবর্তী মানুষেরা আর তা প্রত্যক্ষ করেন নি। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মহান আল্লাহ অন্যান্য অগণিত আয়াত বা মুজিযার পাশাপাশি 'চিরন্তন' মুজিযা হিসেবে আল-কুরআন প্রদান করেন। যার অলৌকিকত্ব যেমন তাঁর সমকালীন মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত হয়েছেন যে মুজিযার পরিমাণে মানুষেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে 'আয়াত' বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, এজন্য আমি আশা করি যে, নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।"[৪৭১]

বস্তুত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে

লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ।

মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য 'নিয়ম পুস্তক' নয়, বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে অর্থ, ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। আর এই অপার্থিব ও অলৌকিক ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থের আবহের সর্বোচ মান রক্ষিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্থানে একইভাবে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক।

আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সহিত্যের মূল্যায়নে ছিলেন অতি পারঙ্গম। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন কুরআনের যে কোনো একটি ছোট সূরার সমপরিমাণ সূরা কুরআনের সাহিত্যমানে রচনা করার জন্য।"

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"[৪৭২]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তারা কি বলে, 'সে তা রচনা করেছে?' বল: 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৪৭৩]

তিনি আরো ঘোষণা করছেন:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

"বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।"[৪৭৪]

কাফিরগণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রতিহত করতে তাদের জান-মাল কুরবানী করেছে, কিন্তু এই সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণীতায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে 'যাদু' বলে অভিহিত করেছে।[৪৭৫] কখনো বলেছে, এগুলি পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী[৪৭৬] এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ (ﷺ) তা বানিয়েছেন[৪৭৭]। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছে: "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।"[৪৭৮]

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ। কিন্তু কখনোই এর মুকাবিলায় একটি ছোট্ট সূরা তারা উপস্থাপন করে নি। আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভুতি সুপ্রসিদ্ধ, তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্তি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ এই সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল না।

নুবুওয়াতের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব

ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যাণ করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল।

আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

৪. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক এর সংরক্ষণ। মহান আল্লাহ কুরআনকে অবিকল ও আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

আমরা জেনেছি যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে। যেহেতু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহ পরবর্তী সকল যুগের মানুষদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, তাই তিনি নিজে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে পবিত্র কুরআন সকল পবিবর্তন, পরিবর্ধন কোনো অংশের বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত থেকেছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরূপেই আমি তাঁর সংরক্ষক।"[৪৭৯]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো অসত্য এতে অনুপ্রবেশ করে না বা করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়। প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে তা অবতীর্ণ।"[৪৮০]

বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদির ভাব, ভাষা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, এগুলি প্রথমত কতিপয় ধর্মগুরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এগুলির স্থান ছিল না। উপরন্তু সাধারণ মানুষদেরকে এগুলি পাঠ করতে নিষেধ করা হতো। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে সামান্য কিছু অংশ পাঠ ছাড়া সাধারণ মানুষ এসকল পুস্তকের কোনো খোঁজ রাখতো না। এছাড়া এগুলির ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর বর্ণনা, যা কোনোভাবেই মুখস্থ রাখা যায় না। এ সকল কারণে এগুলির বিকৃতি ও বিলুপ্তি সহজ হয়।

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক যে, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এবং রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন পাঠ ও কুরআন 'খতম' করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়মিত পাঠ করাকে মহান আল্লাহ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছে তারা যথাযথভাবে তা আবৃত্তি করে তারাই এতে ঈমান আনে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।"[৪৮১]

কুরআন কারীমের অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক। এর অপূর্ব ভাষাশৈলী ও অপার্থিব অর্থ-আবহ যে কোনো মুমিনকে তা পাঠ করতে আগ্রহী করে তোলে। সর্বোপরি অলৌকিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা অলৌকিকভাবে সহজ করেছেন। আমরা জানি যে, নিজের মাতৃভাষার রচিত ১০০ পৃষ্ঠার একটি সাহিত্যকর্ম হুবহু আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখা যে কোনো মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব বিষয়। অথচ ১০/১২ বৎসরের একজন অনারব কিশোরও কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখতে সক্ষম। এই অলৌকক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীগণের যুগ থেকেই অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন কারীম পরিপূর্ণ মুখস্থ করেছেন। তাঁরা রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন খতম করতেন। এছাড়া দিবাভাগে নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা খতম করতেন।

একারণে কুরআন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অবিকল সেভাবেই মুখস্থ করেছেন, সালাতের মধ্যে পাঠ করেছেন ও নিয়মিত খতম করেছেন সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মানুষেরা সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতির কোনো সুযোগই ছিল না।

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআন কারীম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার যথাযথ

ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদীন।

বস্তুত: কুরআন কারীমে উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল, বা বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে যেমন আধুনিক খ্রিষ্টান ও ইহুদী গবেষকগণ একমত, তেমনিভাবে কুরআন কারীমের অবিকৃতিও অমুসলিম গবেষকরাও মেনে নিয়েছেন। যারা কুরআনকে আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন না, বরং মুহাম্মদ (ﷺ)- এর রচনা বলে মনে করেন, তারাও স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সময়ের তাঁর প্রচারিত কুরআনই এখন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। কারণ, সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের কুরআন কারীমের হাতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পাঠাগারে বা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে, সে সকল পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৮২]

৪. ৩. ৪. ৩. সার্বজনীননতা

আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ অবতরণ করেছেন তাতে একদিকে একমাত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত, ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। অপর দিকে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক বিধান, সমাধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো মূলত সার্বজনীন। বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একই প্রকৃতির। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নমুখি সামাজিক ও জাগতিক সমস্যা থাকতে পারে এবং এ সকলের সমাধানও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল আসমানী কিতাবের বর্ণনা ও শিক্ষা একই ধরনের। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ মানবজাতিকে প্রদান করেছেন তা ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও নির্দিষ্ট একটি সময়কালের জন্য। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপযোগী সমাধানই দেওয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বে কোনো নবী-রাসূল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেন নি। উপরন্তু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষদের কাছে তাঁর ধর্ম বা কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন না।

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন। অথচ তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে 'যীশু' বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র 'ইস্রায়েল-সন্তানগণের' জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। বিকৃত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু খ্রীস্ট যখন তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহূদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না..."[৪৮৩] তিনি আরো বলেছেন: "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[৪৮৪]

এভাবে তিনি অ-ইহূদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন। এবং তাঁর ধর্মকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল সন্তান বা ইহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম ও দীক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, অ-ইস্রায়েলীয় বা অ-ইহূদীদেরকে যীশু সামন্য দু'আ করতে বা ঝাড়-ফুঁক দিতেও রাজি হন নি। বরং তাদেরক কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৮৫]

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সর্বদা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়ত ও কুরআনের নির্দেশনা 'মানব জাতি'র জন্য বলে উল্লেখ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বজনীনতা বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রামাদান মাস, যাতে মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[৪৮৬]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।"[৪৮৭]

এজন্য কুরআন কারীমে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আকীদা), নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক

দায়িত্বাবলি, সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ ও পরিণতি বর্ণনায় এমন এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে যেন, সকল যুগে সকল সমাজের মানুষই সাধারণ ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই এর শিক্ষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সামাজিক, জাগতিক বা বৈষয়িক সমস্যাসমূহের সঠিক ও কল্যাণমূখী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপভাবে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা, মূল্যবোধ, ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। আর এসব কিছুই সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সহজ ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, শিক্ষা গ্রহণের জন্য কি কেউ আছে?"[৪৮৮]

৪. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ

কুরআন অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থের পূর্বের সকল গ্রন্থকে রহিত করেছে। তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল বিষয়ক আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলির সমর্থক ও নিশ্চিতকারী, সেগুলির পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক। কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই কিতাবীদের মনগড়া বিষয়, কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির অনুসরণ করা যাবে না। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন করীমকে পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত বাণী, যাকে আল্লাহ সকল যুগের সকল মানুষের মুক্তির জন্য সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এর অনুসরণই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। কল্যাণ, বরকত, সফলতা ও মুক্তির সন্ধান দিয়ে মানুষকে তার কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে পারবে একমাত্র এই গ্রন্থই। আল্লাহ এই মহা গ্রন্থকে প্রেরণ করেছেন তা অনুধাবন করার জন্য এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রতিকার এবং সঠিক পথের পথনির্দেশ ও রহমত মুমিনদের জন্য।"[৪৮৯]

এই গ্রন্থের অনুসরণই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ ও রহমত পথে পরিচালিত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"আমি এই কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবাধান হও, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত পেতে পারবে।"[৪৯০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"নিশ্চয় এই কুরআন পথ নির্দেশ করে সর্বোত্তম বিষয়ের এবং সুসংবাদ প্রদান করে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।"[৪৯১]

আমরা দেখেছি যে, কুরআনকে আল্লাহ নাযিল করেছেন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায়, যেন সকল পাঠক সহজেই তা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারে। কুরআনের অর্থ চিন্তা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবব্ধ?"[৪৯২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ

"এটি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণা

করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"[৪৯৩]

এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব কুরআন পাঠ করা ও অনুধাবন করা। সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে কুরআন বুঝার মত সহজ আরবী শিক্ষা করা। না হলে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব কুরআন দিয়ে হৃদয় আলোড়িত ও আলেকিত করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর শিক্ষার অনুসরণ করা।

এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই নূর বা আলো যা মানব জাতিকে সত্য, কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। যার অনুসরণের মাধ্যমেই সফলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার (কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[৪৯৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা তাঁর (রাসূল উম্মী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"[৪৯৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

"হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।"[৪৯৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি আমার নির্দেশের রূহ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ।"[৪৯৭]

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"আমি এই কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে।"[৪৯৮]

আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ও তাঁর নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা বিশ্বাসীদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহর গ্রন্থের কিছু অংশকে বিশ্বাস করা আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করার অর্থ একে পুরোপুরি অবিশ্বাস করা। তেমনিভাবে এর শিক্ষা ও বিধানমত জীবণ পরিচালনা না করা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, অত্যাচার ও কঠিন পাপ। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অবিশ্বাসী।"[৪৯৯]

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অত্যাচারী।"[৫০০]

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো পাপী।"[৫০১]

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।"[৫০২]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অংশ। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম আল্লাহর প্রেরিত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস করেন। কুরআন কারীমের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আমাদের বিশ্বাস মৌলিক সত্যতায় বিশ্বাস ও সম্মান দানে সীমাবদ্ধ, আর কুরআনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কর্মময়। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে-যুগে যত গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন সবই সত্য এবং সবই আল্লাহ বাণী। তবে যেহেতু পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে, তাই সেসকল গ্রন্থের অনুসরণ বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমকে আল্লাহ সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য অবতারিত করেছেন এবং তাঁর বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করেছেন। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর একমাত্র সংরক্ষিত বিশুদ্ধ বাণী বলে বিশ্বাস করেন এবং এর শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন।

৪. ৩. ৫. আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাসের কল্যাণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা আমাদের জীবনের জন্য অফুন্ত কল্যাণের উৎস। প্রথমত: এই বিশ্বাস আমাদের প্রতিপালক স্রষ্টার সাথে আমাদের মনের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে এবং তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে উঠে। আমরা মানুষের জন্য আল্লাহর অনন্ত ভালবাসা ও করুণা অনুভব করতে পারি। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে এবং বিবেক ও বিচার জ্ঞান দান করেই ছেড়ে দেননি। উপরন্ত আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশা দানের জন্য তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। বিশেষত মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যে সকল বিষয় বুঝতে পারে না বা শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বুঝতে গেলে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মানুষ ভালমন্দ বুঝলেও পার্থিব স্বার্থ বা কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল মত দান করতে পারে সেসকল বিষয়ে সঠিক পথের ও সঠিক মতের জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে থাকতে পারে। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এ এক অপরীসীম করুণা। এ করুণার উপলব্ধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গভীর করে। আমরা জানি যে, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার অনুভব আমাদের মনের সকল প্রশান্তি ও শক্তির উৎস। এই অনুভব যত গভীর হবে, আমাদের মনের প্রশান্তি এবং শক্তিও তত প্রগাঢ় হবে।

উপরন্ত এই বিশ্বাস আমাদেরকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের অনুসরণ এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবণ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। আর আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বাণীর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও সফলতা।

এছাড়া আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিরাজিত ধর্মীয় আচার আচরণে বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরণের বিধান দান করেছেন। এসকল ধর্মের বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান মূলত এক। তবে ব্যবহারিক বিধানবলী সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ছিল। সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন প্রেরণ করে আল্লাহর সকল বিধানের সমন্বয় সাধন করেছেন।

৪. ৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়ে বিশ্বাস আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূলগণের প্রতি ইসলামী বিশ্বাসের অবশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করব।

৪. ৪. ১. আল্লাহর অপার করুণা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর অপার করুণা সিক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এই প্রিয় ও সম্মানিত সৃষ্টিকে দায়িত্ব দিয়েছেন এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করার। এই দায়িত্বের সাথে সংগতি সম্পন্ন বিভিন্ন গুণাবলি তাদেরকে দান করেছেন। তাদেরকে তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সম্মান দান করেছেন, দান করেছেন বিবেক ও উন্নত জ্ঞান। মানুষের অন্তরে দিয়েছেন শুভ, মঙ্গল ও কল্যাণময় কমের প্রতি আকর্ষণ ও অশুভ- অকল্যাণের প্রতি বিরক্তি। তাকে দিয়েছেন লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ভালবাসা, আত্মপ্রেম ইত্যাদি মৌলিক মানবীয় শক্তি বা গুণাবলি, যে সকল গুণের সঠিক প্রয়োগ মানুষকে তার মানবীয় পূর্ণতার শিখরে উঠায়। আবার এ সকল গুণ বা স্বভাবজাত শক্তির ভুল প্রয়োগ মানুষকে মানবেতর জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত করে।

তাই সৃষ্টি জগতে মানুষের সম্মানের সাথে সাথে তার দায়িত্ব অপরীসিম। আর এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং পরলৌকিক মুক্তি ও শান্তি।

মানুষের প্রতি মহান স্রষ্টার করুণা অসীম। তিনি তাকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও গুণাবলী দান করা

ছাড়াও তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন।

৪. ৪. ২. নবী ও রাসূল

আল্লাহর মনোনীত এসকল মানুষকে ইসলামের পরিভাষায় নবী বা রাসূল বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি।

'নবী' (**النبيّ**) শব্দটি 'নূন, বা ও হামযা' তিন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত আরবী (**نَبَأَ**) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। 'নাবা' (**النَّبَأُ**) অর্থ সংবাদ, খবর ইত্যাদি। ক্রিয়া হিসেবে আন্‌বাআ (**أَنْبَأَ**) ও নাব্‌বাআ (**نَبَّأَ**) অর্থ সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা। এজন্য 'আন-নাবিইউ' (**النبيُّ**) শব্দটি মূলে ছিল 'আন-নাবী-উ (**النبيء**)। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে হামযাটি পরিবর্তিত হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে। 'আন-নাবিইউ' শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা।

আরবীতে 'নূন', 'বা' ও 'ওয়াও' তিন বর্ণের সমন্বয়ে আরেকটি শব্দ রয়েছে, যার অর্থ উচ্চ হওয়া। কোনো কোনো ভাষাবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'নবী' শব্দটি এই ধাতু থেকে গৃহীত। সেক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হয় 'সুউচ্চ, 'উচ্চীকৃত' বা 'মর্যাদাময়'। তবে কুরআন কারীমের বিভিন্ন ব্যবহার ও কুরআনের বিভিন্ন কিরাআতের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদেরকে 'সংবাদ' প্রদানের অর্থেই 'নবী' বলা হয়।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূল (**الرسول**) শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, দূত ইত্যাদি। আরবী 'আরসালা' (**أرسل**) অর্থ প্রেরণ করা। অন্যের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ, তথ্য বা বাণী নিয়ে যিনি আগমন করেন তাকে রাসূল বলা হয়।

ধর্মীয় পরিভাষায় নবী অর্থ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ-অশুভ বিভিন্ন কর্মের পথ ও পরিণতি সম্পর্কে সকল সংবাদ মানুষকে জানান, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষদেরক সংবাদ দান করেন। আর (রাসূল) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে, প্রাপ্ত বার্তা বা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌঁছে দেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থের দিক থেকে দুইটি শব্দই প্রায়ই সমার্থক। ব্যবহারের দিক থেকেও শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক। সকল নবী রাসূলই আল্লাহর মনোনীত মানুষ যাদেরকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী শিক্ষা দান করেছেন, যে শিক্ষা সাধারণ কোনো মানুষ মানবীয় জ্ঞান বা কোনো সাধনা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনা।

শব্দদ্বয়ের মধ্যে শরীয়তের পরিভাষায় কোনো পার্থক্য আছে কি না সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। মতভেদের কারণ এ বিষয়ে কুরআন কারীমের বা হাদীস শরীফে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এজন্য আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদ করেছেন। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী।

অধিকাংশ আলিম মতপ্রকাশ করেছেন যে, শব্দদুটির মধ্যে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা আরো একমত প্রকাশ করেছেন যে, রিসালাত (**الرسالة**) বা রাসূলের দায়িত্বর চেয়ে নুবুওয়াত (**النبوة**) বা নবীর দায়িত্ব সাধারণতর। এ জন্য সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে দীন বা শরীয়ত বিষয়ক কোনো নির্দেশনা লাভ করেন তিনিই নবী। আর রাসূল অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব লাভ করেন।

রাসূলের অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে তাঁরা খুটিনাটি মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন:

وَقَدْ ذَكَرُوا فُرُوقًا بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ، وَأَحْسَنُهَا أَنَّ مَنْ نَبَّأَهُ اللَّهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، إِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ فَهُوَ نَبِيٌّ رَسُولٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ فَهُوَ نَبِيٌّ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ.

"নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর মত যে, যাকে আল্লাহ আসমানী সংবাদ প্রদান করেন যদি তাকে আল্লাহ সেই সংবাদ অন্যকে প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন তবে তিনি নবী ও রাসূল। আর যদি তাকে এরূপ প্রচারের দায়িত্ব না দেওয়া হয় তবে তিনি নবী মাত্র, রাসূল নন।"[৫০৩]

মোল্লা আলী কারী বলেন:

الرسول من أُمِر بالتبليغ، والنبي من أُوْحِي إليه، أعم من أن يُؤمَرَ بالتبليغ أم لا. قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبي من غير عكس. وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه، لنقل غير واحد الخلاف فيه، فقيل: النبي مختص بمن لا يؤمر، وقيل هما مترادفان، واختاره ابن الهمام، والأظهر أنهما متغايران لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ) الآية

"যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি রাসূল। আর যাকে ওহী দেওয়া হয়েছে তিনিই নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হোক বা না হোক। কাযি ইয়ায বলেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, সকল রাসূলই নবী, তবে সকল নবী রাসূল নন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, আলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কাযি ইয়াযের বর্ণনাটিই সঠিক, অর্থাৎ এ বিষয়ে সকল আলিম একমত পোষণ করেন নি, বরং অধিকাংশ আলিম একমত পোষণ করেছেন। কারণ একাধিক আলিম এ বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয় নি তাঁকেই শুধু নবী বলা হয়। কেউ বলেছেন: নবী ও রাসূল দুটি একার্থবোধক শব্দ; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইবনুল হুমাম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। সঠিকতর মত যে, উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ

মহান আল্লাহ বলেছেন[৫০৪]: আমি আপনার পূর্বে যে কোনো রাসূল অথবা যে কোনো নবী পাঠিয়েছি... ।"[৫০৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষকেই নবী বলা হয়। যদি কোনো ওহী প্রাপ্ত মানুষকে আল্লাহর নতুন বিধানাবলী দান করে তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তাহলে তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যদি তাঁকে শুধু ওহীর মাধ্যমে, আল্লাহর বাণী দান করা হয়, নতুন কোনো বিধান প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে তিনি রাসূল নন, কেবলমাত্র নবী বলে আখ্যায়িত হন, যেমন ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁদেরকে নতুন কোনো বিধানাবলী দান করেন নি তাঁরা পূর্ববর্তী রাসূল মুসা (আ)-এর শরীয়ত অনুসারে তাঁদের জাতিকে পরিচালিত করতেন। আসমানী দায়িত্ব লাভের প্রথম পর্যায় নবীর দায়িত্ব লাভ এবং চূড়ান্ত পর্যায় রাসূলের দয়িত্ব লাভ।

৪. ৪. ৩. নবী রাসূলগণের সংখ্যা

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

"প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে।"[৫০৬]

অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

"প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল, আর যখন কোনো জাতির রাসূল তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা দান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে জুলুম করা হয়নি।"[৫০৭]

এসকল সতর্ককারী নবী-রাসূলের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানান নি। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে:

وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

"অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি আপনাকে বলি নি।"[৫০৮]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।"[৫০৯]

নবী-রাসূলদের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবী ইয়ালা মাওসিলী, সহীহ ইবন হিব্বান ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীগণের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক হাজার বা তার বেশি ছিল। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের নামে জালিয়াতি গ্রন্থে এ সকল হাদীসের সনদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।[৫১০]

যেহেতু এ বিষয়ক সংখ্যাগুলি খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস এবং বিশেষত এগুলির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন মুহাক্কিক আলিমগণ। মোল্লা আলী কারী বলেন: "বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন: ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ হাজার। তবে তাঁদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম।"[৫১১]

তিনি আরো বলেন: "উত্তম এই যে, নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা; কারন 'খাবারুল ওয়াহিত' পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে নির্ভর করা যায় না। বরং জরুরী এই যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণেল সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি

বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।"[৫১২]

৪. ৪. ৪. নবী-রাসূলগণের নাম

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসূফ, আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারূন, ইউনূস, দাউদ, সুলাইমান, ইল্‌ইয়াস, ইল্‌ইয়াসা', যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ (**عليهم الصلاة والسلام**)।[৫১৩]

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহূদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।[৫১৪] কিন্তু তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا أَدْرِيْ أَعُـزَيْـرٌ نَـبِـيٌّ هُـوَ أَمْ لاَ

"আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না।"[৫১৫]

মূসার (আ) খাদিম হিসাবে ইউশা ইবনু নূন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে আদম (আ) এর পুত্র "শীস"-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কালুত, হাযকীল, হাযালা, শামুয়েল, জারজীস, শামঊন, ইরমিয়, দানিয়েল প্রমুখ নবীর নাম, জীবণবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরাঈলীয় বর্ণনা ও সেগুলির ভিত্তিতে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মতামত।

কুরআন কারীমে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণকে আমরা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। এঁদের সবাইকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন। এঁদের নবুয়ত বা রিসালত আমরা অস্বীকার করিনা। কেউ যদি এঁদের কারো নবুয়ত বা রিসালাত অস্বীকার করেন, অথবা এঁদের ঘৃনা বা অবমাননা করেন তিনি অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য হবেন।

কুরআন-হাদীসে যাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাদের কাউকে আমরা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর মনোনীত নবী বলতে পারিনা। অন্য কোনো মানুষের সম্পর্কেই আমরা বলতে পারিনা যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ যুগে যুগে আরো অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহর মনোনীত প্রিয় পুত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বান্দা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁদের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা।

৪. ৪. ৫. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত

কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর মধ্যে কারো-কারো বিষয়ে আল্লাহ বিস্তারিত কিছু বর্ণনা দান করেছেন। যেমন, নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ইউসূফ, ঈসা, হুদ, সালেহ, ও লুত। আর কারো কারো সম্পর্কে শুধুমাত্র নবূয়তের উল্লেখ করেছেন, যেমন যুলকিফল, ইলইয়াস. ইলইয়াসা' (আলাইহিমুস সালাম)।

সকল নবীর ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা ও বিবরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, কখনোই তাদের ব্যপারে ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক তথ্য প্রদানের বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের বংশ বিবরণ, দেশ, যুগ, বয়স, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো কিছুই বলা হয়নি।

কুরআন কারীমে নূহ (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো নবীর আয়ুষ্কাল কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয় নি। আদম (আ) এর আয়ুষ্কাল **১** হাজার বৎসর বলে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

মূলত কুরআন কারীমে নবী-রাসূলগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আল্লাহর করুণা, সাহায্য, তাঁদের দাওয়াত বা তাঁদের জাতির প্রতি তাঁদের শিক্ষা ও আহবান কি ছিল, তাঁদের আহবানে তাদের জাতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল, তাঁদের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন এবং যারা অবিশ্বাস করেছেন তাঁদের প্রতি তাদের কি বক্তব্য ছিল, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মধ্যের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, তাদের কর্মের ফলাফল কি হয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কে । এ সকল বিষয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো কোনো কোনো নবীর পিতা বা মাতার নাম বা জন্মবৃত্তান্ত বা জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় এসকল বিষয় সম্পূর্নরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন: ঈসা (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর মাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ নবী, যেমন নূহ, লুত, হুদ, সালেহ, আইয়ূব, যূল-কিফ্‌ল ইলইয়াস প্রমুখ নবীর (আ) ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা, মাতা, যুগ বা দেশের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

৪. ৪. ৬. নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন

কুরআন কারীম বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহর বান্দা ও মানুষ ছিলেন। তাঁরা সকলেই পুরুষ ছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নুবুওয়াত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কাফিরগণের বড় 'দলিল' ছিল যে, নবীগণ তাদের মতই মানুষ, কাজেই তাঁরা নবী হতে পারেন না। অপরদিকে কোনো কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের নবীদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড, আয়াত বা মুজিযাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দা হওয়ার কারণে তাদেরকে 'আল্লাহর পুত্র' বা 'আল্লাহর সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন কারীমে সকল

বিভ্রান্তির অপনোদন করে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও ওহীপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। তাঁরা কোনো 'ঐশ্বরিক ক্ষমতা' বা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার অধিকারী ছিলেন না। তাঁদের মর্যাদা আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা ও রাসূল হওয়ায়; আল্লাহর ক্ষমতা, গুণাবলি বা ইবাদত পাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর শরীক হওয়ায় নয়।

তাঁদের মানবত্ব প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে তাঁদের মানবীয় দিকগুলি উল্লেখ করেছেন, যেমন তাঁদের খাদ্যগ্রহণ, বাজার করা, বিবাহ-শাদি, সন্তান গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, মানবীয় সীমাবদ্ধতা, কল্যাণ-অকল্যাণে অক্ষমতা, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাইরে কোনো অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"তারা (কাফিরগণ) বলত: 'তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযা) উপস্থিত কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।"[৫১৬]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

"আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ মানুষগণকে ছাড়া কাউকে প্রেরণ করি নি (রিসালাত-নুবওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করি নি), যাদেরকে আমি ওহী প্রদান করেছিলাম।"[৫১৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য; অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৫১৮]

অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব তাদের সম্প্রদায়ের বোধগম্য ভাষায় দীনের কথা প্রচার ও ব্যাখ্যা করা। হেদায়াত করা বা না করা তাদের দায়িত্ব নয়, বরং তা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ

"তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তার সকলেই তো আহার করত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করত।"[৫১৯]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ

"মারইয়াম তনয় মসীহ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে, এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত।"[৫২০]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?"[৫২১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত

কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।"[৫২২]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

"তবে ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিল: আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোনো অধিকার রাখি না।"[৫২৩]

ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলম ও ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনায় আমরা এ অর্থে কয়েকটি আয়াত দেখতে পেয়েছি।

৪. ৪. ৭. সকল নবী-রাসূলের দাও'আত এক

নবী রাসূলদের বিষয়ে কুরআন কারীমের বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁদের সকলের দা'ওয়াত এর বিষয় মূলত: এক ছিল। তাঁরা সবাই মানুষদেরকে তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করছেন। মানুষদেরকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর শিখানো পথে চলতে এবং সকল মানুষের জন্য কল্যাণময় সামাজিক জীবনে বাস করতে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। যে কর্ম বা আচরণ মানুষের অকল্যাণ করে বা মানুষের কাছে তার মহান স্রষ্টার সম্পর্কে ক্ষতি করে তা থেকে তারা মানুষদের কে নিষেধ করেছেন। তাদের মূল দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম, তবে তাদের বিস্তারিত শরীয়াত বা বিধানাবলী ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। মানুষদেরকে কল্যাণের পথে আহবান করা, পথের নির্দেশ দেওয়াই ছিল তাদের দায়িত্ব। তাদের আহবানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া ছিল মানুষের এখতিয়ার।[৫২৪]

৪. ৪. ৮. ইসমাতুল আম্বিয়া

ইসমাত (**العصمة**) শব্দটি 'আসামা' (**عَصَمَ**) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ নিষেধ করা, সংরক্ষন করা বা হেফাযত করা (to hold back, restrain, curb, check, prevent, guard, safeguard, protect)। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন।"[৫২৫]

ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে নবীগণের অভ্রান্ততা বা নিষ্পপত্ব (sinlessness, infallibility) বুঝানো হয়। নবীগণকে আল্লাহ সংরক্ষণ করেন বা হেফাযত করেন, ফলে তাঁরা বিভ্রান্তি বা পাপের মধ্যে নিপতিত হন না। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ উত্তম জানেন কোথায় তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পন করবেন।"[৫২৬]

এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

"এরা নবীগণের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলম।"[৫২৭]

আল্লাহ বারংবার নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভুষিত করেছেন।[৫২৮] সর্বোপরি মহান আল্লাহ মানব জাতিকে নবী-রাসূলদের 'ইত্তিবা' বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তাঁরা 'নিষ্পাপ' ছিলেন। কারণ যার থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত 'ইত্তিবা' করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নিদের্শনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তারা সবাই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তারা সবাই নিষ্পাপ ছিলেন সকল প্রকার পাপ বা অন্যায় থেকে মুক্ত ছিলেন। মানবীয় ভুলত্রুটি ছাড়া কোনো পাপে তারা কখনও লিপ্ত হননি।

ইসমাতুল আম্বিয়া বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

الأنبياء كلهم مُنَزَّهُون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلات وخطيئــات. ومحمــد ﷺ نبيــه، وعبــده ورسوله، وصفيه ونقيه، ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالي طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط.

“নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফ্র ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্খলন ও ভুলত্রুটি তাদের ঘটেছে। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনিত নির্বাচিত, তাঁর বাছাইকৃত। তিনি কখনো মুর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি। তিনি কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি।”[৫২৯]

'আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ'-এর লেখক আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) নবীগণের (আ)-এর বিষয়ে বলেন:

كلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين للخلق

“তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং প্রচার করেছেন, সত্যবাদী ছিলেন, সৃষ্টির উপদেশদাতা ও কল্যাণকামী ছিলেন।”[৫৩০]

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন:

في هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. أما عمداً فبالإجماع. وأما سهواً فعند الأكثرين. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل. وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور، خلافاً للحشوية... وأما سهواً فجوَّزه الأكثرون. أما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه، ويجوز سهواً بالاتفاق، إلا ما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. لكن المحققون اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه. وهذا كله بعد الوحي، وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة. والحق منع ما يوجب النفرة، كعهر الأمهات والفجور، والصغائر الدالة على الخسة. ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده، لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية. وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولاً عن طريق الآحاد فمردود، وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن، وإلا فمحمول على ترك الأولى، أو كونه قبل البعثة.

“এতে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও উম্মাতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মা'সূম বা নির্ভুল ও সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে তাঁরা ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল করেন না সে বিষয়ে সকলেই একমত এবং অধিকাংশের মতে এক্ষেত্রে তাঁরা অনিচ্ছাকৃত বা বেখেয়ালেও কোনো ভুল করতে পারেন না। অন্যান্য সকল পাপ থেকে তাদের মা'সূম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য এই যে, নবীগণ ওহী বা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে কুফ্রী থেকে সংরক্ষিত বা মা'সূম। অনুরূপভাবে অধিকাংশের মতে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মা'সূম। হাশাবিয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তারা নবীগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব বলেছে।) .... আর ইচ্ছাকৃত সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশের মত এই যে, তা সম্ভব। তবে মুতযিলী নেতা আল-জুবাঈ[৫৩১] ও তাঁর অনুসারীরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তাদের মতে নবীগণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়)। আর নবীগণের জন্য অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সকলের মতেই সম্ভব, তবে যে সকল সগীরা গোনাহ নীচতা প্রমান করে তা তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন এক লোকমা খাদ্য চুরি করা, একটি দানা ওযনে কম দেওয়া, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে (সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে) মুহাক্কিক আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নবীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা তা বর্জন করেন। এ সবই ওহী বা নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের বিষয় (তাঁরা কবীরা বা সগীরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করতে পারেন বা পারেন না বিষয়ক উপরের মতভেদ সবই নবীগণের নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের পর্যায়ের ক্ষেত্রে।)

নুবুওয়াত প্রপ্তির পূর্বে নবীগণ থেকে কবীরা গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব বলে কোনো দলীল নেই। মু'তাযিলাগণ মতপ্রকাশ করেছেন যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না; কারণ এর ফলে জনগণের মধ্যে তাঁর প্রতি অভক্তি সৃষ্টি হয়, যা তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সত্য কথা এই যে, যে কর্ম তাঁদের প্রতি অভক্তি সৃষ্টি করে তা তাঁরা করতে পারেন না, যেমন, মাতৃগণের সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতা জ্ঞাপক সগীরা গোনাহ। শীয়াগণ মনে করেন যে, নবীগণ থেকে নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা গোনাহ প্রকাশিত বা সংঘটিত হতে পারে না। তবে তাঁরা তাকিয়্যাহ বা আত্মরক্ষামূলকভাবে কুফ্র প্রকাশ করা সম্ভব বলে মতপ্রকাশ করেছে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, নবীগণের (আ) বিষয়ে যদি এমন কিছু বর্ণিত হয় যা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা কেউ মিথ্যা বলেছেন বা পাপ করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে নিম্নের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে: যদি এরূপ বিষয় খাবারুল

ওয়াহিদ পর্যায়ে বর্ণিত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। আর এ জাতীয় যা কিছু মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত তা সম্ভব হলে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ গ্রহণ করতে হবে, অথবা মনে করতে হবে যে, তাঁরা সেক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করে বৈধ বিষয় গ্রহণ করেছেন অথবা তা নুবুওয়াতের পূর্বে ঘটেছিল।"[৫৩২]

মোল্লা আলী কারী বলেন, ইবনুল হুমাম বলেছেন: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, নবীগণ কবীরা গোনাহ থেকে সংরক্ষিত, ভুলক্রমে বা অনিচ্ছকৃতভাবে একক সগীরা গোনাহ করে ফেলা থেকে সংরক্ষিত নন। আহলুস সুন্নাতের কেউ কেউ নবীদের ক্ষেত্রে ভুল করাও অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। সঠিকতর বা সহীহ কথা এই যে, কর্মের মধ্যে ভুল হওয়া সম্ভব। সার কথা এই যে, আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না। তবে অসতর্কতা বা ভুলের কারণে যা ঘটে তা পদস্খলন বলে অভিহিত।[৫৩৩]

৪. ৪. ৯. মুজিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজ

৪. ৪. ৯. ১. আয়াত ও মুজিযা

আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরকানুল ঈমান আলোচনাকালে দেখেছি যে, সকল নবী-রাসূল আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত ছিলেন। মুজিযা (**المعجزة**) শব্দটি আরবী 'ইজায' (**إعجاز**) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'অক্ষম করা'। মুজিযা অর্থ 'অক্ষমকারী অলৌকিক নিদর্শন"। নবীগণ তাঁদের নুবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলিকে মুজিযা বলা হয়।[৫৩৪]

মুজিযা শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। কুরআন ও হাদীসে মুজিযা বুঝাতে 'আয়াত' (**الآية**) অর্থাৎ 'চিহ্ন' বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে আলিমগণ 'মুজিযা' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। যতটুকু বুঝা যায় এ পরিভাষাটির ব্যবহার ২য় হিজরী শতকেও পরিচিতি লাভ করে নি। কারণ 'মুজিযা' বুঝাতে ইমাম আবূ হানীফা 'আয়াত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন:

والآيات ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مِمَّا رُوِيَ في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفراً، وذلك كله جائز وممكن.

"নবীগণের জন্য 'আয়াত' প্রমাণিত। এবং ওলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলিকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না, বরং এগুলিকে আমরা তাদের 'কাযায়ে হাজাত' বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। এতে তারা ধোঁকগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। এগুলি সবই সম্ভব।"[৫৩৫]

মুমিনগন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ওহী ও মুজিজা লাভ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে তাঁরা অনেক মুজিজা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহবান করার জন্য। এ বিষয়ে কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, অবিশ্বাসিগণ সর্বদা নবী-রাসূলদেরকে 'আমাদের মতই মানুষ, কাজেই তোমরা নবী হতে পার না', আর যদি নবী হয়েই থাক তবে 'আয়াত' বা 'সুলতান' অর্থাৎ ক্ষমতার প্রমাণ পেশ কর। নবীগণ তাদের এ কথার উত্তরে তাদের মানবত্ব এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আয়াত প্রদর্শনের কথা জানিয়েছেন। আমরা দেখেছি এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"তারা (কাফিরগণ) বলত: 'তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযা) উপস্থিত কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ বৈ কিছুই নই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।"[৫৩৬]

আমরা দেখেছি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"তোমার পূর্বে রাসূলগণ প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।"[৫৩৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

"আপনার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো রাসূলই কোনো নিদর্শন (মু'জিযা) আনতে পারেন না। আর যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে যায় তখন ন্যায় সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হয় এবং তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"[৫৩৮]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ

"তারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন দেখান হয় তাহলে তারা ইমান গ্রহণ করবে। আপনি বলুন: অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো একান্তই আল্লাহর কাছে।"[৫৩৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ সক্ষম', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"[৫৪০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন

وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ

"এবং তারা বলে: তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করা হোক। আপনি বলুন: অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহরই কাছে এবং আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"[৫৪১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

"তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।"[৫৪২]

তিনি আরো বলেন:

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

"বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ (মুজিযা, শাস্তি) তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব-হুকম তো কেবলমাত্র আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' বল, 'তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ (মুজিযা-শাস্তি) তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেত, এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[৫৪৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

তবে কি তুমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করবে এবং এতে, তোমার মন সংকুচিত হবে, এজন্য যে, তারা বলে, 'তার নিকট ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা তার সাথে ফিরিশতা আসে না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র এবং

আল্লাহ সর্ব বিষয়ের কর্মবিধায়ক।"[৫৪৪]

এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াত বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছা মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। কুরআন কারীমে নবীগণের অনেক মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আ)-এর নৌকার মুজিযা, ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদ থাকার মুজিযা, মূসা (আ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মুজিযা, ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য মুজিযা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, ইসরা, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এগুলি বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

৪. ৪. ৯. ২. কারামাতুল আওলিয়া

নবীগণের মুজিযা বা আয়াত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে ইমামগণ আরো দু প্রকারের 'অলৌকিক' কর্মের আলোচনা করেছেন: (১) ওলীগণের কারামত ও (২) কাফির বা পাপীদের ইসতিদরাজ। কারণ এগুলির বাহ্যিক প্রকাশ অনেকটা এক রকম হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলির মধ্যে পার্থক্য অনেক। যেন কোনো মুমিন অজ্ঞতার কারণে যে কোনো অলৌকিক কর্মকেই মুজিযা বা কারামত বলে মনে না করে এজন্য তারা মুজিযার ব্যাখ্যার সাথে কারামাত ও ইসতিদরাজের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

'ওলী' শব্দটি আরবী (**الــولايــة، والــولايــة بكسر الواو وفتحها**) বিলায়াত বা ওয়ালায়াত শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' বা 'ওয়ালী' (**الــولي**) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত 'ওলী' অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ 'মাওলা' (**المولى**)। 'মাওলা' অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় 'বেলায়াত' 'ওলী' ও 'মাওলা' শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্বয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (**ولاية الله**) 'আল্লাহর বন্ধুত্ব' ও (**ولي الله**) 'আল্লাহর বন্ধু' অর্থে। আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে বা তাকওয়া অবলম্বন করে।"[৫৪৫]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়। এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও মা'রিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান। এজন্য বেলায়াতের কমবেশি হয় মূলত নেক আমলে। যার নেক আমল ও সুন্নাতের ইত্তিবা যত বেশি তিনি তত বেশি ওলী। ইমাম তাহাবী বলেন:

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।"[৫৪৬]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والخوف والرجاء والإيمان في ذلك ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله.

"মারিফাত (পরিচয় লাভ), ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), মাহাব্বাত (ভালবাসা), রিযা (সন্তুষ্টি), খাওফ (ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে।"[৫৪৭]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

الإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقي، ومخالفة الهوي وملازمة الأولى

"ঈমান একই, এবং ঈমানদারগণ এর মূলে সবাই সমান। তবে, আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত প্রভেদ হয়ে থাকে।"[৫৪৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেলায়াতের পথের কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের সাথেসাথে অনবরত

নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এবং বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বার সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[৫৪৯]

কারামত (**الكرامة**) শব্দটির অর্থ 'ভদ্রতা', 'সম্মান', 'সম্মাননা', 'সম্মান-চিহ্ন' (nobility, dignity, respect, mark of honour, token of esteem)। ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কারামাত' বলা হয়।

কুরআন কারীমে এরূপ অলৌকিক কর্মকেও আয়াত বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের একজন 'ওলী'-র পদস্খলন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

"তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি 'আয়াত' বা অলৌকিক নির্দশন দিয়েছিলাম, অতঃপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয় এবং শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"[৫৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ওলীর কথা উল্লেখ করেছেন যাদের বেলায়াতের কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে 'কারামাত' বা অলৌকিক কর্ম প্রদান করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করায় পরে তিনি বিপথগামী হয়ে যান।

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বেলায়াত কোনো পদমর্যাদা নয় এবং কারামত স্থায়ী পদমর্যাদার দলিল নয়। একজন নেককার মানুষ বেলায়াত ও কারামাত লাভের পরেও বিভ্রান্ত হতে পারেন। 'কারামত' প্রকাশিত হওয়া ওলী হওয়ার প্রমাণ নয়, বরং ঈমান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই ওলী হওয়ার প্রমান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, অনুসরণ ও তাকওয়ার উপর টিকে থাকা ও অনবরত ফরয ও নফল ইবাদত পালন করতে থাকই বেলায়াাতের একমাত্র চিহ্ন।

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ নবীগণেরর অলৌকিক কর্মকে 'মুজিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ নুবুওয়াতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে তাঁরা ওলীদের অলৌকিক কর্মকে 'কারামত' নামে আখ্যায়িত করেছেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এরূপ অলৌকিক কর্ম ওলীর কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নয়, বরং একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইকরাম' বা সম্মাননা মাত্র।[৫৫১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: "ওলীগণের কারামত সত্য।" এ কথা অর্থ ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া মু'তাযিলী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকীদা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে নবী ছাড়াও অন্যান্য মুমিন মুত্তাকী মানুষের অলৌকিক কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এরূপ অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

لا يفصل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونـؤمن بماجـاء مـن كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.

"আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দেই না। বরং আমরা বলি: একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি।"[৫৫২]

৪. ৪. ৯. ৩. ইসতিদরাজ

'ইসতিদরাজ' শব্দটি আরবী 'দারাজ' (**درج**) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগোনো ইত্যাদি। 'দারাজাহ' (**الدرجة**) অর্থ ধাপ বা পর্যায়। ইসতিদরাজ (**الاستدراج**) অর্থ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচে নামান, ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (To make advance gradually, promote

gradually, to entice, tempt, lure into destruction)।

কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইসতিদরাজ' বলা হয়। আমরা দেখেছি যে, ইসতিদরাজের ব্যখ্যায় ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: "বরং এগুলিকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজাত বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।"

মোল্লা আলী কারী বলেন: "ফিরাসাত তিন প্রকার। (১) ঈমানী ফিরাসাত। এর কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নূর যা আল্লাহ তার বান্দার অন্তরে নিক্ষেপ করেন। হঠাৎ অনুভূতি হিসেবে তা মানুষের অন্তরে হামলা করে, যেমন সিংহ তার শিকারের উপরে হামলা করে। .... (২) রিয়াযত বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত ফিরাসাত। এ প্রকারের ফিরাসাত অর্জিত হয় ক্ষুধা, রত্রি-জাগরণ, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে। কারণ মানুষের নফস যখন জাগতিক সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ থেকে বিমুক্ত হয় তখন তার বিমুক্তির মাত্রা অনুসারে তার মধ্যে অন্তর্দিষ্টি ও কাশফ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার ফিরাসাত কাফির ও মুমিন উভয়েরই হতে পারে। এ প্রকার কাশফ বা ফিরাসাত ঈমান বা বেলায়াত প্রমাণ করে না। এর দ্বারা কোনো কল্যাণ বা সঠিক পথও জানা যায় না।... (৩) সৃস্টিগত ফিরাসাত। এ হলো চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশার মানুষের ফিরাসাত যারা সৃষ্টিগত আকৃতি থেকে প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীন অবস্থা অনুমান করতে পারেন।"[৫৫৩]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল অলৌকিক কর্মই কারামত নয় এবং কোনো অলৌকিক কর্ম কারো বেলায়াতের প্রমাণ নয়, কারণ একই প্রকার অলৌকিক কর্ম মুত্তাকী মুমিন থেকেও প্রকাশিত হতে পারে এবং ফাসিক বা কাফির থেকেও প্রকাশিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অলৌকিক কর্ম কোনো মানুষের বেলায়াত তো দূরের কথা, ঈমানেরও প্রমাণ নয়। বরং মানুষের ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য ও সদা সর্বদা ফরয ও নফল ইবাদত পালন করাই বেলায়াতের প্রমাণ। যদি এরূপ ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে কারামত বলা হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তির ঈমান, তাকওয়া বা ইত্তিবায়ে সুন্নাত না থাকে কিন্তু তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাকে ইসতিদরাজ বলা হবে।

৪. ৪. ১০. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য

বিশ্বাস ও ভক্তির দিক থেকে সকল নবীর অধিকার সমান। আমাদের দায়িত্ব তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা এবং সবাইকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা, কারো প্রতি সামান্যতম অমর্যাদা মূলক কোনো কথা, কর্ম বা বিশ্বাস থেকে দূরে থাকা। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুমিনগণ নবীগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর মালাকগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছে। (তারা বলে): 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।'[৫৫৪]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহে ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমানের মধ্যে তারতম্য করতে চায়, এবং বলে: 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি' এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালূ।"[৫৫৫]

এভাবে বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সাম্যের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো মর্যাদা কারো চেয়ে বেশি বলে আল্লাহ জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

"এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।"[৫৫৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

"আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে আমি যাবূর দিয়েছি।"[৫৫৭]

এভাবে আমরা সকল নবীকে সমান সম্মানের সাথে বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাস করি যে, তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্যদের চেয়ে বেশি। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

৪. ৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

৪. ৫. ১. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৫৫৮]

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ। পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যায়। এই অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে। মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত। কুরআন কারীমে কাফিরদের এ বিভ্রান্তি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা 'আখিরাত' বা 'শেষ দিবসে' ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫৫৯] ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ক কয়েকটি নির্দেশ দেখেছি।

বস্তুত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই।

আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহয় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্খলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শিরকে নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্থিরতা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্খলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ।

৪. ৫. ২. আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস

পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, কিয়ামত বা পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউয, জাহান্নামের উপর সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন।

৪. ৫. ৩. কবরের আযাব

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আখিরাত বা পরকালীন জীবনের বিভিন্ন দিক জানতে পারি, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"[৫৬০]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে পরকালীন জীবনের শুরুতেই কবরে 'মুনকার-নাকীর' নামক মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগণ হাত বাড়িয়ে বলবে: 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।"[৫৬১]

এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরেই- সেদিনেই যে শাস্তি প্রদান করা হবে তার বিষয়ে জানা যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন (বলা হবে:) ফিরাউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।"[৫৬২]

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগুনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে।

অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে জানানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আযাব ও নিয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির বলে গণ্য। এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরের রাখার পরে তার 'রূহ' তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও তারা নবী সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন। এগুলি সবই মুমিন বিশ্বাস করেন।

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে 'কবরের' অবস্থা বলা হয়। তবে 'কবর' বলতে মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করি নি। না, এ হওয়ার নয়। এ তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে 'বারযাখ' (প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[৫৬৩]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر، وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق، وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين.

"মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে, কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনোকোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে।"[৫৬৪]

৪. ৫. ৪. ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশ্‌র

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌ও সম্মুখে- যিনি এক, পরাক্রমশালী । সে দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"[৫৬৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُونَ

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে । অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে ।"[৫৬৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে । সে দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে ।"[৫৬৭]

অন্যত্র তিনি বলেন:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

"যে দিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব । এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাব ।"[৫৬৮]

৪. ৫. ৫. হিসাব ও প্রতিফল

উপরের আয়াতগুলিতে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ পুনরুত্থানের পরে হিসাব এবং প্রতিফল দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

"সে দিন আল্লাহ তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক ।"[৫৬৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উম্মুক্ত । 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট ।"[৫৭০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

"হে মানুষ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে । যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে । এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে । এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হতে দেওয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহবান করিবে; এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে; সে তার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল । সে ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না; নিশ্চয় ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন ।"[৫৭১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে, মানুষ বলবে, 'এর কি হল?' সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করিবেন, সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে; কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে । কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে ।[৫৭২]

৪. ৫. ৬. মীযান

হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান বা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

"এবং কিয়ামত -দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের পাল্লা বা তুলাদন্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।"[৫৭৩]

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

"সে দিন ওজন ঠিক করা হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত।"[৫৭৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

"তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া' (গভীর গর্ত); তুমি কি জান তা কী? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।"[৫৭৫]

৪. ৫. ৭. সিরাত

সিরাত (**الصراط**) অর্থ রাস্তা বা পথ। আখিরাতের বিশ্বাসে সিরাত বলতে জাহান্নামের উপরে স্থাপিত রাস্তা বা সেতুকে বুঝানো হয়। মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা বা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, মুমিনগণ, কাফিরগণ, হিসাবকৃতগণ, হিসাব-মুক্তগণ সকলেই এ সেতু অতিক্রম করবেন। পৃথিবীতে আল্লাহর রাস্তায় যে যেভাবে চলেছেন আখিরাতের রাস্তা বা সেতুও তিনি সেভাবেই অতিক্রম করবেন।

এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইঙ্গিত রয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلا الرُّسُلُ وَكَلامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ...غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو

"অতঃপর জাহান্নামের মধ্য দিয়ে রাস্তা বসানো হবে। তখন রাসূলগণের মধ্য থেকে আমিই প্রথম আমার উম্মাত নিয়ে তা অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। আর রাসলূগণের কথা হবে: নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন। জাহান্নামের মধ্যে মরুভূমির 'সা'দান' বৃক্ষের কাটার মত দেখতে অতিকায় বিশাল বিশাল আংটা বা হূক থাকবে ... যেগুলির আকৃতির বিশালত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। সেগুলি মানুষদেরকে তাদের কর্মের অনুপাতে টেনে নিবে। তাদের মধ্যে কেউ তার কর্মের কারণে ধ্বংসগ্রস্ত হবে এবং কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং এরপর মুক্তিলাভ করবে। ...."[৫৭৬]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا

"অতঃপর সেতু আনয়ন করা হবে এবং জাহান্নামের উপরে তা স্থাপন করা হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, সেতুটি কী? তিনি বললেন: অতিপিচ্ছিল ও পতনের স্থান, যার উপরে রয়েছে টেনে নেওয়ার জন্য আংটা এবং বিশালাকৃতির বক্র কাঁটা রয়েছে সেগুলি দেখতে নাজদের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায়। মুমিন সে সেতুর উপর দিয়ে দৃষ্টির দ্রুততায়, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ শক্তিশালী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ উষ্ট্রের গতিতে পার হবে, কেউ নিরাপদে অতিক্রম করবে, কেউ আগুনের মধ্যে আহত ও কেউ আগুনের মধ্যে জমাকৃত, এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে হিচড়ে পার করা হবে।"[৫৭৭]

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে (তা অতিক্রম করবে), এ তোমার প্রতিপালকের অনির্বার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।"[৫৭৮]

সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ৫. ৮. হাউয

হাউয (**الحـــوض**) অর্থ চৌবাচ্চা, পুকুর বা জলাশয়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে একটি পবিত্র 'হাউয' দান করেছেন যেখান থেকে তাঁর উম্মাত কিয়ামতের দিন পানি পান করবে। ত্রিশেরও অধিক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন:

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، ولقد استقصى طرقهـا شيخنا العلامة عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية

"হাউযের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলি বর্ণিত। আমাদের উস্তাদ আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রাহ) 'আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া' নামক তার বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন।"[৫৭৯]

এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ

"ফিলিস্তিন থেকে ইয়ামানের সান'আ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউযের পরিমান তদ্রূপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়।"[৫৮০]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنْ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

"আদান (ইয়ামান) থেকে আইলা (ফিলিস্তিন)-এর যে দূরত্ব তার চেয়ে বেশি প্রশস্ততা আমার হাউযের। তার পানি বরফের চেয়েও বেশি শুভ্র এবং মধু মিশ্রিত দুগ্ধের চেয়েও বেশি মিষ্ট। তার পানপাত্রগুলি সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়েও বেশি। একজন মানুষ যেমন তার হাউয থেকে অন্য মানুষদের উট ঠেকিয়ে রাখে আমি তেমন ভাবে আমার উম্মাত ছাড়া অন্য মানুষদের ঠেকিয়ে রাখব। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমদের এমন একটি চিহ্ন রয়েছে যা অন্য কোনো উম্মাতের নেই, তোমরা আমার নিকট যখন আগমন করবে তখন ওযুর কারণে তোমাদের ওযুর অঙ্গগুলি শুভ্রতায় উদ্ভাসিত থাকবে।"[৫৮১]

সাহল ইবনু সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (في رواية: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ)، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

"আমি আগে হাউযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব: এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল। (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হয়ে যাক! তারা দূর হয়ে যাক!!"[৫৮২]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ...)، ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ (أعطانيه) رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ

"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাঁসিমখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি হাঁসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার উপরে একটি সূরা নাযিল করা হলো। অতঃপর তিনি সূরা কাউসার পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন: কাউসার হলো একটি নদী যা মহান আল্লাহ আমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায়: যা তিনি আমাকে প্রদান করেছেন)। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এ হলো হাউয, যেখানে আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন আমার নিকট আগমন করবে। তার পানপাত্রগুলি তারকারাজির ন্যায়। কোনো কোনো বান্দাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, এ তো আমার উম্মাতের একজন। তখন তিনি বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন করেছিল।"[৫৮৩]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ (مِنَ اللَّبَنِ) وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا

"আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের পথ। এর সকল কোণ সমান। এর পানি দুধের চেয়েও (অন্য বর্ণনায় রৌপ্যের চেয়েও) শুভ্র এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।"[৫৮৪]

৪. ৫. ৯. শাফা'আত

শাফা'আত (**الشفاعة**) অর্থ সুপারিশ করা বা কারো দাবি বা আব্দারকে সমর্থন করা। শব্দটি 'আশ-শাফউ (**الشفع**) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জোড়া বা জোড়া বানানো। শাফা'আতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি) বলেন: "হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আত শব্দটি এসেছে জাগতিক বা আখিরাতের বিষয়ে। এর অর্থ পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা।"[৫৮৫]

আমরা দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ, খৃস্টানগণ ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের শাফা'আতকে তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মনে করত যে, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে শাফা'আত করার জন্য নিঃশর্ত ও উন্মুক্ত অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কাজেই তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত যে কাউকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা তাঁদের শাফা'আত লাভের আশায় অতিভক্তি বা শিরকে লিপ্ত হতো।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর খারিজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা পাপীদের জন্য নবীগণের বা অন্যদের শাফা'আত অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে তাদের দলিলগুলি মূলত দু প্রকারের: (১) কুরআন কারীমের শাফা'আত অস্বীকার বিষয়ক আয়াতগুলি এবং (২) তাদের মতবাদ ভিত্তিক যুক্তি। তাদের মতে পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেওয়া আল্লাহর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফা'আতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে শাফা'আত বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ ব্যাখ্যা করব।

৪. ৫. ৯. ১. কুরআন কারীমে শাফা'আত

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফা'আত কবুল করা হবে না, আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফা'আতের অধিকার রাখবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শাফা'আতকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ

"তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবেনা এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।"[৫৮৬]

তিনি আরো বলেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ

"তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্য ও পাবে না।"[৫৮৭]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

"হে মু'মিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে- যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।"[৫৮৮]

অন্যত্র আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنْقِذُونِ

"আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।"[৫৮৯]

তিনি আরো বলেন:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"তুমি এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান হবে।"[৫৯০]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ

"এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।"[৫৯১]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ্ তিনি আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবু ও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।"[৫৯২]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং তাদের শির্ক করা থেকে তিনি উর্দ্ধে।"[৫৯৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।"[৫৯৪]

উপরের আয়াতগুলিতে বাহ্যত শাফা'আত অস্বীকার করা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফিরকা দাবি করে যে, কিয়ামতের দিন কারো শাফা'আতে কোনো পাপীর ক্ষমালাভের ধারণা বাতিল ও ভিত্তিহীন।

বস্তুত এ সকল আয়াতে মূলত শাফা'আত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। আমার ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওহীর জ্ঞানের সাথে কিছু কল্পনা যোগ করে আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা প্রিয়পাত্রগণ শাফা'আতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। তারা তাদের ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করে মুক্তি দিতে পারবেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে, শাফা'আতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যান্য আয়াতে শাফা'আতের স্বীকৃতি উল্লেখ করা

হয়েছে। যিনি শাফা'আত করবেন তিনি যদি শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং যার জন্য শাফা'আত করবেন তার প্রতি যদি মহান আল্লহ সন্তুষ্ট থাকেন তবে সেক্ষেত্রে শাফা'আত করার সুযোগ আল্লাহ প্রদান করবেন। যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তার জন্য কেউই শাফা'আত করবে না। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ

"কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?"[৫৯৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

"তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর 'ইবাদত কর। তবু ও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?"[৫৯৬]

তিনি আরো বলেন:

لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

"যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।"[৫৯৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا

"দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।"[৫৯৮]

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেন:

وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

"যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।"[৫৯৯]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

"তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[৬০০]

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

"আকাশে কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে! তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।"[৬০১]

উপরের আয়াতগুলি থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

(১) শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শাফা'আতের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

(২) আল্লাহ অনুমতি দিলে কেউ শাফ'আত করতে পারবেন।

(৩) যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট শুধু তাকেই অনুমতি প্রদান করবেন।

(৪) আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবেন বলে কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য কারা তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশ করতে পারবেন তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় নি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(৫) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্যও আল্লাহর অনুমোদন পূর্বশর্ত।

(৬) যে ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না।

৪. ৫. ৯. ২. হাদীস শরীফে শাফা'আত

অগণিত হাদীসে কিয়ামতের দিন নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন আমল শাফা'আত করবে এবং তাদের শাফা'আত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। হাদীসে বর্ণিত শাফা'আতের পর্যায়গুলি নিম্নরূপে ভাগ করা যায়:

(১) শাফা'আতে উযমা (**الشفاعة العظمى**) বা মহোত্তম শাফা'আত। এদ্বারা বিচার শুরুর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা

বুঝানো হয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট গমন করে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গমন করবেন। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করবেন, মানুষদের বিচার শেষ করে দেওয়ার জন্য।

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফা'আতে মহান আল্লাহ তাঁর উম্মাতের অনেক গোনাহগারকে ক্ষমা করবেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(৪) উম্মাতে মুহাম্মাদীর অনেক নেককার মানুষ শাফা'আত করবেন।

(৫) সন্তানগণ তাদের পিতামাতাদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৬) কুরআন তার তিলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৭) সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত শাফা'আত করবে এবং তা কবুল করা হবে।

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পরি যে, শাফা'আতের অর্থ এই নয় যে, ফিরিশতাগণ বা অন্য কোনো বান্দা ইচ্ছামত কোনো মানুষকে সুপারিশ করবেন। কেউ যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দার নামে মানত করে, তাঁকে সাজদা করে, তাঁকে ডাকে বা তাকে 'চূড়ান্ত ভক্তি' করে এবং আশা করে যে, এরূপ করাতে উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তার জন্য সুপারিশ করবেন তবে তার এরূপ আশা কুরআনের আলোতে মরিচিকার পিছে ছোটা ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যক্তির শাফা'আত লাভ তো দূরের কথা তার মানত, সাজদা, ডাক বা চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিতে' যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা সন্তুষ্টি বোধ করেন তবে তাকেও আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে বা ঈমান বিশুদ্ধ না করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না করে কিন্তু কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবাসে, তাকে ভক্তি-সম্মান করে বা সর্বদা তার জন্য দু'আ করে এবং আশা করে যে, উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তাকে সুপারিশ করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবেন তবে বাতুল আশা ছাড়া কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমান ও তাওহীদ বিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন তবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাঁর কোনো সম্মানিত বান্দাকে তার জন্য শাফা'আত করার অনুমতি প্রদান করবেন। মূল বিষয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ কোনো পাপী বান্দার তাওহীদ ও ঈমানে সন্তুষ্ট হলে তিনি নিজেই তাঁকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অথবা তাঁর কোনো সম্মানিত বান্দাকে সম্মান করে তার জন্য শাফা'আতের অনুমতি দিতে পারেন।

মু'তাযিলাগণ শাফা'আতে উযমা স্বীকার করে; কারণ তা তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। পাপী মুমিনের জন্য শাফা'আত বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ও হাদীসকে তারা শাফা'আতে উযমা বলে ব্যাখ্যা করে বা বাতিল করে দেয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সকল প্রকারের শাফা'আতেই বিশ্বাস করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শাফ'আতের মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই। তিনি যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার জন্য তিনি দয়া করে শাফা'আতের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন তার জন্য তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত কেউ শাফা'আত করলে তিনি ইচ্ছা করলে তা কবুল করে গোনাহগার মুমিনকে ক্ষমা করতে পারেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা করে বলেন:

وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق، وشفاعة نبينا ﷺ للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت

"নবীগণের শাফা'আত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারিগণের জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের নবী (ﷺ)-র শাফা'আতও সত্য।"[৬০২]

৪. ৫. ১০. জান্নাত ও জাহান্নম

জান্নাত ও জাহান্নম মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা ও গন্তব্যস্থল। কুরআন ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ রয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আখিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম বিষয়ক কিছু কথা রয়েছে। এখানে দু-একটি আয়াত উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[৬০৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

"সে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?' জাহান্নাম বলবে: 'আরও আছে কি?' আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীগণের, কোনো দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী হিফাযতকারীর জন্য। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীতচিত্তে উপস্থিত হয়। তাদেরকে বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ কর; তা অনন্ত জীবনের দিন।' সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক।"[৬০৪]

তিনি আরো বলেন:

أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ

"আপ্যায়নের জন্য এ-ই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? জালিমদের জন্য আমি তা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এ বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা তারা তা হতে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।"[৬০৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হয়ে বসবে। এইরূপ ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়াতলোচনা হুর, সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করিবেন, তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এ-ই তো মহা সাফল্য।"[৬০৬]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا، ولا تموت الحور العين أبدا، ولا يفني عقاب الله تعالي وثوابه سرمدا.

"জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হূরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত-চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।"[৬০৭]

৪. ৫. ১১. আখিরাতে আল্লাহর দর্শন

জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনই হবে মুমিনগণের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। কুরআন কারীমের এবং অগণিত হাদীসে বারংবার এ নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[৬০৮]

আখিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বহু-সংখ্যক বা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

إِنَّ أُنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لا قَالَ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لا

"নবী (ﷺ)-এর যুগে কিছু মানুষ বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তখন নবী (ﷺ) বলেন: হ্যাঁ। দ্বিপ্রহরের সময় আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তবে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলেন: না। তিনি বলেন: পূর্ণিমার রাতে আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তাহলে কি চাঁদ দেখতে তোমরা বাধাগ্রস্ত হও? তারা বলেন: না।"[৬০৯]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لا قَالَ فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا

"আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তিনি বলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? আমরা বললাম: না। তিনি বলেন: সেদিন তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে অসুবিধা হয় না।"[৬১০]

অন্য হাদীসে জরীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: তোমরা যেভাবে এ চাঁদকে দেখছ, কোনোরূপ অসুবিধা হচ্ছে না, সেভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে।"[৬১১]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের অনুসারীগণ প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দর্শন করবেন। খারিজী, মু'তাযিলী ও সমমনা কোনো কোনো ফিরকা আখিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের কথা অস্বীকার করে। কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু যুক্তি তাদের দলিল। মহান আল্লাহ বলেন:

لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত"[৬১২]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"[৬১৩]

মূসা (আ) যখন আল্লাহকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তিনি বলেন:

لَنْ تَرَانِي

"তুমি আমাকে দেখবে না।"[৬১৪]

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে তারা দবি করেন যে, মহান আল্লাহকে আখিরাতে দর্শন করা সম্ভব নয়; কারণ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। তারা আরো যুক্তি পেশ করেন যে, মহান আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে। তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো তাকে স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নন। তাঁকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও আপত্তির মাধ্যমে বাতিল করে দেন।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি গাইব বা অদৃশ্য জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে ওহীর কাছে আত্মসমর্পনই মুক্তির একমাত্র পথ। ওহীর মাধ্যমে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে আল্লাহ কোনো নবীর সাথেও দেখা দেন না এবং তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। আবার ওহীর মাধ্যমেই আমরা জানি যে, কিয়ামতে কিছু মানুষ তাদের প্রতিপালকের দিকে তাঁকিয়ে থাকবেন এবং মুমিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখবেন। আর এতদুভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য নেই। যা কিছু বৈপরীত্য কল্পনা করা হয় তা সবই আখিরাত বা গাইবী জগতকে পার্থিব জগতের মত কল্পনা করার ফল এবং ওহীর নিকট আত্মসমর্পন না করার পরিণতি। মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের উপর 'কিয়াস' করে বা মানবীয় বিশেষণের মত মনে করে দর্শন ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যেয়ে এরা বিভ্রান্তির মধ্য নিপতিত হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতির অনুসরণে সকল আয়াত ও হাদীস সমানভাবে বিশ্বাস করেন। কারণ উভয় বিষয়ই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন। আর উভয়ের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা সুস্পষ্ট বৈপরীত্য নেই। মানবীয় জ্ঞান আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব বলে গণ্য করে না। কাজেই আখিরাতের দর্শনের খুটিনাটি বিষয় মানবীয় কল্পনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করা বা তা অস্বীকার করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়।

আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والله تعالي يُرَي في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية

"আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন। জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাঁকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের চর্মচক্ষু

দ্বারা। এই দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে।"[৬১৫]

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী বলেন: "জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভ সত্য। তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং আমাদের বোধগম্য কোনো ধরন বা প্রকৃতি ব্যতীত। আমাদের প্রতিপালকের গ্রন্থে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: "সে দিন অনেকের মুখ মন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের পানে দৃষ্টিমান থাকবে।"[৬১৬] এ বাণীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা যেভাবে তিনি বলেছেন সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর দ্বারা তিনি যে উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে। এতে আমরা নিজেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বা নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাব না। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিজেকে সমর্পন করে এবং তাঁর নিকট সংশয়যুক্ত বিষয়ের সঠিক জ্ঞান এর জ্ঞাতার উপর ছেড়ে দেয়। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ব্যতিরেকে কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে যা জানা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যার বুদ্ধি আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তুষ্ট হয় না সে খালেস তাওহীদ, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে দূরে থাকবে। এমতাবস্থায়, সে কুফরী ও ঈমান, সমর্পন ও অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবঞ্চিত, ওয়াওয়াসাগ্রস্ত, দিশাহারা ও সংশয়ী হয়ে দোটানায় দোদুল্যমান থেকে যায়। সে না হয় পূর্ণ সমর্পক মু'মিন এবং না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী কাফির। জান্নাত বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে তাদের পক্ষে বিশেষ কল্পনার বিষয় মনে করবে বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করবে। কারণ, আল্লাহর দর্শন এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা হলো এর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা। এই নীতির উপরই মুসলিমদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর, যে ব্যক্তি (আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি ও তুলনা করা হতে আত্মরক্ষা না করবে তার অবশ্যই পদস্খলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে। কেননা, আমাদের মহামহিম প্রভু অনন্য অতুলনীয় গুণাবলির দ্বারা বিশেষিত এবং একত্বের বিশেষণে বিভূষিত। বিশ্বলোকের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।"[৬১৭]

৪. ৫. ১২. কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ

৪. ৫. ১২. ১. কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন

কিয়ামত বা মহা প্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআন কারীমে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিক ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে'। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।"[৬১৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।"[৬১৯]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, 'তা কখন ঘটবে?' কিয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট। যে তা ভয় করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।"[৬২০]

৪. ৫. ১২. ২. কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাস

কিয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানান নি, তবে কিয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

"তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো

এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?"[৬২১]

কিয়ামতের বিষয়ে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন পূর্বভাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুমিন সরল অন্তকরণে সহজভাবে বিশ্বাস করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এগুলি মধ্যে কিছু বিষয়কে 'আলামাত সুগরা' (**العلامات الصغرى**) অর্থাৎ "ক্ষুদ্রতর আলামত' বা 'সাধারণ আলামত' এবং কিছু বিষয়কে 'আলামাত কুবরা' (**العلامات الكبرى**) অর্থাৎ 'বৃহত্তর আলামত' বা বিশেষ আলামত বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. ৫. ১২. ৩. আলামাত সুগরা

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। সাহল ইবনু সায়িদ আস সায়িদী বলেন:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে বলেন: "আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি।"[৬২২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস। বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামাত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ আলামতগুলি প্রকাশিত হবে।

৪. ৫. ১২. ৪. আলামাত কুবরা

সাহাবী হুযাইফা ইবনু আসীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বলেন

إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

"দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধুম্র, (৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজূজ-মাজূজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম (আ)-এর অবতরণ।"[৬২৩]

এ সকল আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সহ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। কুরআন কারীমে কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ

"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বাহির করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এই জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।"[৬২৪]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"আর 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়াম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের (ইহূদীদের) এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ্ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই

এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"[৬২৫]

এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর পুনরাগমনের পরে তাঁর মৃত্যুর আগে সকল কিতাবীই তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে।

ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

"এমন কি যখন য়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম'।"[৬২৬]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن

"দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৬২৭]

এখানে ইমাম আবূ হানীফ (রাহ) কিছু আলামতের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা হলো 'সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা মেনে নেওয়া।' ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: "আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করি, যেমন, দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরয (যমীনের জীব) নামে পরিচিত এক বিশেষ জন্তুর স্বীয় স্থান থেকে বহির্গত হওয়া। আমরা কোনো গণক, জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করি না। অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে ইসলামীর ঐক্যমত্যের বিপরীত কিছু দাবী করে।"[৬২৮]

৪. ৬. তাকদীরের বিশ্বাস

৪. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ

'কাদ্‌র' ও 'কাদার' (**القَدْرُ والقَدَرُ**) শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমান, মর্যদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।[৬২৯] ইসলামের পরিভাষায় 'ঈমান বিল কাদার' (**الإيمان بالقَدَر**) অর্থ আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যপী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাক্বদীরে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাক্বদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভাল মন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয়না। সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত 'পরিমাপ' বা 'ক্বাদার'-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"[৬৩০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে।"[৬৩১]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

"আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।"[৬৩২]

তাকদীরে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। এখানে তাকদীরে বিশ্বাসের মূল

বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

৪. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ নিম্নের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা:

৪. ৬. ২. ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয়না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই।

৪. ৬. ২. ২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস

ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হলো যে, আল্লাহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 'লাওহে মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানিনা। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও নেই অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"[৬৩৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃতি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও । আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ ও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"[৬৩৪]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"ভূপৃষ্টে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"[৬৩৫]

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেন:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সকলই আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহর নিকট সহজ।"[৬৩৬]

তিনি আরো বলেন:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِين

"আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"[৬৩৭]

অন্যত্র তিনি বলেন:

لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অণূ পরিমাণ কিছু কিংবা অদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এসবের প্রত্যেকটিই (লিপিবদ্ধ) আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"[৬৩৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ

করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে 'কিতাবে'। তা আল্লাহর জন্য সহজ।"[৬৩৯]

অন্যত্র তিনি বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লিপিবদ্ধ) থাকে; আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ।"[৬৪০]

তিনি আরো বলেন:

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন আর যা ইচ্ছা রেখে দেন, আর তার কাছেই আছে উম্মুল কিতাব বা মূল গ্রন্থ।"[৬৪১]

৪. ৬. ২. ৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার জ্ঞানে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাহিরে এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনাও ঘটেনা। কুরআন কারীমে বারংবার তা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৬৪২]

إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।"[৬৪৩]

৪. ৬. ২. ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস

মুমিন বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট। মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[৬৪৪]

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে! বল, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।"[৬৪৫]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"এবং আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা।"[৬৪৬]

৪. ৬. ২. ৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম করে সে শুধু তারই পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। কুরআন কারীমের মহান আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে তার ফল ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"[৬৪৭]

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নি দু'চক্ষু? আর জিহ্বা ও দু'ওষ্ঠ? এবং আমি তাকে কি দু'টি পথই দেখাই নি?"[৬৪৮]

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হবে, যে নিজকে পবিত্র করবে। এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজকে কলুষিত করবে।"[৬৪৯]

তাকদীরে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর জ্ঞান ও আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহর তাকদীর বা নির্ধারণে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয়। আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাস করলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয়। এ অবিশ্বাসের শুরু মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মকে মানুষের বিশেষণ বা কর্মের মত বলে বিশ্বাস করা থেকে। আল্লাহর সকল বিশেষণ সমানভাবে প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করলে এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

সম্ভবত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যাবে। আল্লাহর নির্ধারণ হলো যে, বিষ মৃত্যু আনে। মানুষকে আল্লাহ বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ মৃত্যু আনে। এরপরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যু বরণ করবে। তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে ঘটবে। আল্লাহ তাঁর অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বা না জেনে বিষ পান করবে। তিনি তাঁর এ জ্ঞান 'কিতাব মুবীন' বা 'লাওহে মাহফূযে' লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি হরণ করে তাকে বিষপান থেকে বিরত রাখতে পারেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহর জ্ঞান, লিখনি বা তাক্বদীর ও নির্ধারণ অনুসারে বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না। এবং বিষপানকারী বিষপানে তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্ম অনুসারে কর্মফল লাভ করবে।

৪. ৬. ৩. তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, গাইবী বিষয়ে বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর শিক্ষাকে আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে বিচার, গ্রহণ, সংযোজন ইত্যাদি করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ। মক্কার কাফিরগণ তাকদীর বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

"মুশরিকরা বলে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ও আমরা; তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষেধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপ করত। রাসুলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।"[৬৫০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

"যারা শিরক করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না।' এ-ভাবে তাদের পূর্ববতীগণও কুফ্‌রী করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের নিকট কোন 'ইলম' আছে? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর; তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল। বল, 'চুড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন।"[৬৫১]

কাফিরদের এ বিকৃতির ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি। কাফিরগণ বলেছে: "আল্লাহ চাইলে আমরা এরূপ করতাম না"। এ কথা দ্বারা তারা বুঝাচ্ছে যে, আমরা যে শিরক করছি তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে এবং আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন। কাজেই এ কাজের প্রতিবাদ করা বা একে অন্যায় বলা যায় না।

মহান আল্লাহ বলেন: "তোমাদের নিকট 'ইলম' থাকলে তা দেখাও।" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিষয়ে যা বলছ তা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো ইলম বা কিতাবে থাকলে তা দেখাও। তোমরা যা বলছ তা ওহীর জ্ঞান নয়, বরং তা যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক 'ধারণা'

মাত্র। আর প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর নামে মিথ্যা। এরপর আল্লাহ ওহীর জ্ঞানটি জানিয়ে দিলেন, তা হলো: "তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন।"

এখানে ওহীর জ্ঞান: "আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে হিদায়েত করতেন।" ওহীর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ: আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন এবং ঈমানকে পছন্দ করেন তা তোমাদেরকে ওহীর জ্ঞান ও বিবেকের নির্দেশনার মাধ্যমে জানিয়েছেন। তবে তোমরা তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অপব্যবহার করে কুফরী করেছ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। তবে তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমরা সে দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।

আর কাফিরদের দাবি: "আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না।" কাফিরদের দাবি ওহীর বিকৃতি ও ওহীকে নিজেদের মর্যি মত ব্যাখ্যার ফল। তারা ওহীর অন্য সকল নির্দেশনা বাদ দিয়ে দু একটি নির্দেশনাকে নিজেদের মর্যি মত ব্যাখ্যা করেছে। তাদের যুক্তি আমরা নিম্নভাবে সাজাতে পারি: আল্লাহ বলেছেন: 'তিনি চাইলে আমাদেরকে হেদায়াত করতেন।' এতে বুঝা যায় যে তিনি চাইলে আমরা শিরক করতাম না। এতে বুঝা যায় যে, তিনি চান বলেই আমরা শিরক করি। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট।" কাফিররা যে দাবি করছে হুবহু সে কথা কোনোভাবে কোনো ওহীর শিক্ষায় নেই। তা ওহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি-তর্ক নির্ভর 'ধারণা' এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা মাত্র।

এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, এ সকল মনগড়া তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা রাসূলের দায়িত্ব নয়। বরং ওহীর হুবহু শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়াই তাঁর দায়িত্ব।

৪. ৬. ৪. ইসলামী তাক্বদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা

ইসলামী তাক্বদীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয়। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার। আমরা দেখলাম যে, এ সকল চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক 'ধারণা' মাত্র, মক্কার কাফিরদের ধারণার মতই একটি বিকৃত ধারণা মাত্র।

যে অবিশ্বাসী তাক্বদীর নিয়ে বিবাদ করে, তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে দেয় সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার করা।

আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয়। তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানাননি। কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবেনা। এসব কিছুই তাঁর মহান রুবূবিয়্যাতের অংশ। মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও করুণার উপরে আস্থা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা মনে স্থান না দেওয়া। ইসলামের তাক্বদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমুখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমূখ করেনা। তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। মুসলিম জানে যে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের জন্য দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলে দায়িত্ব এমন এক সত্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, যিনি কাউকে জুলুম করেন না। যিনি তাঁর বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান। তাই মুমিন উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে কর্ম করেন।

তাক্বদীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠেনা। সে জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে। তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। কৃতজ্ঞ হৃদয় আর অহংকারী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে মানবিক ও পাশবিক হৃদয়ের পার্থক্য।

অপরদিকে মুমিন ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও কর্মের জন্য সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করবে। কাজেই সে হতাশ না হয়ে নিজের কর্মের ভুল দূর করে আল্লাহর নির্দেশ মত চেষ্টা করতে থাকে, ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়।

তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাই এ বিশ্বাস সর্বপ্রথম যাদের জীবনে এসেছিল তাঁদের জীবনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে। আমরা দেখেছি তাক্বদীরের উপর সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মহানবী (ﷺ)-এর, আর তাই তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর। তিনি তার সাধ্যমত কর্ম করেছেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তার করুণার জন্য, আর ফলাফলের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তার প্রতিপালকের কাছে। ঠিক তেমনি অকুতোভয় দুঢ়প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাক্বদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে।

এ বিশ্বাসের জন্যই অতি নগন্য সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। এইরূপ অকুতোভয় শক্তিশালী তাক্বদীরে বিশ্বাসী কর্মবীর মুমিনকে আল্লাহ ভালবাসেন, যার তাক্বদীরে বিশ্বাস তাকে পরাজয়ের হতাশা, হা হুতাশ ও গ্লানি থেকে রক্ষা করে। অতীতের পরাজয় বা ব্যর্থতা নিয়ে যিনি আফসোস বা হা-হুতাশ করেন না, আবার ভবিষ্যতের পরাজয়ের দুশ্চিন্তাও তাকে দ্বিধান্বিত করতে পারে না। বরং সকল পরাজয় পায়ে দলে তাকদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যান। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দূর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম, দূর্বল বা হতাশ

হয়ে যেওনা। যদি তোমার কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবেনাঃ হায়, যদি আমি ঐ কাজ করতাম বা সেই কাজ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো.. (অতীতের ব্যার্থতা নিয়ে হা হুতাশ করবে না) বরং (তাক্বদীরের বিশ্বাসের বলীয়ান হয়ে) বলবেঃ আল্লাহর তাক্বদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহর যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন। কারণ, অতীতকে নিয়ে আফসোস করে "যদি ঐ কাজ করতাম তবে হয়ত এরূপ হতো"-এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"[৬৫২]

তাক্বদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। সেখানে শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহর আমাদের সবাইকে ঈমান দান করুন। আমাদেরকে ঈমানের শক্তিতে, কর্মের শক্তিতে, দেহের শক্তিতে, জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা দয়া ও মেহেরবানী পূর্বক যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ করা। সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি তাওফীক প্রদান করেন না। বিষয়টি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপা ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদানও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে নেয়। বরং আমার বলিঃ বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়।"[৬৫৩]

"মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি কুফ্‌রী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফ্‌রী করেছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে। তিনি আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে সম্বোধন করেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্‌র থেকে নিষেধ করেন। তারা তাঁর রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঈমান। আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে। এরপর যে কুফ্‌রী করে সে নিজেকে পরিবর্তন করে ও বিকৃত করে। আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার প্রকৃতিগণ ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিন-রূপে বা কাফির-রূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তি-রূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্‌র বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না। বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃতভাবে তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা তার স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।"[৬৫৪]

উপরের আলোচনা থেকে তাকদীরের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস জানতে পেরেছি। এখানে মূল বিষয়, বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা। মহান আল্লাহ বলেছেন, বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট করব না, কারো উপর জুলুম করব না, প্রত্যেককে তার প্রত্যেক কাজের ফল দান করব। আবার তিনি বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না। এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্পঃ একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তার মনে নানন প্রশ্ন। আল্লাহ যখন সবই জানেন তাহলে আর কষ্ট করে কি লাভ। আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? এভাবে বান্দা আল্লাহ জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে। এ বান্দা মূলত আল্লাহর নির্দের্শেও বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করেনি। সে নিজেকে আল্লাহর কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে সে ধ্বংসগ্রস্ত।

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার দায়িত্বও নয়। আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি। আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি। নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেনঃ "মূল তাক্বদীর হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ তা'আলার এক রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতাও যেমন অবগত নন, তেমনি কোনো নবী রাসূলও অবগত নন। এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিনতি ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমা লংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কুমন্ত্রনা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাক্বদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেনঃ "তিনি যা করেন

সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।"[৬৫৫] সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সে কাফিরদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। এ হচ্ছে ইসলামী আক্বীদার মোটামোটি বিষয় যার প্রতি আলোজ্জল হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ মুখাপেক্ষী। আর এটাই হচ্ছে সুগভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যায়। কারণ, জ্ঞান দু প্রকার, এক প্রকার জ্ঞান: যা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান (যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছে)। অতএব বিদ্যমান জ্ঞানের অস্বীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ যা জানান নি সেরূপ গাইবী জ্ঞান) দাবীও কুফরী কাজ। প্রকৃত ঈমান কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন বিদ্যমান জ্ঞানকে বরণ করা হয় এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষণ বর্জন করা হয়। (মহান আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকু গ্রহণ ও বিশ্বাস এবং যা বলেন নি তা নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা বর্জন করা।)"[৬৫৬]

পঞ্চম অধ্যায়: অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ঈমানের পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত 'অবিশ্বাস'। 'অবিশ্বাস' সামগ্রিক বা ব্যাপক হতে পারে এবং আংশিকও হতে পারে। আমরা দেখেছি যে, ঈমান বা বিশ্বাসের বিভিন্ন রুকন ও বিষয় রয়েছে। কোনো অবিশ্বাসী এ সকল রুকন বা বিশ্বাসের সকল বিষয় 'অবিশ্বাস' করতে পারে। আবার অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের বিভ্রান্তি আংশিকও হতে পারে। এমন অনেক দেখা যায় যে, কোনো কোনো অবিশ্বাসী ঈমানের কিছু বিষয় বিশ্বাস করেন এবং কিছু বিষয় অবিশ্বাস করেন। সামগ্রিক বা আংশিক উভয় প্রকার অবিশ্বাসেরই বিভিন্ন কারণ ও প্রকার রয়েছে।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানের বিশুদ্ধ বিশ্বাস থেকেই অবিশ্বাস বা কুফর ও শিরক জন্ম নিয়েছে। ঈমান থেকেই কুফরী জন্মেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈমানের নামেই কুফরী প্রচারিত হয়েছে। ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের অবিশ্বাসীগণ মূলত আসমানী কিতাব বা ওহী এবং আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন। কুরআন কারীমে এদের বিভ্রান্তির কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাসের কারণ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এ বিষয়ক অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা অবিশ্বাসের ধরন, কারণ, প্রকরণ ও প্রকাশগুলি আলোচনা করব। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৫. ১. কুফ্‌র

৫. ১. ১. অর্থ ও পরিচিতি

আরবী 'কুফ্‌র' (الكفـرُ) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ 'আবৃত করা'। ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: "(কাফ, রা ও ফা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হলো: 'আবৃত করা বা গোপন করা'। কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফ্‌র' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয়, কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে 'কুফ্‌র' বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফ্‌র বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।"[৬৫৭]

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফ্‌র বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফ্‌র' বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফ্‌র' বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শির্‌ক বলা হয়।

৫. ১. ২. কুফ্‌র আক্‌বার ও কুফ্‌র আস্‌গার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফ্‌রকে দু ভাগে ভাগ করা হয়: (১) কুফ্‌র আকবার বা বৃহত্তর কুফ্‌র এবং (২) কুফ্‌র আসগার বা ক্ষুদ্রতর কুফ্‌র। কুফ্‌র আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিভোগ। আর কুফ্‌র আসগার বলতে বুঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য করা হয় না। তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না। বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়।

৫. ১. ৩. কুফ্‌র আক্‌বার-এর প্রকারভেদ

কুফর আকবার বা 'বৃহত্তর কুফর'-ই প্রকৃত কুফর বা অবিশ্বাস। তাওহীদ ও আরকানুল ঈমানের আলোকে আমরা কুফ্‌র বা অবিশ্বাসকে আমরা নিম্নের পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

৫. ১. ৩. ১. 'প্রতিপালনের একত্বে' অবিশ্বাস

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের প্রথম পর্যায় তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত। এ বিষয়ে কোনো প্রকার অবিশ্বাস, অস্বীকার, দ্বিধা, সন্দেহ বা আংশিক বিশ্বাস 'কুফ্‌র' বলে গণ্য। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তাঁর স্রষ্টাত্বে অবিশ্বাস, অন্য কোনো স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস, তার প্রতিপানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কারো বিশ্ব পরিচালনা, প্রতিপালন বা মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস, তার রিয্‌ক দানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কোনো রিযিকদাতা আছে বলে বিশ্বাস, ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্‌র। অনুরূপভাবে কিছু বিষয়ে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও কিছু বিষয়ে তা অবিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্‌র।

৫. ১. ৩. ২. নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস

'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব আমরা তাওহীদ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির কিছু বা সব অস্বীকার করা এ পর্যায়ের কুফর। এ কুফ্‌র দু প্রকারের:

প্রথমত: কুফরুন নাফই (كفر النفي) বা অস্বীকারের কুফ্‌র

এর অর্থ আল্লাহ যে সকল নাম ও গুণ তাঁর আছে বলে জানিয়েছেন তার সব বা যে কোনো একটি অবিশ্বাস বা অস্কীকার করা। যেমন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), রাহমাত... ইত্যাদি যে কোনো এক বা একাধিক নাম বা গুণ অস্বীকার করা, বা তার পূর্ণতা অস্বীকার করা। আল্লাহর কোনো কর্ম বা গুণ তার সৃষ্টির মত বা তুলনীয় বলে বিশ্বাস করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌র বা অবিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত: কুফরুল ইসবাত (كفر الإثبات) বা দাবির কুফ্‌র

এর অর্থ আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন তাঁর তা আছে বলে দাবি করা। যেমন আল্লাহর জন্য ঘুম, তন্দ্রা, সন্তান, স্ত্রী ... ইত্যাদি দাবি করা।

আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যে সকল বিশেষণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি নিজের জন্য বা অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক গুণ বা বিশেষণ দাবি করে তবে তাও এ প্রকারের কুফরী বলে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহর মত ইলম, হিকমত, রহমত... ইত্যাদি অন্য কারো আছে বলে দাবি করা। এরূপ দাবি স্বীকার বা বিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্‌র।

৫. ১. ৩. ৩. ইবাদতের একত্বে অবিশ্বাস

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের চূড়ান্ত পর্যায় তাওহীদুল উলূহিয়্যাত বা তাওহীদুল ইবাদাত। সকল নবী-রাসূল ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের ইবাদত বর্জন কর।

আল্লাহর ইবাদতের একত্বে অস্বীকার করা, তাঁর মা'বূদ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস পোষণ করা বা অন্য কেউ কোনোরূপ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আছে বলে বিশ্বাস করা এ পর্যায়ের কুফর। আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফিরই এ প্রকারের কুফরে নিপতিত হয়েছে।

৫. ১. ৩. ৪. মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতে অবিশ্বাস

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ ও বিষয়বস্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ব, রিসালাত, নুবুওয়াত, নুবুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নুবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, স্থায়িত্ব, সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ ইত্যাদি কোনো বিষয়ে অস্বীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ এ পর্যায়ের কুফ্‌র। মুহাম্মাদ (ﷺ) যা কিছু বলেছেন তার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌র।

এ পর্যায়ের কুফ্‌র-এর দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমত, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্বে সন্দেহ, দ্বিধা বা অভিযোগ

কেউ যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সত্যবাদিতায়, নিষ্কলুষ চরিত্রে, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বে, ইসলাম প্রচারে তাঁর পূর্ণতায়, তাঁর ধার্মিকতায়, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে সন্দেহ, আপত্তি বা অভিযোগ করে তবে তা এ পর্যায়ের কুফরী।

দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কথা বা শিক্ষায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নুবুওয়াতের বিশ্বাসের অর্থই হলো তিনি যা বলেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন তা সবই সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে

বিশ্বাস করা। তিনি বলেছেন বলে প্রমাণিত কোনো সংবাদ, শিক্ষা, কথা বা বক্তব্যকে অসত্য বলে মনে করা বা সন্দেহ করা এ পর্যায়ের কুফ্‌রী। মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন কিনা তা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। প্রমাণিত হওয়ার পরে কোনো মুমিন তার সত্যতায় সন্দেহ বা দ্বিধা করতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন বা কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে তাঁর বক্তব্য বা শিক্ষা হিসেবে প্রমাণিত। আরকানুল ঈমান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সবই এই পর্যায়ের। খাবারু ওয়াহিদ হিসেবে বর্ণিত বিষয়গুলি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হলে তাও সাধারণভাবে বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তবে সাধারণভাবে খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের সহীহ হাদীসে প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করলে তাকে বিভ্রান্ত বলা হয়, তবে কাফির বলা হয় না। এ বিষয়ে আমরা এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

কুরআন অথবা সুন্নাত দ্বারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌রী। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, ব্যভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের, তাহারাত, রাক'আত, সময়, সাজদা, রুকু ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার, ব্যতিক্রম করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্‌র। তবে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করলে তা ওযর বলে গণ্য হতে পারে। কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফ্‌র বলে গণ্য হবে না।

৫. ১. ৩. ৫. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফ্‌র

কোনো প্রকার কুফ্‌রে সন্তুষ্ট থাকা কুফ্‌র। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফ্‌র। এ প্রকারের কুফরের মধ্যে রয়েছে:

(ক) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করা বা আল্লাহর যিক্‌র, কুরআন, ইসলাম বা ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো কিছু প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"[৬৫৮]

(খ) ইসলামের কোনো প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা, মস্করা বা উপহাস করা অথবা যার এরূপ করে তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয়। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।"[৬৫৯]

(খ) মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের, যারা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কোনো রূকন বা কুরআন-হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করেছে, আপত্তিকর বলে বিশ্বাস করেছে বা উপহাস করেছে, যাদের কুফ্‌র সন্দেহাতীতভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত এবং যাদের কুফ্‌র-এর বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন তাদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করা, কাফির বলে গণ্য না করা, তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ বা দ্বিধা করা। অথবা এরূপ কাফিরগণকে আন্তরিক বন্ধু, সহযোগী ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা। তবে তাদের সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাখা ও মানবীয় সহযোগিতা নিষিদ্ধ নয়।

কুরআনে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।"[৬৬০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

"হে মুমিনগণ, মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?"[৬৬১]

অন্যত্র তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হয়ে যাবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৬৬২]

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে তোমারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।"[৬৬৩]

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের পিতাগণ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফ্রীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।"[৬৬৪]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"মুনাফিকগণকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে! মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট ইয্যত-ক্ষমতা চায়? সমস্ত ইয্যত-ক্ষমতা তো আল্লাহরই। কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন, যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতই হবে। মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।"[৬৬৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধচারিগণকে, হোক না কেন এ সকল বিরুদ্ধচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র।"[৬৬৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমারেদকে স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করে নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।"[৬৬৭]

(গ) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুসরণ করে কেউ মুক্তিলাভ করতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে বা আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[৬৬৮]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬৬৯]

৫. ১. ৪. কুফ্‌র আকবার-এর বিভিন্ন প্রকাশ

কুরআনের আলোকে কুফর আকবার-এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে:

৫. ১. ৪. ১. কুফ্‌র তাকযীব বা মিথ্যা মনে করার কুফর

অর্থাৎ ওহীর নির্দেশনাকে মিথ্যা বলে মনে করা করা। এ হলো যুগে যুগে কুফ্‌র বা অবিশ্বাসের প্রধান প্রকার। নবী-রাসূলগণের দাও'আতের মাধ্যমে, অথবা অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে, অথবা আসমানী কিতাব পাঠের মাধ্যমে যখন মানুষের কাছে ওহীর শিক্ষা উপস্থিত হয় তখন এরূপ অবিশ্বাসী ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?"[৬৭০]

৫. ১. ৪. ২. কুফ্‌র ইসতিকবার বা অহঙ্কারের অবিশ্বাস

অর্থাৎ অহঙ্কার বশত ঈমানের কোনো বিষয়ের সত্যতা অনুভব করার পরেও তা অস্বীকার করা। অনেক অবিশ্বাসীই এরূপ কুফরে লিপ্ত হয়। এরূপ অহঙ্কারের কুফরে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয় ইবলীস। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"যখন ফিরিশতাদের বললাম 'আদমকে সাজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল; সে অমান্য করল এবং অহংকার করল, সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[৬৭১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ ফিরাউন ও অন্যান্য কাফিরদের বিষয়ে বলেন:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

"তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!"[৬৭২]

৫. ১. ৪. ৩. কুফ্‌রু শাক্ক বা সন্দেহের অবিশ্বাস

ঈমানের কোনো বিষয়ে হৃদয়ে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকাকে সন্দেহের কুফর বলা হয়। ঈমানের অর্থ সন্দেহাতীত প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা। কাজেই কোনো বিষয়ে যদি মনে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বদলে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে তাকে কুফর বলে গণ্য করা হয়।

একজন কাফির ও একজন মুমিনের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا

"এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এ কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই (কিয়ামত যদি হয়-ই) তবে আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করব।' তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি কি কুফরী করছ তাঁর সাথে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাংগ করেছেন তোমাকে মনুষ্য আকৃতিতে?"[৬৭৩]

৫. ১. ৪. ৪. কুফ্‌র ই'রায বা অবজ্ঞার কুফ্‌র

দীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করে নির্লিপ্ত থাকা, বা ঈমানের বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করাকে কুফরু ই'রায বা অবজ্ঞার কুফর বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

"যারা কাফির তারা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে বে-খেয়াল বা মুখ ফিরিয়ে থাকে।"[৬৭৪]

৫. ১. ৪. ৫. কুফ্রু নিফাক বা মুনফিকীর কুফর

অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবি করাকে কুফরু নিফাক বলে। নিফাক বা মুনাফিকী কুফর এর একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বাসের নিফাক ছাড়াও কর্মের নিফাকের একটি পর্যায় রয়েছে।

৫. ১. ৫. নিফাক: পরিচিতি ও প্রকারভেদ

আরবীতে 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি।[৬৭৫] নিফাকে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক' বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকার: (১) বিশ্বাসের নিফাক ও (২) কর্মের নিফাক।

৫. ১. ৫. ১. বিশ্বাসের নিফাক (النفاق الاعتقادي)

অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বা নিফাক ই'তিকাদী বলা হয়। এরূপ নিফাকের স্বরূপ নিম্নরূপ: (১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল শিক্ষা বা দাও'আত বা তাঁর শিক্ষার কোনো দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, (২) তাঁকে ঘৃণা করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা (৩) তাঁর কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা, (৪) তাঁর দীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা (৫) তাঁর দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিফাকের কথাই বলা হয়েছে। এরূপ নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ

"তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হরিয়ে ফেলেছে।"[৬৭৬]

৫. ১. ৫. ২. কর্মের নিফাক (النفاق العملي)

আমরা জানি যে, বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীন বিশ্বাসের প্রতিফলন। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু বাইরে বিশ্বাস দাবি করে স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যেগুলি প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। হাদীস শরীফে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে: (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।"[৬৭৭]

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম 'কুফর' বা অবিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না। বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে।

৫. ১. ৬. কুফ্র আস্গার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস

কুফর মূলত হৃদয়ের অবিশ্বাসের নাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মের নাম নয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে যে সকল 'পাপ কর্ম'-কে কুফর বলা হয়েছে কিন্তু যেগুলির সাথে হৃদয়ের অবিশ্বাস জড়িত নয় সেগুলিকে 'কুফর আসগার' বা 'কুফরুন নি'মাহ (**كفر النعمة**) অর্থাৎ নিয়ামতের অস্বীকার বা কুফর মাজাযী (**الكفر المجازي**) বা রূপকার্থে কুফর বলে অভিহিত করা হয়।[৬৭৮]

কুরআনে অবিশ্বাসের পাশাপাশি অকৃতজ্ঞতাকেও কুফ্র বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর রিয্ক, অতঃপর তা আল্লাহর নিয়ামতের কুফ্রী করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছদনের।"[৬৭৯]

এছাড়া আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পাপ ও অবাধ্যতার সহ-অবস্থান না হওয়াই ঈমানের দাবি। বস্তুত বিশ্বাসের ঘাটতি ছাড়া কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি, তাঁর সিফাতসমূহের প্রতি, আখিরাতের প্রতি ও আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস পরিপূর্ণ থাকলে কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। এজন্য পাপে লিপ্ত হওয়া বিশ্বাসের ঘাটতি বা অপূর্ণতা নির্দেশ করে। তবে যতক্ষণ এরূপ অপূর্ণতা পূর্ণ অবিশ্বাসে পরিণত না হয় ততক্ষণ একে 'কুফর্ আসগার' বা কুফর মাজাযী (রূপক কুফর) বলে অভিহিত করা হয়।

কুরআন ও হাদীসে অনেক কঠিন পাপকে কুফ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে, আবার অন্যত্র এ সকল 'কুফ্রী'তে লিপ্ত মানুষদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের সমন্বয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সকল অপরাধ 'কুফ্র আসগার' বা ক্ষুদ্রতর কুফ্র বলে গণ্য। এগুলি কঠিন পাপ, তবে যদি কেউ এগুলিকে পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে, নিজেকে অপরাধী বলে বিশ্বাস করে শয়তানের প্ররোচনায় বা জাগতিক কোনো স্বার্থে এরূপ পাপে লিপ্ত হয় তবে সে পাপী মুমিন বলে গণ্য হবে, ইসলাম ত্যাগকারী বা পারিভাষিক কাফির বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ এরূপ কর্ম বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা ঐচ্ছিক মনে করে, বা আল্লাহর এ সকল নির্দেশ বা যে কোনো নির্দেশ মান্য করা তার নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বা কোনো যুগের জন্য অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে বা অন্য কোনো ধর্মের বা সমাজের বিধান অধিকতর উপযোগী বলে মনে করে তবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৬৮০]

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে আল্লাহর বিধানের বাইরে চলা বা যে কোনো পাপ করাই কুফরী, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বাইরে চলে বা পাপে লিপ্ত হয় সে মুলত তার নিজের জন্য বা অন্যের জন্য আল্লাহর বিধানের বাইরে বাইরে ফয়সালা করল। আর আল্লার নাযিলকৃত বিধানাবলির অন্যতম যে, মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে হানাহানি বা যুদ্ধে রত হবে না। ইবনু আব্বাস (রা), আবূ বাক্রাহ সাকাফী (রা), ইবনু উমার (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির হাদীসে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেন:

لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না, যে একে অপরকে হত্যা করবে।"[৬৮১]

এখানে স্পষ্টতই পরস্পরে যুদ্ধ করাকে কুফরী বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।"[৬৮২]

কিন্তু অন্য আয়াতে এরূপ কর্মে রত মানুষদেরকে মুমিন বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমলঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মুমিনগণ পরস্পর ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[৬৮৩]

এখানে আমরা দেখছি যে, পরস্পকের যুদ্ধে রত মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবেই মুমিন বলা হয়েছে। কারণ এরূপ কর্ম কুফর আসগার বা কুফর মাজাযী হওয়ার কারণে তা ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে।

৫. ২. শিরক

৫. ২. ১. অর্থ ও পরিচিতি

ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের প্রসঙ্গে আমরা 'শিরক' শব্দটির অর্থ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আরবীতে শির্ক (**شِــرْكٌ**) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate)। ইশরাক (**إِشْــرَاك**) ও

তাশ্‌রীক (**تَشْــرِيك**) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে 'শির্‌ক' শব্দটিকেও আরবীতে 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লার সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় 'আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শির্‌ক।'

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে 'আল্লাহর সমতূল্য' করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।"[৬৮৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ

"এবং তারা আল্লাহর সমতুল্য উদ্ভাবন করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।"[৬৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৬৮৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে কাউকে মহান আল্লাহর 'নিদ্দ' মনে করাই শিরক। আরবীতে 'নিদ্দ" (**النِّــدّ**) অর্থ সমতুল্য, মত, সমকক্ষ, তুলনীয় ইত্যাদি। কাউকে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য মনে করা, অথবা আল্লাহকে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করাই শিরক।[৬৮৭]

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য: **প্রথমত,** কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনোভাবে কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তাঁর একত্বে অবিশ্বাস বা কুফরী করা। আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের দাও'আতে অবিশ্বাস না করে কেউ শির্‌ক করতে পারে না। কাজেই শি্‌রকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাস করা। অপরদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মেনে ঈমানের কোনো রুকন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফর বলে গণ্য। যেমন যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বা তাঁর প্রতিপালনের একত্বে অবিস্বাস করেন বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাত, খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি অস্বীকার করেন তবে তা কুফর হলেও বাহ্যত তা শিরক নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরের সাথেও শিরক জড়িত। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষয়িষ্ণু জড় বিশ্বকে মহান আল্লাহ মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোনো শক্তিকে বিশ্বাস করছে।

দ্বিতীয়ত, কুফর বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ শিরক। সাধারণভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবালি বা তাঁর মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করেই কুফরী করেছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শিরকের কথাই বেশি বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে, দুভাবে শিরক হয়ে থাকে: (১) মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা বা অব-ধারণা।

শিরকে নিপতিত মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত-প্রাপ্ত মানুষ, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে 'অলৌকিক শক্তি' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তাঁর সন্তান, পরিষদ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত শিরক এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিরক পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই। এবং এদুটি বিষয়ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জর অর্থই আল্লাহর ক্ষমতা, রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।

৫. ২. ২. শিরকের হাকীকত

আল্লাহ ছাড়া কাউকে ক্ষমতায় ও সৃষ্টিতে বা সকল দিক থেকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা যেমন শিরক, তেমনি মহান আল্লাহ কাউকে নিজের শরীক বানিয়ে নিয়েছেন, বা কাউকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, 'উলূহিয়্যাত' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করাও শিরক। তবে সাধারণত কোনো মুশরিকই কাউকে সকল দিক থেকে বা স্বকীয় ভাবে আল্লাহর সমতুল্য বলে শিরক করে নি, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের শিরকই সর্বদা ব্যাপক।

ইতোপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ কাউকে আল্লহর মত বা আল্লাহর সমতূল্য স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান বা স্বকীয় ক্ষমতায় ইলাহ বা মাবূদ হিসেবে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য বলে মনে করত না। বরং মহান আল্লাহকেই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, মহাবিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম মালিক, রিয্‌কদাতা, মৃত্যুদাতা ও সকল কিছুর পরিচালক বলে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত যে সকলেই আল্লাহর বান্দা। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে সাধারণ বান্দাদের চেয়ে উর্ধ্বে উঠেন, যাদেরকে আল্লাহ খুশি হয়ে নিজের কর্মে ও ক্ষমতায় শরীক করেছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও এদের শাফা'আত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তারা এদের ইবাদত করত। এভাবে আমরা দেখি যে, কিছু "অলৌকিক ক্ষমতায়" এবং "ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতায়" তারা আল্লাহর কিছু বান্দাকে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য বলে বিশ্বাস করত। আর এরূপ করাকেই কুরআন ও হাদীসে 'আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য নির্ধারণ করা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: "শিরকের হাকীকত এই যে, কোনো মানুষ কোনো কোনো সম্মানিত মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে। এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এরূপ কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এরূপ গুণ মূলত একমাত্র আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যাকে 'উলূহিয়্যত' বা এরূপ বিশেষত্ব প্রদান করেন, অথবা 'আল্লাহ' যে ব্যক্তির সত্তার সাথে সংমিশ্রিত হন, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যাত বা সত্তার মধ্যে 'ফানা' বা বিলুপ্তি লাভ করে এবং আল্লাহ সত্তার সাথে 'বাকা' বা অস্তিত্ব লাভ করেন, বা অনুরূপ কোনো ভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এরূপ ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলূহিয়্যাত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আরবের কাফিরগণ হজ্জের 'তালবিয়া'র মধ্যে ও কাবাঘর তাওয়াফের সময় বলত:

لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক.... আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়া। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন ...।[৬৮৮]

অন্যত্র তিনি আরবের মুশরিকদের ইবরাহীম (আ)–এর দীন থেকে বিচ্যুতি ও শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তাদের শিরকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন: "এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই। তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত। কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন। তারা আরো ধারণা করত যে, একজন মহারাজ তার প্রজাগণের খুটিনাটি বিষয় নিজে সম্পন্ন বা পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন। সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তাঁর কিছু নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে উলূহিয়্যের উপঢৌকন প্রদান করেছেন এবং এদের বিরক্তি ও সন্তুষ্টিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবময় করে দিয়েছেন।

এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে পারে। আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহর দরবারে কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এ ধারণা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রেথিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সামনে সাজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে ত্রান ও সাহায্য প্রার্থনা কর, পাথরে, তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি একে রাখ, এদের এ সকল প্রতৃিকতি সামনে রেখে এদের রূহের (আত্মার) প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হও। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রজন্মগুলির মানুষেরা মুর্খতার কারণে এদের এ সকল মুর্তি ও প্রতিকৃতিকেই প্রকৃত ইলাহ বা মা'বূদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে।"[৬৮৯]

৫. ২. ৩. শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা। হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক। তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

আমরা প্রথমে তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরক আকবারের প্রকারভেদ ও শিরক আসগারের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা করব। এরপর শিরক প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহর পদক্ষেপ আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ২. ৩. ১. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তাওহীদের বিপরীতই শিরক। এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা হয়:

৫. ২. ৩. ১. ১. প্রতিপালনের শিরক্ (الشرك في الربوبية)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিয্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রুবূবিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে।

৫. ২. ৩. ১. ২. নাম ও গুণাবলির শির্ক (الشرك في الأسماء والصفات)

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

৫. ২. ৩. ১. ৩. ইবাদতের শিরক (الشرك في الألوهية)

'ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে 'ইবাদতের শির্ক' বলা হয়। ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক।

৫. ২. ৩. ২. শির্ক আস্গার (الشرك الأصغر)

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শির্ক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ক্রোধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তার নিকট চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে শির্ক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম:

৫. ২. ৩. ২. ১. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া (**الرياء**) অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা (To act ostentatiously, make a show before people, attitudinize, to do eyeservice)। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[৬৯০]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিয়াকে 'শিরক আসগার' অর্থাৎ 'ছোট শিরক' বা 'শিরক খাফী' অর্থাৎ 'লূক্কয়িত শিরক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন

করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!"[৬৯১]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।"[৬৯২]

এখানে লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতটি পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলে ইবাদতটি পালনই করবে না।

৫. ২. ৩. ২. ২. ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকছি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরূপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে ... ইত্যাদি। এরূপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা 'শিরক আকবার' বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোনো কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান। অমুক কারণটি না হলে কার্যটি হতো না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার করণে অমুক কাজটি হয়েছে। রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলতে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে।

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বাসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের মানুষই একমত। কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওসীলাগুলি অন্য বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শির্ক আকবার বা শির্ক আসগার হতে পারে।

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওযনে, পরিমানে কম বা ভেজাল দেওয়ার কারণে জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বেড়েছে... যিক্‌র-ইসতিগফারের কারণে রিযকে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত এসেছে....। মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্যকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথাগুলি তাদেরই কথা। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সংঘটনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরক আকবারে লিপ্ত প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা

শিরক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শিরকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহর নামে কঠিন মিথ্যচার বলে গণ্য হবে। কারণ কখনো কোথাও অল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান নি যে, এগুলি এরূপ বিষয়ের কারণ।

আর যদি কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে কথার মধ্যে এরূপ বলে ফেলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, এগুলির একমাত্র পরিচালক আল্লাহ, রাশিচক্র বা অনুরূপ কোনো কিছু এক্ষেত্রে কোনোরূপ দখল নেই, তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে, যা কঠিন কবীরা গোনাহ। কারণ তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামতকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন যার সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। তিনি তার কথায় আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছেন।

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতুল ফাজর আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রব্ব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উত্তম জানেন'। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَـــافِرٌ بِالْكَوْكَـــبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

"আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ সকালে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং কেউ আমার প্রতি কুফ্‌রী করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা আল্লাহর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং গ্রহনক্ষত্রের প্রতি কাফির। আর যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি কুফরী করেছে এবং গ্রহনক্ষত্রে ঈমান এনেছে।"[৬৯৩]

৫. ২. ৩. ২. ৩. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা

এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন 'আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে। যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না' তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন 'এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,' অথবা 'আপনি যা চাইবেন তাই হবে'। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: 'আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, 'হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি বলেন, "হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপ্নি যা ইচ্ছা করেন..." তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

এখানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়:

প্রথমত, মানবীয় ইচ্ছার পরিসর সকলেরই পরিজ্ঞাত। মানুষ তারা ইচ্ছাধীন বা কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের ইচ্ছা লৌকিক এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছা 'অলৌকিক' বা 'অপার্থিব'। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে। তিনি 'হও' বললেই সব হয়ে যায়। এরূপ 'ইচ্ছা'-র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এরূপ 'অলৌকিক' ইচ্ছা আছে বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শিরক্ আকবার এবং মহান আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কাউকে এরূপ ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে কোথাও জানান নি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, আরবের কাফিরদের শিরকের মূল ভিত্তি ছিল এরূপ চিন্তা। তারা নবী-ওলীদের মুজিযা-কারামত এবং ফিরিশতাদের দায়িত্ব ও সুপারিশগ্রহণ বিষয়ক ওহীর নির্দেশনাগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে এ সকল বিষয়কে তাদের অলৌকিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করত। কেউ যদি এরূপ অর্থে বলে যে 'আল্লাহ এবং আপ্নি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার এবং এর সংশোধনী হলো 'মহান আল্লাহ একাই যা চান তাই হবে, অন্যের ইচ্ছার মূল নেই।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা ও মহান আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচাধীন কোনো বিষয়ের আলোচনায় বলেন: 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান' অথবা বলেন 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তবে মহান আল্লাহর ইচ্চা সর্বোপরি কার্যকর, তবে তার এ কথাটি শিরক আসগর। তার বিশ্বাস সঠিক থাকলেও তার কথায় তার বিশ্বসের প্রতিফলন ঘটেনি। এক্ষেত্রে এরূপ বাক্যের সংশোধনী হলো 'আল্লাহ যা চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা' বা অনুরূপ বাক্য।

কাতীলা বিনতু সাইফী (রা) বলেন,

إِنَّ حِبْراً جَاء إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ، تَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُوْلُوْنَ: وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ: قُوْلُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ، وقُوْلُوْا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"একজন ইহূদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলেন, আপনারা তো শিরক করেন, কারণ আপনারা বলেন: 'আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও' এবং আপনারা বলেন: "কাবার কসম' । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বলবে: 'আল্লাহ যা চান, এরপর তুমি যা চাও', এবং বলবে: 'কাবার প্রতিপালকের কসম' ।"[৬৯৪]

হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ

"তোমরা বলবে না: 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে' বরং তোমরা বলবে: "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে ।"[৬৯৫]

তুফাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ (রা) বলেন,

إِنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ لَقِيَ رَهْطاً مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ: إِنَّكُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْمَسِيْحَ ابْنُ اللهِ. فَقَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ. قَالَ ثُمَّ لَقِيَ نَاساً مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ: إِنَّكُمُ الْقَــوْمُ لَــوْلاَ أَنَّكُــمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْعُزَيْرَ ابْنُ اللهِ. فَقَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَدَّثْتَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَحَداً؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ رَأَى مَا بَلَغَكُــمْ (وفــي رواية أحمد: وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِيْ الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، وفي رواية عــن حذيفــة: قَــدْ كُنْــتُ أَكْرَهُهَا مِنْكُمْ) فَلاَ تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُوْلُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"তিনি স্বপ্নে কতিপয় খৃস্টানকে দেখে তাদেরকে বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে 'মাসীহ আল্লাহর পুত্র' । তখন তারা বলে, 'তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান ।' এরপর তাঁর সাক্ষাত হয় একদল ইহূদীর সাথে । তিনি বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' । তখন তারা বলে, 'তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান ।' তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম । তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অন্যদেরকে জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ । তিনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন: তোমাদের ভাই (তুফাইল) যে স্বপ্ন দেখেছে তা তোমরা জেনেছ । তোমরা এরূপ কথা বলতে যা আমি অপছন্দ করতাম, শুধু লজ্জার কারণে তোমাদের নিষেধ করি নি । তোমরা বলবে না: 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান", বরং তোমরা বলবে: "আল্লাহ একাই যা চান, তার কোনো শরীক নেই ।"[৬৯৬]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لاَ تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

"তোমরা বলবে না: "যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) চান' বরং বলবে: 'যা আল্লাহ একাই চান' ।[৬৯৭]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلا!؟ (أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا) بَلْ مَــا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন: ''আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন ।" তখন তিনি তাকে বলেন: "তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে?! বরং আল্লাহর একার ইচ্ছাই চূড়ান্ত ।"[৬৯৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে 'আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসে 'একমাত্র আল্লাহ যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমরা জানি যে, সাহাবীগণ 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ (ﷺ) যা চান', অথবা 'আল্লাহ যা চান, অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান' বলতেন তাঁর জীবদ্দশায়, যখন জাগতিকভাবে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ত এবং তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন । বিশ্ব পরিচালনা বা অলৌকিক 'ইচ্ছা' একামাত্র মহান আল্লাহরই । আমরা ইতোপূর্বে অগণিত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি যে, কারো মঙ্গল, অমঙ্গল, বিপদ দান, বিপদ থেকে

উদ্ধার, হেদায়াত করা, ঈমান আনানো, ধ্বংস করা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ঝামেলা আল্লাহ প্রদান করেন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা দেখি যে, তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ তাঁর রাওযায় যেয়ে কখনোই বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ যা চান এবং এরপর আপনি যা চান, কাজেই আপনি আমাদের এ বিপদ বা অসুবিধা থেকে উদ্ধারের বিষয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। মূলত সকল কাজে তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এছাড়া মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মর্যাদা অতুলনীয়। তিনি কিছু ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ তা রক্ষা করতেন। যেমন তিনি কাবাঘরকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহ বোধ করছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ আগ্রহ পূরণ করেন এবং কাবাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করেন।[৬৯৯] কাজেই সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে- টাকা প্রদান, চাকুরী প্রদান, জমি দান, শাস্তি মওকুফ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বলা যায় 'হে আমীর বা হে নেতা, আল্লাহ যা চান এরপর আপনি যা চান', তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অনুরূপ বলায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এরূপ বলার অনুমতি তিনি সাহাবীগণকে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসেই 'একমাত্র আল্লাহ যা চান' বলতে শিখিয়েছেন তিনি।

এর কারণ, সম্ভবত, জাগতিক রাজা, বাদশাহ, আমীর, সওদাগর নেতা বা অনুরূপ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার পরে তার নামটি উল্লেখ করলে তাতে আনন্দিত হন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট চিরসমর্পিত। আল্লাহর ইচ্ছা তিনি ওহীর মাধ্যমে অবগত হতেন এবং সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এরূপ প্রশংসা তিনি অপছন্দ করতেন।

শিরক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে: আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি হতো না, ইত্যাদি।

এ সকল ক্ষেত্রে যদি বক্তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি কথার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শিরক্ আসগর বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। যেমন আল্লাহর ইচ্ছাতেই হলো আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা ... আল্লাহর জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান ...।

৫. ২. ৩. ২. ৪. 'গাইরুল্লাহ'র নামে শপথ করা

যাকে মানুষ অলৌকিকভাবে পবিত্র ও অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার নামে কখনো মিথ্যা বলতে সে সম্মত হয় না। কারণ সে জানে যে, এদের নাম নিয়ে মিথ্যা বললে এদের অলৌকিক আক্রোশ বা অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে এরূপ অলৌকিক পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করা। কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ যে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সত্তাকে উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। 'গাইরুল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শিরক আকবার। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, 'কাবা ঘরের কসম' বা কাবাঘরের নামে শপথ করাকে শিরক বলা হয়েছে এবং কাবা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে যদি কোনো মুমিন নও মুসলিম হওয়ার কারণে অভ্যাস অনুসারে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেলে তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো আলিম।

এ বিষয়ে আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন, "কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলি পবিত্র ও সম্মানিত। একারণে তারা বিশ্বাস করত যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না। আর একারণেই তারা মামলা বিবাদে প্রতিপক্ষকে এ সকল কাল্পনিক শরীক 'উপাস্যে'-র নামে শপথ করাতো। ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। ইবনু উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শির্ক করল।"[৭০০]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়, বরং এরূপ করা কঠিন অন্যায় (শিরক আসগার) বুঝাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন। আমি এরূপ ব্যাখ্যা করছি না। আমার মতে এর অর্থ এই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের মধ্যে 'পবিত্রতার' বা 'অলৌকিকতার' ও মঙ্গল-অমঙ্গলের 'আকীদা' পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা কসম করে তবে তা শির্ক বলে গণ্য হবে।"[৭০১]

৫. ২. ৩. ২. ৫. অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।[৭০২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلا خَيْرُكَ وَلا طَيْرَ إِلا طَيْرُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ

"অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শিরক করল। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফ্ফারা কী? তিনি বলেন, একথা বলবে যে, হে আল্লাহ, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার শুভাশুভত্ব ছাড়া কোনো শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"[৭০৩]

ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"আমাদের দলভুক্ত নয় (আমার উম্মাত নয়) যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য বা গাইবী কথা বলে বা অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোনো (সুতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিট দেয়। আর যদি কেউ কোনো গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ ভাগ্য বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ দ্বীনের সাথে কুফরী করল।"[৭০৪]

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোনো প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শিরক্ আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে।

৫. ২. ৩. ২. ৬. ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। মহান আল্লাহ ছাড়া কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহর ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা হয়। এজন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট গমন করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির কথাকে সত্য বলে মনে করলে তা শিরক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি। অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

"যদি কেউ কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরী করল।"[৭০৫]

অন্য হাদীসে সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"যদি কেউ কোনো গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।"[৭০৬]

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবিদারকে সত্যই 'গাইবী' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য। আর যদি বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শিরক আসগর।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ইলম দ্বারা চোর ধরা' বা অনুরূপভাবে কুরআন, বা দু'আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও 'কাহানাত' বলে গণ্য। কারো কিছু চুরি হলে তিনি চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু'আ-তদবীর করতে পারেন। কিন্তু কে চুরি করেছে

বা চুরি কৃত দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য জাগতিক উপকরণ ছাড়া 'গাইব' জানার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ নেই।

৫. ২. ৩. ২. ৭. রশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা

বিভিন্ন হাদীসে তাবিজ, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ দ্বারা যেমন ঝাড়ফুঁক বৈধ, তেমনি এরূপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে 'তাবিয' আকারে ব্যবহারও বৈধ। কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাবীজ ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীস শরীফে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনেককে ফুঁক দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রা) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে। তখন তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: "যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।"[৭০৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা) স্ত্রী যাইনাব (রা) বলেন,

ان عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ ... وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّرِيرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ مَا هَذَا الْخَيْطُ قَالَتْ قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

"ইবনু মাসঊদ (রা) যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসঊদ (রা) ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান। তিন বলেন, এ কিসের সুতা? আমি বললাম, এ ফুঁক দেওয়া সুতা। যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ এবং মিল-মহব্বতের তাবীজ শিরক।" যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসঊদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত। আমি অমুক ইহূদীর কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন: এ হলো শয়তানের কর্ম। শয়তান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোচাতে থাকে। এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলতেন তা বলবে। তিনি বলতেন: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না।"[৭০৮]

তাবিয়ী ঈসা ইবনু আবি লাইলা বলেন,

دخلنا على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

"আমরা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আবূ মা'বাদ জুহানীকে (রা) অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি কোনো তাবিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বলেন: আমি তাবিজ নেব? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি কেউ দেহে (তাবিজ জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।"[৭০৯]

তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন:

دَخَلَ حُذَيْفَةُ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ فَرَأَى فِيْ عَضُدِهِ سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَو انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ

مُشْرِكُوْنَ

"সাহাবী হুযাইফা (রা) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান। তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন[৭১০], অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে।"[৭১১]

৫. ২. ৩. ২. ৮. কাউকে 'শাহানশাহ' বলা

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলা যায় না এবং যে নাম ও গুণাবলি মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য তা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শিরক আকবার। আর কিছু নাম ও বিশেষণ রয়েছে যা জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। আমরা বিদ'আত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেখতে পাব।

মহান আল্লাহই এ বিশ্বের প্রকৃত মালিক, বাদশাহ ও প্রতিপালক। তবে জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষদেরকে রাজা বলার অনুমতি ও প্রচলন রয়েছে। কুরআন কারীমে এরূপ ব্যবহার রয়েছে। তবে জাগতিক অর্থেও কাউকে 'রাজাগণের রাজা', 'শাহানশাহ' ইত্যাদি গালভরা উপাধিতে আখ্যায়িত করতে হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ (ملك الملوك)- شَاهَانْ شَاهْ- لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وفي الرواية الثانية: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ لا مَلِكَ إِلا اللَّهُ

"মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো যে কোনো মানুষ নিজেকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাগণের রাজা' নামে আখ্যায়িত করবে, অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রাজা নেই। অন্য বর্ণনায়: কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে নিন্দিত হবে ঐ ব্যক্তি যাকে 'রাজাগণের রাজা' বা 'শাহানশাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনো রাজা নেই।"[৭১২]

৫. ২. ৩. ২. ৯. কাউকে রাব্ব বা আব্দ বলা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'অমুকের পালনকর্তা', মালিক বা মনিব অর্থে 'অমুকের 'রাব্ব' বলা যায়। অনুরূপভাবে জাগতিক দাসত্ব অর্থে একজনকে অন্যের 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দা, দাস বা চাকর বলা যায়। তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার না করতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে শব্দের মধ্যে শিরক হয়ে যায়, যদিও বিশ্বাসে শিরক না থাকে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلايَ وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي-كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ- وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي.

"তোমাদের কেউ (মালিককে 'রাব্ব' বলবে না), বলবে না: তোমার রাব্বকে খাবার দেও, তোমার রাব্বকে ওযূ করাও, তোমার রাব্বকে পানি পান করাও। বরং সে যেন (মালিককে) সাইয়েদী অর্থাৎ আমার নেতা, মাওলাইয়া অর্থাৎ আমার অভিভাবক বলে। আর তোমাদের কেউ (নিজের দাস বা চাকরকে) 'আমার বান্দা' বা আমার বান্দি বলবে না, কারণ তোমরা সকলেই তো আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই তো আল্লাহর বান্দি। বরং বলবে: আমার যুবক বা ছেলে, আমার যুবতী বা মেয়ে বা আমার বালক।"[৭১৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মালিককে রাব্ব বলা এবং দাস বা চাকরকে 'বান্দা' বলা মূলত বৈধ হলেও শব্দের শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও অনেক আদব ও শিরকের বিষয় রয়েছে, যা শিরক আকবার না হলেও শিরক আসগর বলে গণ্য হতে পারে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরক থেকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বদা শিরক থেকে তাওবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُ

"হে মানুষেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর; কারণ শিরক পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর। তখন একব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে; হে আল্লাহ, আমরা জেনেশুনে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জানি তা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[৭১৪]

৫. ৩. শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, তাওহীদের দাও'আতই সকল নবী-রাসূল (আ)-এর মূল দাও'আত। বস্তুত শিরকই মানব

সমাজের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাত করে দেয়। এজন্য শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে। নবী-রাসূলগণের দাও'আতের মাধ্যমে যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে এবং বিশেষকরে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে তাদেরই নামে শিরকে লিপ্ত করেছে শয়তান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহূদী, খৃস্টান এবং আরবের মুশরিকগণ। এরা সকলেই নবী-রাসূলগণের হেদায়েত প্রাপ্ত মানুষদের উত্তরসূরী ও অনুসারী। যুগের পর যুগ এরা বংশ পরম্পরায় নবী-রাসূলগণের হেদায়াত বহন করেছেন এবং তাদের দীন পালন করেছেন। কিন্তু এরই মাঝে শয়তান এদের মধ্যে শিরক্-এর প্রচলন করতে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহর সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনীন শরীয়ত ও দাওয়াত হিসেবে ইসলামে শিরক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো মূল ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং একে সর্বজনীন করা। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মাতদের মধ্যে শিরক প্রবেশের মূল কারণগুলির অন্যতম ছিল (১) ওহী ভুলে যাওয়া বা ওহীর বিকৃতি ঘটা এবং (২) ওহীর পরিবর্তের মানুষদের মতামত, ব্যাখ্যা ও পছন্দকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

এ সকল মানুষ ওহীর ব্যাখ্যা ও দীনের নামে বিভিন্ন শিরক, কুফর ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলিকেই মূল তাওহীদ ও দীন বলে দাবি করে। মূল ওহী বিকৃত, বিলুপ্ত বা আংশিক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এদের মতের অসারতা প্রমাণের পথ থাকে না। ফলে এদের মতামতই দীন বলে পরিগণিত হয়। মুসলিম উম্মার মধ্যে শিরকে প্রচলন বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রচলনের জন্য শয়তান ও তার শিষ্যরা একইভাবে চেষ্টা করেছে। তবে মূল ওহী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণে তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি যে, তাওহীদের প্রচার ও শিরক অপনোদনই কুরআন-হাদীসের মূল আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও শিরকই কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসে শিরক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে (১) মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মগুলি উল্লেখ করা, যেন মুমিনরা কখনো সেগুলিতে লিপ্ত না হয়, (২) শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা, যেন মুমিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, (৩) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা, (৪) শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা এবং (৫) শিরকের পথগুলি বন্ধ করা। আমরা এখানে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

৫. ৩. ১. মুশরিকগণের পরিচিতি

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুশরিকগণের একটি সুন্দর শ্রেণীভাগ করেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে তিনি মুশরিকদেরকে তিন শ্রেণীতে এবং 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে মুশরিকদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ:

৫. ৩. ১. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ

এরা দাবি করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। এদের ইবাদত করলে পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায়। মানুষের প্রয়োজন বা হাজত এদের কাছে পেশ করা সঠিক। তারা বলে, আমরা গবেষণা করে উদ্ঘাটন করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ব্যক্তির সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা যাত্রা ও চলাচল করে। এরা এদের পূজারীদের বিষয়ে অচেতন নয়। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরি করেছে এবং তাদের ইবাদত করে।

৫. ৩. ১. ২. মুশরিকগণ

এরা মুসলিমদের সাথে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অধিকাংশ বিষয়ে একমত। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। এছাড়া যে বিষয়গুলি তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য কাউকে কোনো এখাতিয়ার বা ক্ষমতা প্রদান করেন নি সে সকল বিষয়ও তিনি পরিচালনা করেন। অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত নয়। তারা দাবি করে যে, তাদের পূর্ববর্তী নেককার বুজুর্গগণ আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে 'উলূহিয়্যাত' বা 'উপস্যত্ব' প্রদান করেন। এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের 'ইবাদত' লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যেমনভাবে রাজাধিরাজ মহারাজের খাদিম বা সেবক তার সেবা ও ভক্তি করে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন মহারাজ সেই খাদিমকেও রাজত্ব উপঢৌকন প্রদান করেন বা তাকে একটি বিশেষ এলাকার 'সামন্ত' রাজা বানিয়ে দেন। তখন সে রাজত্বের পরিচালনার দায়ভার এ সামন্ত রাজার উপরেই বর্তায়। আর উক্ত রাজ্যের প্রজাদের দায়িত্ব হয়ে যায় এ রাজার আনুগত্য করা।

তারা বলে, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি ঊর্ধ্বে। তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তাঁর ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন। তারা বলে, এ সকল বুজুর্গ শুনেন, দেখেন, তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

এ সকল দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে তারা এসকল বুজুর্গের নাম পাথরে খোদাই করে রাখে এবং তাদের নাম বিজড়িত পাথর সামনে রেখে তাদের ইবাদত করে। প্রথম যুগের মুশরিকদের তিরোধানের পরে পরবর্তী প্রজন্মের মুশরিকগণ মূল বুজুর্গ উপাস্য ও তাদের স্মৃতিতে বানানো মুর্তি বা স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা মনে করে এ সকল মুর্তি বা স্তম্ভই বুঝি উপাস্য। এজন্য মহান আল্লাহ এ সকল মুশরিকদের দাবি দাওয়া রদ করে কখনো বলেছেন যে, বিশ্ব পরিচালনা, রাজত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র তারই। কখনো তিনি বলেছেন যে, তারা যাদের ইবাদত করে তারা জড় পদার্থ মাত্র।

৫. ৩. ১. ৩. খৃস্টানগণ

খৃস্টানগণ দাবি করে যে, ঈসা মাসীহ (আ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। কাজেই তাকে 'আব্দ' অর্থাৎ দাস বা 'বান্দা' বলা উচিত নয়। কারণ তাকে 'আব্দ' বা 'বান্দা' বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান বানিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করা তাঁর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী। সর্বোপরি এতে আল্লাহর সাথে তার যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়।

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাকে 'আল্লাহর পুত্র' বলতে পছন্দ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন। আর সাধারণ দাস বা চাকরদের চেয়ে পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়। এজন্য 'পুত্র' পদটিই তাঁর মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাকে 'আল্লাহ' বলতে শুরু করেন। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে অবস্থান করছেন। আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম হন। কাজেই তাঁর কথাই আল্লাহর কথা এবং তাঁকে ইবাদত করা অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা।

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহর পুত্র' বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে। ফলে তারা 'আল্লাহর পুত্রত্ব' বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে। কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি প্রকৃতই 'আল্লাহ'। এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তাঁর কোনো স্ত্রী নেই, কখনো বলেছেন যে, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এ তিন দলেরই মতামত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর রয়েছে। কুরআন কারীমের শেষের দু দলের শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দালিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।"[৭১৫]

অতঃপর তিনি বলেন: "শিরক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ভুলে গিয়েছে। সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত করে এবং কেবলমাত্র তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে। আল্লাহর কাছে সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না। যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে এই মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা আল্লাহই। মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক। কিন্তু তিনি তাঁর 'উলূহিয়্যাত'-এর কিছু মর্যাদা তার কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করেন। তাদেরকে তিনি কিছু বিশেষ বিষয়ে পরিচালনার বা কার্যনির্বাহের দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন মহারাজ বা রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে 'সামন্ত' রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বৃহৎ বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ সকল বিষয় পরিচালনা ও কার্য নির্বাহ করার দায়িত্ব এ সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয়। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ সকল বিশেষ বান্দাদেরকে 'আল্লাহর বান্দা', 'আল্লাহর দাস' বা আল্লাহর আবদ' বলতে দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে 'এ সকল খাস বান্দাকে অন্য সব 'আম' বান্দার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য সে এরূপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে 'আল্লাহর পুত্র' বা 'আল্লাহর মাহবূব' (আল্লাহর প্রিয়) বলে। আর নিজেকে সে এরূপ 'খাস বান্দাদের' বান্দা বলে নামকরণ করে। যেমন 'আব্দুল মাসীহ', আব্দুল উয্যা, ইত্যাদি। ইহূদী, খৃস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের অনুসারী সীমালঙ্ঘনকারী মুনাফিকদের অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত।"[৭১৬]

৫. ৩. ১. ৪. কবর পূজারিগণ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন: "মুশরিকগণের চতুর্থ দলটি হইল কবর পূজারীদের দল। তাহাদের দাবী হইল যখন আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা ইবাদত বন্দেগী সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোআ কবুল হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির ইনতিকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে। সুতরাং যে লোক এমন বুযুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাহাদের থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, নম্রতার এবং ভক্তি সহকারে সিজদাহ করে, তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া যায়; দুনিয়া ও পরকালের তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার জন্য সুপারিশকারী হয়। উল্লেখিত শিরক ও বিদআতীদের বাতিল মতবাদ প্রচার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন...।

... ইহা আমাদের ভালভাবে বুঝা উচিত যে, উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে ইবাদত বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করা হয় ঐ সব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাহারা বলিবে আমরা এই সম্বন্ধে অবগত নহি। পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াত করা তো দূরের কথা, তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতি দিবে না।"[৭১৭]

৫. ৩. ২. শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ

কোন্ কোন্ বিশ্বাস বা কর্ম করে অন্যান্য জাতির মানুষেরা মুশরিকে পরিণত হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা

করা হয়েছে, যেন কোনো মুমিন কোনোভাবে এরূপ কর্মের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত না হয়। আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী জাতিগণের শিরক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবাদতে। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল কম। আমরা এখানে বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৫. ৩. ২. ১. প্রতিপালনের শিরক

শিরক ফির রুবূবিয়্যাহ বা প্রতিপালনের শিরক ছিল আরবের মুশরিকদের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন। সাধারণভাবে তারা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একত্ব একবাক্যে স্বীকার করত। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু বান্দার প্রতি খুশি হয়ে তাদেরকে বিশ্বের পরিচালনা বা নিষ্ট-অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজাতীয় আরো কয়েক প্রকার শিরক তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

৫. ৩. ২. ১. ১. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আখিরাতে বিশ্বাস করত না। তাদের বিশ্বাস অনেকটা এরূপ ছিল যে, মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন, মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায়। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভ্রান্তি আলোচনা ও অপনোদন করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ

"তারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে।"[৭১৮]

আমরা আগেই বলেছি যে, এরূপ কুফরী বা অবিশ্বাসও শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা যুগের আবর্তনকেই 'রাব্ব' বা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করছে।

৫. ৩. ২. ১. ২. আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে 'আল্লাহর বিশেষ বান্দা' বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহ পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকগণ বিভিন্ন যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে 'আল্লাহর সন্তান', 'আল্লাহর পুত্র', 'আল্লাহর কন্যা', 'আল্লাহর বংশধর' বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করত। যেমন মুশরিকগণ মালাইকা বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত। এছাড়া কোনো কোনো ইহূদী 'উযাইর' (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। আর খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। সাধারণত পুত্রত্ব বা সন্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। এগুলি সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শিরকী বিশ্বাস। কুরআন কারীমে বারংবার এগুলির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এরূপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৫. ৩. ২. ১. ৩. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক

মুশরিকদের শিরকের অন্যতম একটি প্রকাশ ছিল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো 'ইলমুল গাইব' অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের অন্যতম দিক তাঁর অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তাঁর অন্যতম সিফাত হলো 'আলিমুল গাইব' বা 'অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী' এবং 'আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ' বা 'দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী'। কুরআন কারীমে একথা বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহর মত গাইবী ইলম কারো নেই, বরং বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে গাইবের জ্ঞান তার নবী-রাসূলদের প্রদান করেন। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলসহ সমগ্র সৃষ্টিকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

বান্দার জ্ঞান উপকরণের অধীন। জাগতিক বা আত্মীক উপকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য জাগতিক উপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান। আর ওহী, ইলহাম ইত্যাদি মহান আল্লাহ দয়া ও পছন্দ করে কোনো বান্দাকে দিতে পারেন। এগুলি একান্তই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, বান্দার ইচ্ছাধীন নয়।

ইলমুল গাইবে শিরক করার বিভিন্ন দিক রয়েছে:

(১) আল্লাহ ছাড়া কারো উপকরন ছাড়া কোনো বিশেষ বা সকল গাইবেরর জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

(২) ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে কোনো গাইব বা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অদৃশ্য কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর ও জিন্নদের বিষয়ে আরবের মুশরিকগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত।

(৩) আল্লাহর সকল ইলমু গাইব তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে জানিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা। এতে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা অস্বীকার করা হয়। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টির সকল জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময়, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় মরবে ইত্যাদি কিছু বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এজন্য কাউকে আল্লাহ এরূপ সকল ও সামগ্রিক গাইব

জানিয়েছেন বলে দাবি করাও কুরআনের নির্দেশনা অস্বীকার করা বলে গণ্য। খৃস্টানগণ ঈসার (আ) বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, ঈসা মাসীহ (আ) মহান আল্লাহর মতই সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি মহান আল্লাহর যাতেরই অংশ। প্রচলিত ও বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও যীশুর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না। কিন্তু খৃস্টানগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ সকল আয়াত বাতিল করে দেয়। প্রচলিত বাইবেলের মথির সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতে কিয়ামতের বিষয়ে যীশু বলেছেন: "কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও (ফিরিশতাগণ) জানেন না, পুত্রও (যীশু স্বয়ং) জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের জন্য এ কথাটি কঠিন চপটাঘাত। তারা জালিয়াতির মাধ্যমে বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে কথাটি গোপন করতে বা বাতিল করতে চেষ্টা করেছে। জালিয়াতির একটি নমুনা এই যে, তারা 'পুত্রও জানেন না' কথাটুকু বাইবেল থেকে মুছে দেয়। বর্তমানে 'অথোরাইয্ড ভার্সন' নামে প্রচলিত কিং জেমস ভার্সন-এ উপরের আয়াতটির নিম্নরূপ: "But of that day and hour knoweth no man ,no, not the angels of heaven, but my Father only." এখানে পাঠক দেখছেন যে, 'পুত্রও জানেন না (neither the Son) কথাটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই প্রায় হাজার বৎসর যাবত এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আলোকে জালিয়াতি ধরা পড়ার কারণে আধুনিক সংস্করণগুলিতে কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলের মধ্যে আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, ঈসা মাসীহ কখনোই ওহীর অতিরিক্ত কোনো গাইবের কথা জানতেন না বা জানার দাবি করেন নি। তবে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটি এবং এ জাতীয় সকল আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ বাতিল করে দেয় এবং যীশুর জন্য সামগ্রিক ইলমুল গাইব দাবি করে।

৫. ৩. ২. ২. ইবাদতের শিরক

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্তুত মানুষের মুর্খতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে 'মূর্ত', 'দৃশ্যমান' বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিত্ততা এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিত্ততা ও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররেচিত করে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 'দৃশ্যমান', বা 'হাতের নাগালে পাওয়া যায়' এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। বান্দা ভাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায়।

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে স্রষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এভাবেই ইবাদতের শিরক যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি জেনেছি। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য পালন করত। কুরআন ও হাদীসে এগুলি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে এ সকল ইবাদতের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৩. ২. ২. ১. গাইরুল্লাহর সাজদা

সাজদা করা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসেবেই শুধু সাজদা করা হয়। চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা, ইত্যাদি সকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"[৭১৯]

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাজদা, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্যও 'দু'আ' বা 'ডাকা'। যাকে ডাকা হচ্ছে বা যার কাছে অলৌকিক প্রর্থনা করা হচ্ছে তিনি যেন খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন সেজন্যই সাজদা। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"এবং এই যে, সাজদা করার কর্মসগুলি বা সাজদার স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[৭২০]

৫. ৩. ২. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত

উৎসর্গ করা (sacrifice) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবাণী দেওয়া, বলি দেওয়া বা জবাই করা বলি। খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদী উৎসর্গ করা হলে সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় মান্নত, সদকা ইত্যাদি বলা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে বা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে খুশী করার জন্য, তাদের বর, আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়ার জন্য বা তাদের প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশের জন্য জীব জানোয়ার, ফল-ফসল, ফুল-ফল খাদ্য ইত্যাদী

উৎসর্গ করেছেন, বলি দিয়েছেন বা ভেট দিয়েছেন এবং এখনো দেন। উৎসর্গ কখনোও সাধারণভাবে করা হয়, কোন রকম শর্ত (precondition) ছাড়াই একজন ভক্ত তার ভক্তির প্রকাশ হিসাবে উৎসর্গ দান করেন। কখনো বা তা মানত হিসাবে পেশ করা হয়, অর্থাৎ একজন ভক্ত উপাসক সিদ্ধান্ত নেন যে তার নির্দিষ্টমনোবাসনাপূর্ণ হলে তিনি তার উপাস্যর জন্য কিছু উৎসর্গ করবেন।

সর্ব যুগের মুশরিকদের মত আরবের মুশরিকরাও জীব জানোয়ার, ফসল খাদ্য ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতো এবং তাদের অন্য সকল উপাস্যের জন্যও উৎসর্গ করত। এ শিরকের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের অন্যান্য উপাস্যের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পেঁছে; তারা যা মিমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।"[৭২১]

উৎসর্গ বিষয়ক শিরকের বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

"আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।"[৭২২]

কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক,তার কোন শরীক নেই। এজন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করছি।"[৭২৩]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সম্বোধন করে বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং জবাই-কুরবানী কর।"[৭২৪]

এ জাতীয় শিরক আ্যালোচনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন: মুশরিকগণ মুর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ-নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্য লাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত। এজন্য তারা জবাইদের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নিয়ে পশু জবাই করত। কুরআনে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন[৭২৫]:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

"বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়সীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেন নি; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।"[৭২৬]

৫. ৩. ২. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা ত্রাণ প্রার্থনা

দু'আ (**الدعاء**) অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। ডাকা বা আহ্বান করা এবং প্রার্থনা করা পরস্পর জড়িত। কারো কাছে প্রার্থন করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

দু'আ বা প্রার্থনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু'আকে অনেক সময় 'ইসতি'আনাহ (**الاستعانة**) অর্থাৎ 'আওন' বা সাহায্য প্রার্থনা, 'ইসতিম্দাদ' (**الاستمداد**), অর্থাৎ 'মদদ' বা সাহায্য প্রার্থনা, 'ইসতিগাসাহ' (**الاستغاثة**) অর্থাৎ 'গাউস' বা ত্রাণ বা উদ্ধার প্রার্থনা ইত্যাদি বলা হয়। সবকিছুরই মূল 'দু'আ'।

প্রার্থনা করা বা ডাকার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য

সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক বা অপার্থিব। জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো "ধর্মের অনুসারী" বা "বিশ্বাসী" করেন। "বিশ্বাসী" কেবলমাত্র 'আল্লাহ', 'ঈশ্বর' বা সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে 'ইশ্বরের' বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা আছে, তার কাছেই এরূপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন।

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনা বা ডাকাই ইবাদত-এর সার্বজনীন প্রকাশ। সকল যুগে সকল ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে অপার্থিব ও অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। এভাবে আমরা দেখছি যে দু'আই হলো ইবাদত-এর সর্বজনীন ও সর্বপ্রধান প্রকাশ।

নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী ﷺ বলেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত।" একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন[৭২৭]:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৭২৮]

দু'আ, কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন: "মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত। অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট প্রার্থনা করত। এ সকল উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত। তারা আশা করত যে, এ সকল মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম পাঠ করত। একারণে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে বলবে:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমরই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৭২৯]

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেক না।"[৭৩০]

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে 'ডাকা' অর্থ 'ইবাদত' করা। তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। স্পষ্টতই 'ডাকা' অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন[৭৩১]:

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

"(বল, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে, অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও?) বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে।"[৭৩২]

যেহেতু দু'আই ইবাদতের মূল প্রকাশ এবং এক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি শিরকে লিপ্ত হয় মানুষ, সেহেতু কুরআনে এই ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে বা একমাত্র তাঁরই কাছে দু'আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কোথাও মুশরিকরা যে তাদের উপাস্যদের ডাকত বা তাদের কাছে দুআ করার মাধ্যমে শিরক করত তা বারংবার বলা হয়েছে। কুরআনে দু-শতাধিক স্থানে এ ব্যপারে বলা হয়েছে।

একটি উদাহরণ থেকে আমরা লৌকিক ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকা এবং শিরকী ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করি। মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে। আমি সামনে কোনো মানুষ দেখে বা কোনো মানুষ থাকতে পারে মনে করে চিৎকার করে বললাম, ভাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিৎকার করে বলছি, ভাই অমুক স্থানে কোন দিক দিয়ে যাব একটু বলবেন!

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। ঐ মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না। ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনবে বলে আশা করা যায়। এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

যদি কোথাও এই প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য ফিরিশতাগণের নিকটও সাহায্য চাওয়া যেতে পারে বলে একটি দুর্বল সনদের হাদীস থেকে জানা যায়। মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া অদৃশ্য সৃষ্টি জীনেরাও বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে। উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা জ্বিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয হবে। কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা করছেন না। তথায় কোন্ ফিরিশতা আছেন বা কোন্ জ্বিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা তার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জ্বিন থাকতে পারেন। আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয়। ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন :

إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُوْنَ مَا سَقَطَ مِنْ وَّرَقِ الشَّجَرِ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَلْيُنَـــادِ أَعِيْنُوا عِبَادَ اللهِ يَرْحَمُكُمُ اللهُ تَعَالَى

"বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় কোন গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন। যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে ডেকে বলবে: হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন।"[৭৩৩]

এ প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক হবে। যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাঁদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম যে, সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিৎকার করে সাহায্য চাইবে: কে আছ একটু সাহায্য কর। এখানে সে লৌকিক সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে ডাকতে থাকে তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে। কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার মতো "অলৌকিক" ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকেকত্ব, ঐশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে। এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে।

এ প্রার্থনাকারী বা আহ্বানকারী ঐ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ প্রাথনাকারী এই গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এই ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর শরীক আছে। এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে। তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি বা দ্রুত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে। এক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবি যে, এ সকল খাজা বাবা, সাঁই বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বিনদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। ক্ষমতা মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন। শিরকের হাকীকাত বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ)-এর বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি।

৫. ৩. ২. ২. ৪. গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল অর্থ নির্ভরতা (to rely, depend, trust)। সাধারণভাবে বাংলায় নির্ভরতা বলতে আমরা যা বুঝি তা লৌকিক ও অলৌকিক দু প্রকারেরই হতে পারে। জাগতিকভাবে একজন মানুষ অন্যের শক্তি, ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ভরকারী ব্যক্তি নির্ভরকৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা অপার্থিবত্ব কল্পনা করে না, বরং স্বাভাবিক মানবীয় আস্থা বা নির্ভরতা প্রকাশ করে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ নির্ভরতা প্রকাশ করে।

অলৌকিক নির্ভরতা কোনো অবিশ্বাসী বা নাস্তিক মানুষ করেন না। কেবলমাত্র বিশ্বাসী মানুষ যে ব্যক্তি বা সত্তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বা জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অপার্থিব বা অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ করার বা তা রোধ করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তার অলৌকিক সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করে। মনের এরূপ প্রগাঢ় নির্ভরতাকেই ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বলা হয়।

মানুষ যার বা যাদের উপাসনা করে, অন্তরের গভীরে তার বা তাদের অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের আশা করে এবং এই সাহায্যের উপর তার নির্ভরতা থাকে। সে তার উপস্যের নাম নিয়ে বা তার উপাস্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার কর্ম শুরু করে।

এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদত। কেউ যদি কারো নাম নিয়ে বা কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন্তরের আস্থা বা নির্ভরতা নিয়ে কর্ম শুরু করেন, তাহলে তিনি তার উপাসক হিসাবে গণ্য হবেন। এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা, কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, কারো নামে পাড়ি জমানো... ইত্যাদি শিরক। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বা তাওয়াক্কুল করতে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"আর মুমিনগণ একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক।"[৭৩৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا

"এবং আপনি আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন, উকিল বা কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৭৩৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

"তোমরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হও তবে শুধু তারই উপরে নির্ভর কর।"[৭৩৬]

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

"বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, আমি একমাত্র তার উপরেই নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।"[৭৩৭]

৫. ৩. ২. ২. ৫. ভয় ও আশার শিরক

তাওয়াক্কুল-এর সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত আশা ও ভয়। তাওয়াক্কুলের ন্যায় ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা দুই প্রকারের: প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক ও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক। সাধারণ প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার সৃষ্টি হয় দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও বৈষয়িক কারণে। আমরা হিংস্র বা বিষাক্ত জীব, ধারাল অস্ত্র, জালিম মানুষ ইত্যাদি দেখলে ভয় পাই। পার্থিব জীবনে একে অপরের বিভিন্ন ধরণের উপকারর আশা করি। এ ধরণের পার্থিব ও বৈষযিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা মানুষ ও মানবেতর জীব জানোয়ারের মধ্যে বিরাজমান এবং তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। এরূপ ভয় বা আশা কোনো 'বিশ্বাসের' সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং 'মানবীয় প্রকৃতির' সাথে সম্পৃক্ত। নাস্তিক, আস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ ভয় ও আশা করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তিকে 'চূড়ান্ত বা অলৌকিকভাবে ভক্তি করে' অর্থাৎ ইবাদত করে, স্বাভাবিক মানবীয় বা প্রাকৃতিক শক্তির উর্ধ্বে তাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেই জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ, উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, তখন ঐ মানুষের মনে ঐ ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তির প্রতি ভয় ও আশার সঞ্চার হয়। এরূপ ভয় বা আশার ভিত্তি 'বিশ্বাস'। যে যাকে অলৌকিক শক্তিময় বলে বিশ্বাস করেন তাকেই এরূপ ভয় করেন বা তার অলৌকিক সাহায্যের আশা করেন। এজন্যই একজন মানুষ একটি মাটির ঢিলার মতই বিনা দ্বিধায় একটি মুর্তি, কবর বা উপাসনালয় একজন ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, পক্ষান্তরে অন্য একজন মানুষ উক্ত মুর্তি, কবর বা উপাসনালয়ে প্রতি সামান্যতম অভক্তির কথা কল্পনা করতেও ভয় পান।

এই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা ইবাদত বলে গণ্য, যা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত নির্ধানিত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

এবং তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর।"[৭৩৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।"[৭৩৯]

কোনো মানুষ যদি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এরূপ ভয় করে বা অন্য কারো মধ্যে কোনোরূপ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা, মঙ্গল-অমঙ্গল করা বা তা রোধ করার অলৌকিক ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অথিকারী মনে করে কাউকে ভয় করে তবে তবে তা শিরক হবে। কিন্তু জাগতিক বা পার্থিব ভয় করলে তা শিরক হবে না। আল্লাহ বলেন:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

"তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি মানুষদেরকে ভয় করছ, অথচ আল্লাকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।"[৭৪০]

কেউই কল্পনা করবেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ভয় করে শিরকে লিপ্ত হয়েছিলেন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক।"[৭৪১]

এখানে কেউই বলবেন না যে, সাহাবীগণ মানুষদেরকে আল্লাহর মত বা তার চেয়েও বেশি ভয় করে শিরকে নিপতিত হয়েছিলেন। কারণ, তাদের ভয় ছিল মানবীয়, মানুষদেরকে তারা আল্লাহর মত ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ভয় পান নি।

মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে ভয় পায়। এতে শিরক হয় না। এমনকি মানুষের ভয়ে বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করাকেও কেউ শিরক বলবেন না। সর্বোপরি মানুষের ভয়ে জীবন বাঁচাতে সুস্পষ্ট শিরক করলেও তাকে শিরক বলে গণ্য করা হবে না। জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া ইচ্ছা করলেই অলৌকিকভাবে অমঙ্গল করার ক্ষমতা আছে বলে কাউকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয় করা ইবাদত।

৫. ৩. ২. ২. ৬. ভালবাসার শিরক

তাওয়াক্কুল, ভয় ও আশার মতই একটি ইবাদত 'ভালবাসা' (**الحب والمحبة**)। ভালবাসার ক্ষেত্রেও উপরের জাগতিক ও ঈমানী দুটি পর্যায় আছে। জাগতিক ভালবাসা ইবাদত নয়, তবে জাগতিক ভালবাসা যদি আল্লাহর বিধান পালনের বিপরীতে দাঁড়ায় তবে তা পাপ। পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, উপকারী মানুষ ও অন্যান্য বিভিন্ন মানুষকে মানুষ জাগতিকভাবে ভালবাসে। এরূপ ভালবাসার উৎস জাগতিক সম্পর্ক, মেলামেশা, দেখাশুনা ইত্যাদি।

ঈমানী ভালবাসার তিনটি দিক রয়েছে: (১) আল্লাহকে ভালবাসা (**حب الله**), (২) আল্লাহর জন্য ভালবাসা (**الحب لله**) এবং (৩) আল্লাহর সাথে ভালবাসা (**الحب مع الله**)। আল্লাকে ভালবাসা হয় কেবলমাত্র তাঁরই জন্য আর কারো জন্য নয়। আর এ ভালবাসার সাথে থাকে গভীর অলৌকিক ভয়, আশা ও অসহায়ত্বের ও ভক্তির প্রকাশ। এরূপ ভালবাসাই ইবাদত। আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হয় যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর সাথে ভালবাসা হলো শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর জন্য নয়, বরং তার নিজের কারণে ভালবাসা বা অলৌকিক ভক্তি, ভয় ও অসহায়ত্বের সাথে ভালবাসা শিরক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।"[৭৪২]

মুশরিকগণ দাবি করত যে, তারা তাদের উপাস্যদেরকে ভালবাসত 'আল্লাহর প্রিয়' হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে এ সকল উপাস্যের প্রেমই ছিল মূল। এদের মর্যাদায়, প্রশংসায় কিছু বললে তারা খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে তারা বিরক্ত হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।"[৭৪৩]

৫. ৩. ২. ২. ৭. আনুগত্যের শিরক

আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একটি বিশেষ দিক তাঁর 'হাকামিয়্যাত' বা হুকুম, বিধান বা ফয়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা। আল্লাহর মহান নামগুলির অন্যতম 'আল-হাকাম' অর্থাৎ বিচারক বা বিধানদাতা। যিনি প্রতিপালক তাঁরই অধিকার তার প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য বিধান প্রদান করার। মানুষ যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাব্ব বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক ইত্যাদি হতে পারে। মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দেশের আওতায় বা যেখানে তিনি মানুষের অধিকার দিয়েছে সেখানে মানুষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর। একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী

প্রতিপালক হিসেবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্ন্তজাতিক সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের অংশ। আর তাঁর উলূহিয়্যাতের দাবি যে, বান্দা তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবে। এজন্য আনুগত্য ইবাদতের অন্যতম প্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا

বল, 'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে হুকুমদাতা মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।"[৭৪৪]

অন্যত্র তিনি বলেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহিলীযুগের বিধিবিধান কামনা করে? দৃঢ়প্রত্যয়ী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কে?"[৭৪৫]

আল্লাহর বিধানবালি তাঁর রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তিনি যে বিধান প্রদান করেন তাই আল্লাহর বিধান। কাজেই তাঁর সকল বিধান সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই ঈমান। আল্লাহ বলেন:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পন না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।"[৭৪৬]

তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও ভালবাসার ন্যায় আনুগত্যেরও লৌকিক ও অলৌকিক দুটি পর্যায় রয়েছে। 'অলৌকিক বিশ্বাসজাত আনুগত্য' একমাত্র মহান আল্লাহরই নিমিত্ত। অন্য কাউকে এরূপ আনুগত্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন;

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই ভক্ষণ করো না। তা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমর তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।"[৭৪৭]

এখানে কাফিরদের আনুগত্য করাকে শিরক্ বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!"[৭৪৮]

ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিভিন্নভাবে তারা আলিম ও দরবেশদেরকে 'রাব্ব' হিসেবে গ্রহণ করেছে:

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আলিম, দরবেশ, সাধু বা সেন্টগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষত মৃত্যুর পরে তারা অলৌকিক কল্যাণ, অকল্যাণ ও বিশ্ব পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন। এজন্য তারা এ সকল সেন্ট, সান্তা বা সাধুদের মুর্তি তৈরি করত, তথায় মানত, নযর বা ভেট প্রদান করত, তাদের কবরের নিকট ইবাদতগাহ তৈরি করত এবং তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে 'বরকত' লাভের জন্য সচেষ্ট থাকত। তাদের ধর্মীয় ইতিহাস এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে বিষয়গুলি জানা যায়।

(২) তারা পোপ-পাদরিগ ও সাধুদের 'ইসমাত' বা অভ্রান্ততায় (infallibility) বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত ও করে যে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তারা কাশফ, ইলহাম ও ইলমু লাদুন্নী লাভ করেন। সেগুলির আলোকে তারা ধর্মের যে বিধান প্রদান করেন তাই চূড়ান্ত। তাদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না। সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন বা ধর্মীয় বিধান জানা সম্ভব নয়। 'বাইবেলে' কি আছে বা নেই তা বড় কথা নয়। পোপ বা ধর্মগুরুগণ কি ব্যাখ্যা বা নির্দেশ দিলেন তাই বড় কথা। এ সকল পোপ-পাদরি কখনোই সরাসরি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করত না। সাধারণত তারা 'ইল্লাত' ও 'হিকমাত' বা কারণ ও দর্শন দেখিয়ে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত ও করে। এ বিষয়টি অমুক কারণে ফরয বা হারাম করা হয়েছে, কাজেই অমুক বা তমুক

কারণে তা তোমার জন্য বা সকলের জন্য এখন হালাল বা হারাম। সাধারণ অনুসারীরা তাদের এরূপ বিধানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিত।

এভাবে তারা রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালনের বিষয়ে আলিম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর শরীক বানাতো। আর প্রতিপালনের শিরক আবশ্যম্ভাবীভাবে ইবাদতের শিরকে নিপতিত করে। তাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাসের কারণে তারা তাদেরকে ডাকত ও তাদের জন্য মানত উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত। অনুরূপভাবে তাদের 'ইসমাত' ও হাকামিয়্যাতের বিশ্বাসের কারণে তারা তাদের চূড়ান্ত ও নিঃশর্ত আনুগত্য করত। কুরআনের বক্তব্য থেকে তাদের এ দু প্রকারের শিরকই সুস্পষ্ট। আয়াতের প্রথমে তাদের রুবূবিয়্যাতের শিরকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে ইবাদতের শিরকের কথা বলা হয়েছে। একটি যয়ীফ সনদের হাদীস থেকে তাদের এ শিরকের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

গুতাইফ ইবনু আ'ইউন (**غطيف بـــن أعـــين**) নামক দ্বিতীয় শতকের একজন অজ্ঞাত-পরিচয় তাবি-তাবিয়ী বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুসআব ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (১০৩ হি) তাকে বলেছেন, সাহাবী আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন,

سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ أَمَا إِنَّهُـمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

"আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা তাওবায় পাঠ করছেন: 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে'। তিনি বললেন, ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।"[৭৪৯]

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে গুতাইফের সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَـــهُ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না! তিনি বলেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ কর না? আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এ-ই হলো তাদের ইবাদত করা।"[৭৫০]

হুযাইফা (রা), ইবনু আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন যে, ইহূদী খৃস্টানদের পণ্ডিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত। আর এই আনুগত্যই ছিল তাদের 'রব্ব' মানা।[৭৫১]

এখানে লক্ষণীয় যে, 'আনুগত্য'ও ভয়, ভালবাসা ইত্যাদির মত স্বাভাবিক কর্ম। সাধারণভাবে তা ইবাদত নয়। এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত শিরক হলেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য অবৈধ নয়। ইসলামী নির্দেশের বিপরীত নয় এমন বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ইসলামে বৈধ বরং নির্দেশিত। কুরাআন-হাদীসে পিতামাতা, শাসক- প্রশাসক, আলিম-উলামা প্রমুখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীনের বিধান না জানলে আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী নির্দেশের বিপরীত কোনো মানুষের আনুগত্য করলে তাতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পাপ হবে, তবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ হবে না। যদি মানবীয় ভালবাসা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণে কারো নির্দেশ মত আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজ করে তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না। আমরা দেখেছি যে, এরূপ ভয়জনিত আনুগত্যের ভিত্তিতে শিরক বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হলেও তা শিরক-কুফর বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে কাউকে প্রশ্নাতীত চূড়ান্ত আনুগত্যের যোগ্য বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শিরক বলে গণ্য হবে। যেমন মনে করা যে, কুরআন-হাদীসে যা-ই থাক, অমুক যেহেতু বলেছেন যে, এ কর্মটি আমার জন্য হালাল কাজেই তা আমার জন্য হালাল হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নির্দেশে যাই থাক না কেন, অমুক ব্যক্তি, আলিম, রাজা বা পার্লামেন্ট যা হালাল বলেছে তা প্রকৃতই হালাল এবং যা নিষিদ্ধ করেছে তা প্রকৃতই হারাম তাহলেও তা শিরক্ হবে। এক্ষেত্রেও মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, আনুগত্যও শিরক হতে পারে, যদি তা ইবাদত পর্যায়ের বা 'চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি' হিসেবে হয়। ইহূদী খৃস্টানদের আনুগত্য ছিল এ পর্যায়ের আনুগত্য। শয়তানের বন্ধু বা মুশরিকদের আনুগত্যের বিষয়টিও একইরূপ। এখানে আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে। এখানে আনুগত্য হলো মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

আনুগত্যের শিরকের বর্ণনা দিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ) বলেন: মুশরিকগণ তাদের আলিমগণ ও নেককার আবিদগণকে রাব্ব বা মালিক ও প্রতিপালন হিসেবে গ্রহণ করত। এর অর্থ এই যে, তারা এ আকীদা পোষণ করত যে, এ সকল আলিম বা বুজুর্গ যা হালাল বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ। আর যা কিছু এ সকল আলিম ও বুজুর্গ হারাম করেন তা প্রকৃতই নিষিদ্ধ, হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ... এর রহস্য এই যে, কোনো বিষয়কে হালাল বা বৈধ করা এবং হারাম বা অবৈধ করার অর্থ সৃষ্টির রাজত্বে এরূপ কার্যকর

নিয়ম সৃষ্টি করা যে, অমুক কাজটি করলে তাতে শাস্তি পেতে হবে এবং অমুক কাজটি করলে তাতে শাস্তি পেতে হবে না। এরূপ সৃষ্টি ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহরই বিশেষণ এবং তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, কিভাবে একথা বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক বিষয় হালাল করেছেন বা হারাম করেছেন? দ্বিতীয়ত, কিভাবে বলা হয় যে, অমুক ইমাম বা মুজতাহিদ একে হালাল বা হারাম বলেছেন?

এর উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য বা নির্দেশনা আল্লাহর নির্দেশনা জানার সুনিশ্চিত প্রমাণ। যখন তিনি বলেন যে, অমুক বিষয় হালাল বা হারাম তখন নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা হালাল বা হারাম করেছেন। আর মুজতাহিদদের বিষয় হলো, তাঁরা আল্লাহর ওহী থেকে বা ইজতিহাদের মাধ্যমে হালাল হারামের বিধানটি অবগত করান মাত্র।

এখানে উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহ কোনো রাসূল প্রেরণ করেন এবং মুজিযার মাধ্যমে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব প্রমাণিত হয় এবং তাঁর জবানীতে আল্লাহ পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো হারাম বিষয় হালাল করেন তখন যদি কারো অন্তরে বিধানটি গ্রহণ করতে দ্বিধা ও আপত্তি দেখা যায় তবে তা দুটি কারণে হতে পারে। প্রথম কারণটি এরূপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তির অন্তরে নতুন বিধানটি প্রামাণ্যতায় সন্দেহ থাকবে। এক্ষেত্রে সে উক্ত রাসূলের রিসালতে অবিশ্বাসকারী বা কাফির বলে গণ্য হবে।

এরূপ দ্বিধা ও আপত্তির দ্বিতীয় কারণটি এরূপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, প্রথমে যে হারামের বিধানটি দেওয়া হয়েছিল তা রহিত বা পরিবর্তন করা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির মাধ্যমে বিধানটি পাওয়া গিয়েছিল সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ 'উলূহিয়্যাত' বা 'ঈশ্বরত্বের' কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। অথবা তিনি মহান আল্লাহর মধ্যে ফানা বা বিলুপ্ত হয়েছিলেন এবং তারই সাথে 'বাকা' বা অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যে কাজটি নিষেধ করেছেন, অথবা অপছন্দ করেছেন তার বিরোধিতা করলে সম্পদ বা সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত। কারণ সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা ব্যক্তির 'পবিত্র ক্রোধ ও বিরক্তি' আছে বলে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা 'পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয়' হালাল বা হারামের বিধান দিতে পারেন।[৭৫২]

৫. ৩. ২. ২. ৮. হজ্জ বা যিয়ারতের শিরক

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে আরবের মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবাগৃহের হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শিরকের প্রসার ঘটে তখন কাবাগৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উপাস্যের সন্তুষ্টি, আশীর্বাদ, বর বা বরকত লাভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক 'পবিত্র' স্থানে গমন করত বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। এগুলির মধ্যে ছিল ইয়ামানের 'রিয়াম' নামক মন্দির এবং খাস'আমদের 'যুল খুলাইসা' নামক মন্দির।[৭৫৩]

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেনঃ মুশরিকদের একপ্রকার শিরক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ। এর স্বরূপ এই যে, এরূপ মুশরিকগণ তাদের 'উপাস্য-শরীকদের' স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে বরকতময় বলে বিশ্বাস করে এবং সে সকল স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন[৭৫৪]:

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى (مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي)

"তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) ও মাসজিদুল আকসা।"[৭৫৫]

৫. ৩. ২. ২. ৯. তাবার্রুকের শিরক

তাবার্রুক অর্থ বরকত অনুসন্ধান করা বা বরকত আশা করা। আরবের মুশরিকদের শিরকের একটি দিক ছিল তাবার্রুক বা বরকত লাভের জন্য কোনো স্থান বা দ্রব্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। তারা কাবা ঘরের পাথর ইত্যাদি বরকতের জন্য কাছে রাখত, তাওয়াফ করত বা সম্মান করত। এ সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার "সীরাতুন্নবী" গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন: ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করত। তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না। যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে করে কাবাঘরের তাযীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন। তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলি রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান করতেন। পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায়। পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে।[৭৫৬]

কাবাগৃহের পাথর ইত্যাদি ছাড়া আরো অনেক কিছু তারা 'তাবার্রুকের নামে' ভক্তি করত, আর আমরা দেখেছি যে, চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদত। এভাবে তাবার্রুকের নামে তারা শিরকের মধ্যে নিপতিত হতো। তাদের এ সকল ভক্তিকৃত দ্রব্যের মধ্যে ছিল 'যাত আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষ।

আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) বলেছেন:

إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْن (خَرَجْنَا مَع رسول الله ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ) مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُون عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ (سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ حَوْلَهَا وَيُعَلِّقُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا (قلنا) يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"মক্কা বিজয়ের পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। তখন আমরা নও মুসলিম। মক্কা বিজয়ের সময়েই কেবল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) বৃক্ষের নিকট দিয়ে যান, যে গাছটির নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত'। মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। আমাদের কিছু মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। আমরা যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহর কসম, মূসার কওম যেরূপ বলেছিল: মুশরিকদের মূর্তির মতো আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও[৭৫৭], তোমরাও সেইরূপ বললে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।"[৭৫৮]

ইহূদী-খৃস্টানদের এরূপ তাবার্‌রুক বিষয়ক যে শিরকের কথা হাদীস শরীফে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নবী ও অলীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা কবর মাজার থেকে বরকত লাভের চেষ্টা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে এরূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অনেক সাহাবী থেকে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ অর্থের কয়েকটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় ও জীবনী বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি, এরূপ এক হাদীসে তিনি বলেন, "তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে।" ...

এখানে লক্ষণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-নাসারাদেরকে কঠিন ভাষায় অভিশাপ করেছেন। মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহর ইবাদত। অথচ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তিনি ঐসব জাতিকে লা'নত করলেন, শুধুমাত্র কবরের কাছে এই ইবাদতগুলি পালন করার কারণে। মসজিদ আল্লাহর ইবা্দতের জন্য। মসজিদে সালাত, দু'আ ইত্যাদি যা কিছু করা হয় সবই আল্লাহর জন্য। মৃতের জন্য কিছুই নয়। কবরের নিকট মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য কবরবাসীর জন্য সালাত আদায় নয়, বরং আল্লাহর জন্য সালাত আদায়ে নেককার মানুষের সাহচার্য ও বরকত লাভ মাত্র। কিন্তু এরূপ তাবার্‌রুকের চিন্তাই শিরকের অন্যতম পথ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোরভাবে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

৫. ৩. ৩. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী মুশরিক সম্প্রদায়গুলি জীবিত, মৃত ও জড় বিভিন্ন সৃষ্টির ইবাদত করত। জীবিতদের মধ্যে তারা ফিরিশতা ও জিন্নগণের ইবাদত করত। আর মৃতদের মধ্যে তারা বিভিন্ন নবী, রাসূল ও নেককার মানুষদের ইবাদত করত। মৃতদের ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত কিছু সামনে রেখে তাঁদের ডাকত। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, তাদের সমাধি, মূর্তি, স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থান ইত্যাদি। এ সকল বস্তুকে সামনে রেখে এ সকল মৃতদের আত্মার জন্য তারা উৎসর্গ, ভেট, জবাই, সাজদা ইত্যাদি পেশ করত এবং তাদের সাহায্য, সুপারিশ, নেক-নজর ইত্যাদি কামনা করত। যুগের আবর্তনে সাধারণ অনেক মুশরিক এ সকল মূর্তি, পাথর, কবর, বৃক্ষ ইত্যাদিকেই 'প্রকৃত উপাস্য' বলে মনে করত। তবে তাদের মধ্যকার পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ দাবি করত যে, এ সকল দ্রব্য প্রকৃত উপাস্য নয়, বরং এগুলির সাথে জড়িত মূল ব্যক্তির আত্মাই প্রকৃত ভক্তির পাত্র। এগুলি ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। এছাড়া চাঁদ, সুর্য ইত্যাদির ইবাদতও বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এগুলিকে তারা স্রষ্টার শক্তির প্রকাশ বা উৎস হিসেবে এবং কেউ বা প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গলের আধার হিসেবে ইবাদত করত।

এ সকল মুশরিকের অধিকাংশই পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষালাভ করার পরেও বিভিন্ন কারণে কুফর-শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ, ইহূদীগণ, খৃস্টানগণ এবং এরূপ অন্যান্য জাতির অনেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান, ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান ইত্যাদি দাবি করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিরকে লিপ্ত ছিল। এ সকল মুশরিক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করত। ঈসা (আ), উযাইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবীগণ ও ফিরিশতাগণের ইবাদত করত। এছাড়া কল্পিত অনেক 'আল্লাহর প্রিয় বান্দার' ইবাদতও তারা করত। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তাদের এ বিভ্রান্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ:

৫. ৩. ৩. ১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি

তাদের দাবি ছিল যে, এ সকল বান্দা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং এদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কের কারণে তারাও বিশেষ ভক্তি বা ইবাদতের পাওনাদার হয়েছেন। এ সকল মানুষের মুজিযা, কারামত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাদের

উলূহিয়্যাত বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। তাদের মতে, মহান আল্লাহই এদেরকে সে মর্যাদা দিয়েছেন কাজেই এদের ইবাদত করলে স্বয়ং আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ইবাদত করলে এরাই মানুষদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেন। তাদের এ দাবি বা 'যুক্তির' বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৭৫৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন: "মহান আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তারা ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে ভালবাসে ও ইবাদত করে এবং বলে, হে আমাদের উপাস্যগণ, আমরা তো তোমাদের একমাত্র এজন্যই ইবাদত করছি যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও মর্যাদা পাইয়ে দেবে এবং আমাদের হাজত প্রয়োজনের বিষয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।... প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৪ হি) বলেন: কুরাইশ তাদের মুর্তিগুলিকে এ কথা বলত এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ ফিরিশতাগণকে তা বলত, ঈসা ইবনু মরিয়মকে (আ) তা বলত এবং উযাইর (আ)-কে তা বলত।"[৭৬০]

আমরা দেখেছি যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) তাদের এ যুক্তির ব্যাখ্য করেছেন। তাদের এ দাবির সারমর্ম হলো, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি উর্ধ্বে। তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তার ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন।

৫. ৩. ৩. ২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি

মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা 'দলিল' ছিল সুপারিশের দলিল। তারা স্বীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তবে এ সকল বান্দাকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালবাসেন, কাজেই এদের সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী)। বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে।"[৭৬১]

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো , কাফিররা একথা অস্বীকার করত না যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সকল উপাস্যের কোন ক্ষমতা নেই। এরা শুধু সুপারিশ করতে পারে। আল্লাহ যদি কোন কল্যাণ অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা রোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

"যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা কর: আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃস্টি করেছেন? এরা উত্তরে অবশ্যই বলবে: আল্লাহ। বল: তোমরা বল তো, যদি আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চান তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকছ তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কি তারা সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীগণ তার উপরই নির্ভর করে।"[৭৬২]

অর্থাৎ কাফিররা মেনে নিচ্ছে যে আল্লাহর ইচ্ছা রোধ করার ক্ষমতা এদের নেই। তার পরও তারা এদের ইবাদত করত, শুধুমাত্র এ যুক্তিতে যে, এরা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মেটাবে এবং এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হবেন, কারণ এরা আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ এখানে এবং কুরআনের সর্বত্র এই অদ্ভুত যুক্তির অসারতা বর্ণনা করেছেন। এদের যখন কোন ক্ষমতাই নেই এবং সব ক্ষমতাই যখন আল্লাহর তখন আল্লাহকে না ডেকে এদেরকে ডাকার মত বোকামি আর কি হতে পারে।

তাদের এরূপ কর্মের অসারতা ও স্ববিরোধিতা ধরিয়ে দিলে সকল যুক্তিতে পরাস্ত হলে তারা প্রচলনের দোহায় দিত। সকল ধর্মে করছে, যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষরা করে এসেছেন, তারা ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবী থেকেই তো ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাদের কর্ম কিভাবে ভুল হতে পারে। একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে এটা একটি অদ্ভুত নতুন কথা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব কথা বলা হচ্ছে, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি । এ বিষয়ক কিছু আয়াত

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

কুরআনের বর্ণনার আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের পথে তাদের পদক্ষেপগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক। তাদের এ বিশ্বাস সঠিক ছিল।

(২) তারা বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ নবীগণ ও অন্যান্য কিছু মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালবাসেন। ফিরিশতা ও নবীগণের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস সঠিক ছিল, তবে অন্যান্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল।

(৩) তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারেন। তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার সমন্বিত রূপ। মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ফিরিশতাগণ বা আল্লাহ প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামত নয়। বরং সুপারিশ বা শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন তিনি সুপারিশ করবেন কেবলমাত্র তার জন্য যার বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার উপরে আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন। কাজেই সুপারিশের কল্পনা করে তাদের ইবাদত করা যাবে না। বরং আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন।

(৪) তারা বিশ্বাস করত যে, এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন এবং এরাও সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজনগুলি আল্লাহর নিকট থেকে আদায় করে দেন। এ বিশ্বাসটি ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

৫. ৩. ৩. ৩. শয়তানের প্রতারণা

শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

"যেদিন তিনি এদেরকে সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত করত?' ফিরিশতারা বলবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।"[৭৬৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

"মুশরিকগণ যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল (কিয়ামদের দিন) যখন তারা তাদেরকে দেখবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন তাদের কথার প্রতি-উত্তরে তারা বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"[৭৬৪]

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নেককার বুজুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে শিরকের মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। নূহ (আ)-এর জাতির কুফ্‌র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

তারা বলল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের ইলাহদেরকে (উপাস্যদেরকে), পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সূওয়া'আ, য়াগূস, য়া'উক ও নাস্‌র-কে।"[৭৬৫]

হাদীস শরীফে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম। আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল। এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয়। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসর – এই পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বিলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো অনুসারী শয়তানের ওয়াওয়াসায় বলেন: আমরা এদের মাজলিস বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে এদের জন্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রাখি। আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে। এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে

ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি। তারা তো এদের 'ভক্তি' করত এবং এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত। তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল।[৭৬৬]

৫. ৩. ৩. ৪. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ-অনুসরণ

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের অন্যতম কারণ পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ-অনুকরণ। আমরা ইতোপূর্বে আরবের কাফিরদের প্রসঙ্গে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের সকল যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসেবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত এবং শিরক পরিত্যগ করতে অস্বীকার করত।

ইহূদী-খৃস্টানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাদের নিকট বিদ্যমান বিকৃত 'বাইবেল' সুস্পষ্টরূপে তাদের শিরকের অসারতা প্রমাণ করে। বাইবেলের অগণিত আয়াত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির, মুর্তির বা প্রতিকৃতির পূজা ও উপাসনা কঠিনভাবে নিষেধ করে। বাইবেলের কোথাও ত্রিত্ববাদ এবং ঈসা (আ)-এর ইবাদত করার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ সকল বিষয় তাদের কাছে সুস্পষ্ট করার পরেও তারা তাদের শিরক পরিত্যাগ করতে রাজি হন না। মূলত তাদের যুক্তি একটিই, পৌল ও তার অনুসারী মুশরিকদের প্রতি তাদের ভক্তি এবং হাওয়ারী বা শিষ্যগণের নামে প্রচলিত কিছু মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদেরকেও এরূপ মুশরিক মনে করে তাদের অনুসরণের দাবি। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[৭৬৭]

৫. ৩. ৩. ৫. নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য

অনেক সময় ব্যক্তি মানুষ নিজের বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দের অনুকরণ-প্রিয়তা বা তাদের বিরোধিতার অনাগ্রহ তাকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

একজন সাধারণ মুশরিক যখন কুরআনের যুক্তিগুলি নিয়ে চিন্তা করে তখন শিরকের অসারতা ও তাওহীদের আবশ্যকতা বুঝতে পারে। মহান আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাজেই তাকে ছাড়া অন্যকে ডাকার, সাজদা করার, মানত করার, নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করার দরকার টা কি? আমরা দাবি করছি যে, মহান আল্লাহ কোনো কোনো বান্দাকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু এ দাবি আমরা ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারছি না। তিনি কাউকে কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন বলে কোথাও বলেন নি। তিনি তার কোনো নবী বা প্রিয় বক্তিত্বকে ডাকতেও নির্দেশ দেন। তিনি কোথাও বলেন নি যে, অমুক নবী, ফিরিশতা বা অমুক ব্যক্তিকে ডাক এবং তার কাছে সাহায্য চাও, মানত কর, ভেট দাও, তাহলে আমি খুশি হব। বরং তিনি বারংবার বলছেন যে, আমাকে ছাড়া কাউকে ডেক না। কেবল আমাকেই ডাক আমিই সব প্রয়োজন মেটাতে পারি। কাজেই আমি কেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকব বা তার ইবাদত করব? সকল যুক্তি ও বিবেকের দাবি তো এই যে, আমি শুধু মহান আল্লাহরই ইবাদত করব।

এভাবে একজন সাধারণ তার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে শিরকের অসারতা বুঝতে পারে। কিন্তু সে তার এ চিন্তা ধর্মগুরু বা সমাজপতির মতামতের বিরুদ্ধে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে অথবা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। অথবা এরূপ ধর্মগুরু বা সমাজপতিদের কাছে তার চিন্তা প্রকাশ করলে তারা বলে, আরে বাদ দে ওসব কথা! যারা পিতাপিতামহদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন কথা বলছে তাদের মত বেয়াদবদের কথায় কান দিবি না। যুগ যুগ ধরে সকলেই করছে, কেউ কিছু বুঝল না আর তুমি বেশি বুঝলে। অমুক, অমুক, তমুক বুজুর্গ, পাদরি, যাজক, ধর্মগুরু এরূপ বলেছেন ও করেছেন, তাদের কথা তোমার ভাল লাগে না! এরূপ করে অমুক এত কিছু পেয়েছেন, বেয়াদবি করে অমুক অমুক শাস্তি পেয়েছে, কাজেই সাবধান!! ... ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্তির কাছে দুর্বল চিত্ত মানুষের বিবেক খেই হারিয়ে ফেলে। সে নিজের বিবেকের ডাক প্রত্যাখ্যান করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে।

এদের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

"যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারিগণ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল।'"[৭৬৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا

“তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাদেরকে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা দুর্বলদেরকে বলবে, ‘তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, ‘প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি।”[৭৬৯]

৫. ৩. ৩. ৬. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

ইতোপূর্বে আমরা খৃস্টানদের শিরকের বিষয়েও কুরআনের বিশ্লেষণ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ওহীর সাথে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসে পরিণত করে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয়। তাদের শিরকের ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিত্ববাদ ও ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মারিয়াম (আ)-কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

“আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?...”[৭৭০]

খৃস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, সাধারণ খৃস্টানগণ কখনোই মরিয়ামকে ত্রিত্ববাদের অংশ বা ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করেন না। বরং তারা তাকে মানুষ ও যীশুর মাতা হিসেবে ‘ভক্তি’ করেন, তার নামে মানত করেন, ভক্তির প্রকাশ হিসেবে তার নামে উৎসর্গ করেন বা তার মুর্তি তৈরি করে রাখেন। কিন্তু কখনোই তারা তাকে ‘ঈশ্বর’ বলে মনে করেন না, ঈশ্বরের কোনো অংশ বলেও মনে করেন না।[৭৭১]

বস্তুত ‘ইবাদতের’ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদের এ সকল প্রলাপের কারণ। প্রকৃতপক্ষে তারা ‘ভক্তি’, ‘শ্রদ্ধা’ ইত্যাদির নামে তারা ‘মরিয়ম’ (আ)-এর ইবাদত করত। আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের অর্থ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, অলৌকিক বা অপার্থিব প্রার্থনাই ইবাদতের মুল ও প্রধান প্রকাশ। আর প্রার্থনা বা দু'আর কবুলিয়্যাতের জন্য মানত, নযর, উৎসর্গ, সাজদা ইত্যাদি করা হয়। খৃস্টানগণ এভাবেই মারইয়াম (আ)-এর ইবাদত করে। তারা তাঁকে আল্লাহ বা স্রষ্টা বলে দাবি করে না। তবে ‘ঈশ্বরের মাতা’ বা ‘আল্লাহর বিশেষ করুণা-প্রাপ্ত মানুষ হিসেবে’ ফিলিস্তিনে তাঁর কবরে এবং সকল গীর্জায় তাঁর মুর্তি তৈরি করে মুর্তির সামনে তাদের হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য অলৌকিক সাহায্যের আশায় তাঁরা কাছে প্রার্থনা করে। আর প্রার্থনা যেন ‘মা-মেরী’ তাড়াতাড়ি পূরণ করেন সে আশায় তার নিকট মানত, নযর ইত্যাদি পেশ করে বা সাজদা করে পড়ে থাকে।

৫. ৩. ৪. শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা

কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই বিভিন্নভাবে মুশরিকদের বিভ্রান্তি খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের কর্মের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল যুক্তি ও আলোচনা বিস্তারিত জানতে হলে অর্থ অনুধাবন-সহ কুরআন পাঠই আমাদের মূল করণীয়। এখানে অতি সংক্ষেপে কুরআনের এ বিষয়ক আলোচনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করব।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআনে অধিকাংশক্ষেত্রে দু শ্রেণীর মুশরিকের আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে: (১) আরবের মুশরিকগণ এবং (২) ইহূদী-খৃস্টানগণ।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, প্রথম দলের মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম মালিক এবং তিনি কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ফয়সালা দিলে তা রোধ করার ক্ষমতা কোনো উপাস্যেরই নেই। তবে সাধারণ অবস্থাতে এরা কিছু কল্যাণের ক্ষমতা রাখে যে ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহই ভালবেসে দিয়েছেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না।

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ফিরিশতা, জিন্ন, পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী-রাসূল এবং অনেক প্রতিমা-মুর্তি ও প্রতিকৃতির ইবাদত করত।

দ্বিতীয় দলের মানুষেরাও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করত। খৃস্টানগণ ঈসা (আ)-এর বিষয়ে বিভিন্ন অতিভক্তিমূলক বিশ্বাসের কারণে শিরক করত। এছাড়া মরিয়ম (আ)-এর ও ইবাদত করত। উপরন্তু অনেক সাধু, সেন্ট বা সান্তার ভক্তির নামে তারা তাদের ইবাদত করত।

এদের শিরকের অযৌক্তিকতা বর্ণনায় কুরআনের যুক্তির মধ্যে রয়েছে:

৫. ৩. ৪. ১. যিনি একমাত্র রাব্ব তিনিই একমাত্র ইলাহ

রুবূবিয়্যাত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সেহেতু অন্যের ইবাদত একেবারেই অযৌক্তিক। যার মধ্যে চূড়ান্ত রুবূবিয়্যাতের বা প্রতিপালন, সংহার, সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা নেই তার নিকট চূড়ান্ত ভক্তি বা বিনয় প্রকাশের মত পাগলামি আর কি হতে পারে। আমরা কুরআনের এ বিষয়ক কিছু যুক্তি ও আলোচনা ইতোপূর্বে দেখেছি।

মুশরিকদের সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, নবী, ওলী, জিন্ন বা অন্য সকলের ক্ষেত্রেই মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, এরা কেউ স্রষ্টা নন, একটি মাছিও এদের কেউ সৃষ্টি করেন নি এবং সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একক ক্ষমতা আল্লাহরই।

৫. ৩. ৪. ২. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না

কোথাও কোথাও মানবীয় যুক্তিতেই তাদের দাবির অসারতা ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। মুশরিকগণও স্বীকার করে এবং করত যে, যাদের তারা ডাকে তারা আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর মালিকানাধীন, তবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, ফলে তারা আল্লাহর মাহবূব, প্রিয় বা ওলী। কাজেই মহান আল্লাহ তাঁর অলৌকিক বিশ্বপরিচালনা শক্তি তাদেরকে দান করেছেন।

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, তাদের এ চিন্তাটিই মূলত অসার, অলীক ও অযৌক্তিক। আল্লাহর প্রিয়গণ বা মাহবূবগণ তার চাকর। একজন মানুষ বন্ধুর সাথে অন্য মানুষ বন্ধুর যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক নয়। বরং একজন ভাল চাকরের সাথে একজন মালিকের যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক। মালিক চাকরকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নিজের সম্পদের মালিকানা বা অধিকার দিবে কেন?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"আল্লাহ রিযকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিয্‌ক বণ্টন করে দেয় না যে তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?"[৭৭২]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন: তোমাদের আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা নিজেদেরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলি বিবৃত করি।"[৭৭৩]

মানুষ নিজেই যখন নিজের কোনো ক্রীতদাসকে নিজের সম্পত্তির বা ক্ষমতার শরীক করে না, তখন কেন আল্লাহ সর্বশক্তিমান তার কোনো সৃষ্ট দাসকে তার শরীক বানাবেন? যাদেরকে আল্লাহর বদলে ডাকা হয় তাদের ক্ষমতা ও অধিকার যদি আল্লাহর ইচ্ছাধীনই হয় তবে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকার দরকার কি?

৫. ৩. ৪. ৩. ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন?

যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হতো যে, মহান আল্লাহ প্রতিপালনক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হলেও অন্য কারো কারো অল্প সল্প কিছু ক্ষমতা আছে তবুও যুক্তির দাবি হত যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আর যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের ইবাদত করা বা তাদের কাছে ভয়-ভক্তি মিশ্রিত চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও বিনয় প্রকাশ করার চেয়ে পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। এ বিষয়ক অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তা উন্মুক্ত করার মতও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭৭৪]

৫. ৩. ৪. ৪. আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?

আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ সবকিছু স্বীকার করার পরেও দাবি করত যে, মহান আল্লাহ এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এদের ইবাদতে খুশি হয়ে তিনি এদেরকে কিছু ক্ষমতা-অধিকার দিয়েছেন, যেমন রাজা-মহারাজা তার প্রিয় খাদেম বা দাসকে অনেক সময় খুশি

হয়ে আঞ্চলিক শাসক বানিয়ে দেন বা কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেন। কুরআন কারীমের বিভিন্নভাবে কাফিরদের এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কোথাও তাদের কাছে দলিল চাওয়া হয়েছে, তোমরা ওহীর আয়াত থেকে প্রমাণ দেখাও, কবে, কোথায় কোন্ ফিরিশতা, নবী, ওলী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন? এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ অর্থের এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৭৭৫]

স্বভাবতই তারা এরূপ কোনো দলিল উপস্থাপনের অক্ষম ছিল। এক্ষেত্রে তারা অমুক বলেছেন, সমাজের সকলেই বলে, সকলেই করে, পিতাপিতামহগণ করেছেন ইত্যাদিকে দলিল হিসেবে পেশ করত। এমনকি খৃস্টানগণও কখনো তাদের প্রচলিত বাইবেল থেকে একটি দ্ব্যর্থহীন দলিলও পেশ করতে পারে নি, যাতে ঈসা মসীহ (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে, বা আল্লাহকে পেতে হলে আমার ইবাদত করতে হবে, অথবা আমার মধ্যকার যে পুত্রসত্তা আছে তোমরা তার ইবাদত করবে। তিনি সর্বদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন।

৫. ৩. ৪. ৫. আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি

অন্যত্র মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কখনোই কাউকে এরূপভাবে ক্ষমতা দেন নি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

"বল, 'প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁরা ক্ষমতায়-রাজত্বে কোনো শরীক নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে- কারণে তাঁর অভিভাবকের বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"[৭৭৬]

এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

"বল, 'তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (ইলাহ) মনে করতে, তারা আকাশ-মণ্ডলী এবং পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ মহান আল্লাহর সহায়কও নয়।"[৭৭৭]

এ বিষয়টি সকল মুশরিকের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, তারকা, ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ, জিন্নগণ বা অন্য যাদেরই ইবাদত করত মুশরিকগণ সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর একই। তাঁরা কেউই আসমানের বা যমিনের এক অনুপরিমাণ মালিকানা রাখেন না। আসমান-যমিনের কোথাও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং মহান আল্লাহ তাদের কারো সহযোগিতার প্রত্যাশী নন, কেউ তাকে কোনোরূপে সাহায্য সহযোগিতা করেন না। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

"তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব-মালিকানা তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।"[৭৭৮]

খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে মহান আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ ও 'অবতার' (God incarnate) হিসেবে ইবাদত করে। এ ছাড়া তারা মরিয়ম (আ)-কে 'সান্তা' বা মহান আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত 'ওলী' হিসেবে ইবাদত করে। তার মুর্তিতে বা ফিলিস্তিনে বিদ্যমান তার কবরে সাজদা করে, মানত করে, তার আশীর্বাদ ও বর প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ তাদের মানবত্ব ও অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"মরিয়ম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়! বল, 'তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি করার বা উপকার করার? আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৭৭৯]

৫. ৩. ৪. ৬. সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে

ক্ষমতার বিষয়টি মুশরিকদের মধ্যে এমনভাবে আসন গেড়েছিল যে, সবকিছুর পরেও তারা দাবি করত আমাদের উপাস্যদের কিছু ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির একত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে বারংবার বলেছেন যে, যারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাদের তো কোনো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। তাদের কোনো ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় কোনো ভাবেই তারা মহান আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। কাজেই কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকতে হবে? কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

"সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?"[৭৮০]

ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, নবীগণ, ওলীগণ, মূর্তি-প্রতিমা, বৃক্ষ, জড় পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মুশরিকগণ উপাসনা করত সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তারা সকলেই স্বীকার করত যে, এ সকল উপাস্যের কেউই কোনো কিছুর স্রষ্টা নন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত জীবন-বিহীন এবং পুনরুত্থান কখন হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই।"[৭৮১]

প্রথম যুক্তিটি মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আয়াতটি ফিরিশত, ঈসা (আ), জিন্নগণ বা অনুরূপ জীবিত উপাস্য ছাড়া মুশরিকদের অধিকাংশ উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

"বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তদ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।"[৭৮২]

এ বিষয়টিও মুশরিকদের জীবিত, মৃত ও জড় সকল উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার সৃষ্টির একত্ব উল্লেখ করে শিরকের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৫. ৩. ৪. ৭. এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এ সকল উপাস্যের অসহায়ত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

"তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।"[৭৮৩]

মুশরিকগণ যাদের ডাকে তাদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বর্ণনা করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ

"সত্যের আহ্বান তাঁরই (আল্লাহরই)। যারা তাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে কোনো সাড়াই দেয় না তারা। তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছাবে-এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে পানির দিকে, আর এভাবে কখনোই পানি তার মুখে পৌঁছাবে না। কাফিরদের দু'আ- আহ্বান নিষ্ফল।"[৭৮৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।"[৭৮৫]

এ বিষয়টিও মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, জিন্ন, নবী, ওলী ও অন্যান্য সকল মাবূদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি সত্য। যারা আল্লাহকে ছেড়ে বিপদে আপদে ঈসা মাসীহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, জিবরাঈল, আযরাঈল (আলাইহিমুস সালাম) বা কোনো সত্যিকার ওলী বা মনগড়া আল্লাহর পুত্রকন্যা বা প্রতিমা লাত, মানাত বা অন্য কাউকে ডাকছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা বলা হয়েছে। এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, জিবরাঈল, ইসরাফীল, অন্য কোনো ফিরিশতা, নবীগণ বা ওলীগণকে ডাকলে হয়ত শুনতে পান। কাউকেই আল্লাহ কোনো অলৌকিক বা গাইবী শ্রবণের ক্ষমতা দেন নি। সবই মুশরিকদের কল্পনা মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা যে, এরা কেউই তাদের অনুসারী বা ভক্ত নামধারীদের ভক্তি বা ইবাদতে খুশি নন এবং এদের জন্য কোনো সুপারিশ তাঁরা করবেন না।

৫. ৩. ৪. ৮. মালিককে রেখে চাকরকে মাবূদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি

সকল মুশরিকই স্বীকার করছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র মালিক, রাজা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালক। পাশাপাশি তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তার সাথে যাদেরকে তারা ইবাদত করছে তারা সকলেই মহান আল্লহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই বান্দা। এ কথা স্বীকার করার পরে মহান মালিককে ছেড়ে চাকরবাকরদের ইবাদত করা বা তাদের নিকট নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করার মত বোকামি আর কি হতে পারে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلا

"যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে ওলী-অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।"[৭৮৬]

৫. ৩. ৪. ৯. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না

আমরা দেখেছি যে, শিরকের মূল হলো মহান আল্লাহর বিষয়ে কু-ধারণা বা "অব-ভক্তি' এবং বান্দার বিষয়ে 'অতি-ধারণা' বা 'অতিভক্তি'। আর এর অন্যতম কারণ মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা। মুশরিকদের যুক্তিই ছিল পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণের নিকট আবেদন করতে যেমন মন্ত্রী, খাদেম, দারোয়ান, সামন্তরাজা বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না কেন। দুনিয়ার সাধারণ একজন রাজা এত আমত্য-পরিষদ রাখেন আর সকল রাজার মহারাজা মহান আল্লাহ তা রাখবেন না কেন? ইত্যাদি।

কুরআনে এরূপ তুলনা করতে বারংবার নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায় না। একজন মানুষ মহারাজা তার সেনাপতি, খাদেম, সামন্ত শাসক বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী, তিনি নিজে সবকিছু দেখতে, শুনতে বা জানতে পারেন না। তিনি অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, অথবা মূল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাই সংশ্লিষ্ট অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সব কিছু নিজে জানা ও বিচার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহকে এরূপ মানুষ মহারাজার সাথে তুলনা করার অর্থ তার রুবূবিয়্যাতের সাথে কুফরী করা ও তাঁর বিষয়ে 'কু-ধারণা' পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো তুলনা-উদাহরণ স্থাপন করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৭৮৭]

৫. ৩. ৪. ১০. আল্লাহর মাহবূব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, শয়তানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা এবং বিভিন্ন মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ ও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দা তাদের ইবাদত পেয়ে খুশি হন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান ফিরিশতাগণের কল্পিত রূপে বা অন্যান্য নবী, ওলী বা কল্পিত মা'বুদদের বেশ ধরে তাদেরকে এরূপ ধারণা প্রদান করত, যেমন ভারতীয় হিন্দু পূজারীদের সামনে স্বপ্নে বা জাগরণে কালী, গনেশ, মহামায়া ইত্যাদি রূপে 'প্রকাশিত' হয়ে তাদের শিরককে সঠিক বলে ধারণা দেয়। মুসলিম সমাজে যারা শিরকে লিপ্ত তাদেরকেও এভাবে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান প্রতারিত করে।

এজন্য কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত প্রিয় বান্দাগণ কিয়ামতের দিন এসকল মুশরিকের প্রতি তাদের প্রকৃত বিরাগ প্রকাশ করবেন। বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত

ইতোপূর্বে আমার দেখেছি। মুশরিকগণ ফিরিশতা, নবী, ওলী বা কল্পিত 'আল্লাহর প্রিয়' বলে যাদেরকে ডাকে তারা কিয়ামতের দিন এ সকল মুশরিকের সাথে শত্রুতা করবেন এবং মুশরিকগণ মূলত শয়তানদের ইবাদত করত বলে ঘোষণা করবেন বলে আমরা দেখেছি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ক আরো কিছু আয়াত আমরা দেখব।

অন্যত্র মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, কোনো নবী-রাসূল কখনোই আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করার কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা বা কোনো নবীকে ইলাহ তো দূরের কথা 'রাব্ব' বা প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি বলতে পারেন না। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তবে আপেক্ষিক লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের অর্থে 'রাব্ব' বলা যায়। কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সত্যিকার ধার্মিক মানুষ কোনো ফিরিশতা বা নবীকে ইবাদত করা তো দূরের কথা তাদের তত্ত্বাবধানের বা বিশ্ব-পরিচালনার কোনোরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেও তারা বলতে পারেন না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নুবুওয়াত প্রদান করার পর তার জন্য শোভন নয় যে, সে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও',বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা-রাব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। আর সে তোমাদের নির্দেশ দিবে না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ এবং নবীগণকে আল্লাহর পরিবর্তে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরে কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?"[৭৮৮]

অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দাও যদি কোনোভাবে নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করে বা কোনো মানুষের ইবাদত বা চূড়ান্ত ভক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয় তবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে 'আমিই ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত', তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"[৭৮৯]

৫. ৩. ৪. ১১. মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা'আত পাবে না

আমরা দেখেছি যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রকৃত বা কল্পিত প্রিয় বান্দাগণের শাফা'আত লাভ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছাই শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে শাফা'আতের আশায় তার শিরক করত তা যে তারা পাবে না। বারংবার কিয়ামতের দিবসে মুশরিকদের চরম অসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আমরা জানি যে, যীশুখৃস্টের বা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতি ভক্তির সর্বোচ্চ প্রমাণ দিতে তাঁর নামে নিজেদের নামকরণ করেছে খৃস্টানগণ বা মাসীহীগণ। ঈসা (আ)-এর ভক্তির নামে তাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে তাঁরা। তাদের একটিই দাবি যে, ঈসা (আ) তাদের আখিরাতের কাণ্ডারী, মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা (savior)। অনুরূপভাবে আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণকে, জিন্নগণকে, কোনো কোনো নবীকে এবং মনগড়া অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা সন্তানকে ইবাদত করেছে। তাদেরও বিশ্বাস যে, এরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, এরা কেউই এদের জন্য শাফা'আত করবেন না। এর অর্থ এ নয় যে, নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা অন্যান্য নেক বান্দা শাফা'আত করবেন না। তাঁরা শাফা'আত করবেন শুধু তাদের জন্য যারা শিরক থেকে মুক্ত ছিল, যাদের ন্যূনতম তাওহীদে মহান আল্লাহ খুশি ছিলেন এবং যাদের বিষয়ে শাফা'আত করতে মহান আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিবেন।

এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ অর্থে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ

"যেদিন কিয়ামত হবে সে দিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে। তাদের শরীকগণের (উপাস্যগণের) মধ্য থেকে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের শরীকগণকে অস্বীকার করবে।"[৭৯০]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

"মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল তাদেরকে যখন তারা দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা ডাকতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুত্তরে তারা (শরীকগণ বা উপাস্যগণ) বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সে দিন তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে।"[৭৯১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

"তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের শরীকদেরকে ডাক', তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত!"[৭৯২]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا

"যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।"[৭৯৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

"এবং যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, এবং তিনি তাদের এ সকল উপাস্যকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তুমিই তো এদেরকে এবং এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা ওহী বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।"[৭৯৪]

কুরআন কারীমে আরো অনেক স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৯৫]

৫. ৩. ৪. ১২. অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি অস্বীকারের পরিণতি

সম্মানিত পাঠক সম্ভবত অনুভব করছেন যে, এ সকল কথার পরে তো আর কারো মধ্যেই শিরক থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তি বা বিবেক নয়, অন্ধ আবেগ ও মোহ হেদায়াতের পথে বড় বাধা। সকল যুক্তি এখানে শেষ হয়ে যায়। আগের কথাগুলিই ঘুরে ফিরে চলে আসে। এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র কাজেই এদের ইবাদতের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য পেতে হবে। এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না, কাজেই এদেরকে ডাকতে হবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তার ইচ্ছার বাইরে এরা কেউ কিছু করতে পারে না ইত্যাদি সবই ঠিক। তিনি কাউকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সুস্পষ্ট বলেন নি তাও ঠিক। অন্য কাউকে তিনি ডাকতে বলেন নি একথাও ঠিক। একমাত্র তাকেই ডাকতে বলেছেন এ কথাও ঠিক। তবুও এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। এদেরকে আল্লাহ ভালবেসে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে সরাসরি জানান নি। তবে যুক্তিতে তো বুঝা যায়। যুগযুগ ধরে সকলেই বলছে। নবী-রাসূলগণ থেকে পিতা-পিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ নিয়ম ভুল হতে পারে না। ... এভাবেই সকল যুক্তি ও বিবেকের বাণীকে তারা অস্বীকার করেছে। সকল যুক্তি অন্ধ আবেগ এবং দীর্ঘদিনের কর্মের ও বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কাছে হেরে গিয়েছে। মুশরিকদের এরূপ অন্ধ আবেগ ও অযৌক্তিক বিবেকবিরোধী আচরণে কষ্ট পেতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"যার অপকর্মকে তার জন্য সৌন্দর্যময় করে দেখানো হয়েছে ফলে সে তা ভাল বলে মনে করেছে, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।"[৭৯৬]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের অপকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?"[৭৯৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দিব যারা কর্মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা তো সে সকল মানুষ, দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।"[৭৯৮]

৫. ৩. ৫. শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম:

৫. ৩. ৫. ১. ভয়ঙ্করতম পাপ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"বল, 'এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না .....।"[৭৯৯]

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

"সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"[৮০০]

৫. ৩. ৫. ২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[৮০১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"[৮০২]

৫. ৩. ৫. ৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম

নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'।"[৮০৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৮০৪]

মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাঊদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসূফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।"[৮০৫]

৫. ৩. ৫. ৪. শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ

শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা'আতের কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৮০৬]

আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।"[৮০৭]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلا الشِّرْكَ

"জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।"[৮০৮]

৫. ৩. ৬. শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম শিরকের উৎসগুলি বন্ধ করা। আমরা দেখেছি যে, শিরক মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়: (১) মহান আল্লাহর প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা এবং (২) বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি-ধারণা। আর এ দুটি বিষয় পরস্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি কু-ধারণা না হলে কেউ কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর মর্যদা ও ক্ষমতার প্রতি অব-ধারণা পোষণ করা।

কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে এ বিষয়গুলি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ব্যাপক পরিসরের প্রয়োজন। এখানে অতি-সংক্ষেপে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করছি।

৫. ৩. ৬. ১. মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের প্রথম, প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় মহান আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা ও তাঁর তাওহীদ। বারংবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, বিশ্ব পরিচালনার অধিকার, ক্ষমতা, কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই। কেউ কিছু করতে পারে না, দিতে পারে না। তিনি দিলে

কেউ তা রোধ করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কারো কোনো ইচ্ছার কোনা মূল্য নেই। তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা, অনুমতি ও মর্যির বাইরে কারো সুপারিশ, শাফা'আত বা দু'আ গ্রহণ করেন না। একমাত্র তাঁকেই ডাক, তাঁরই সাহায্য চাও, তিনিই তোমার ডাকে সাড়া দিবেন। আর তিনি না দিলে অন্য কেউ কোনোভাবে দিতে পারে না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তাঁর মর্যদা ও মহত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মুমিন অর্জন করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

৫. ৩. ৬. ২. ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যে সকল বান্দার বিষয়ে অতিভক্তির কারণে শিরক করেছে তাদের অন্যতম ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণ। এ ছাড়া মুশরিকগণ অনেক বানোয়াট বা কল্পিত ব্যক্তিত্বকে 'আল্লাহর প্রিয়' বা 'আল্লাহর সন্তান' নাম দিয়ে শিরক করেছে। আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের সুপারিশ-শাফা'আত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত। কুরআন কারীমে তাদের এ অতিভক্তি রোধ করতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা মাত্র। তাঁরা শাফা'আতের সুযোগ পাবেন বটে, তবে তা তাদের ইচ্চাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন। কাজেই শাফা'আতের আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত ভয়ঙ্কর পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। এ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. ৩. ৬. ৩. নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূলের বিষয়ে অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপতিত হয়। এজন্য কুরআন কারীমের বারংবার নবী-রাসূলগণের আবদিয়্যাত বা বান্দাত্ব, বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর অক্ষমতা, গাইব সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাঁদের অনুসারী ও মুমিনগণ তাঁদের প্রতি অবিচল ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁদের তাদের বিষয়ে অতিভক্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, মর্যাদা প্রদান ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণের নির্দেশনাবলিও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৫. ৩. ৬. ৪. ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

আমরা দেখেছি যে, নেককার বা ওলী-আল্লাহগণের বিষয়ে অতিভক্তি ছিল মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অতিভক্তির পথ রোধ করা হয়েছে:

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে। ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। তাকওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয় তবে তা মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা বা কারামত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো অলৌকিক কার্য দেখে তাকে ওলী বলে মনে করার কোনোরূপ সুযোগ ইসলামে নেই। যেন মুমিন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে।

দ্বিতীয়ত, অলৌকিক কার্য দেখে তো কাউকে ওলী বলা যাবে না, এমনকি কুরআন-হাদীসে যাকে বেলায়াতের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঈমান ও তাকওয়া দেখেও কাউকে সুনিশ্চিত ওলী বলে নিশ্চিয়তা দেওয়া যায় না। কারণ, 'ঈমান' ও 'তাকওয়া' উভয়ই মূলত হৃদয়ের অভ্যন্তরের লূক্কয়িত বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মুমিনের কর্ম তার ঈমান ও তাকওয়ার আলামত মাত্র, যা দেখে ঈমান ও তাকওয়ার বিদ্যমানতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী। যারা তাকওয়া ও নেক-আমল যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিতভাবে ওলী বলে চিহ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। নির্ধারিতভাবে কাউকে 'ওলী' বলে নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ওহীর নির্দেশানা বাইরে কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপত্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে উসমান ইবনু মাযঊন (রা) বিষয়ক হাদীসটি ইতোপুর্বে আমরা দেখেছি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ

"কোনো ব্যক্তিকেই তার নিজের আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও নন? তিনি বলেন, না, আমিও নই, যদি আল্লাহ আমাকে মহানুভবতা ও রহমত দিয়ে আবৃত করে না নেন।"[৮০৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক নেক কর্মের ভিত্তিতে সম্মান করতে ও ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হলেও, কোনো বাহ্যিক কর্ম বা কারামাতের ভিত্তিতে কাউকে সুনিশ্চিত ওলী তো দূরের কথা জান্নাতী বলার কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। সর্বোপরি কোনো ওলীকে আল্লাহ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন বা দেন এরূপ কোনো কল্পনা করার সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআন বা হাদীসে কোথাও এরূপ কিছু বলা হয় নি। এমনকি সাহাবীগণ নেককার বুজুর্গদের নিকট দু'আ চাওয়ার বিষয়েও বাড়াবাড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন। সাধারণভাবে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদের জন্য দু'আ করতে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দু'আ চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দোয় চেয়েছেন কখনো কখনো। এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : উমর (রা.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন : আমাদেরকেও তোমার দু'আর মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও

না।[৮১০]

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু'আ চাইলে তাঁরা দু'আ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা.) -এর কাছে এসে দু'আ চায়। তিনি বলেন: "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।" (অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দু'আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।[৮১১]

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দু'আ চাইলে দু'আ করতেন না, কারণ এতে মানুষ দু'আ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দু'আ চায়। তিনি উত্তরে লিখেন :

إِنِّيْ لَسْتُ بِنَبِيٍّ، ولكن إذا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ لِذَنْبِكَ

"আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ কবুল হবেই), বরং যখন সালাত কায়েম করা হবে, তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"[৮১২]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলেন: আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দু'আ চান। তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ কবুল হবেই)।[৮১৩]

৫. ৩. ৬. ৫. মুর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে সকল সমাজের মুশরিকদেরই ধারণা যে, নেককার মানুষ মৃত্যুর পরে আরো বেশি অলৌকিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে। তারা দেহের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে পুরো আত্মিক আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জন করে। এজন্য জীবিত নেককারদের চেয়ে মৃত নেককারদের ইবাদত করা বা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানানোর প্রবণতা সব মুশরিকদের মধ্যেই বেশি।

আমরা দেখেছি যে, বিপদে আপদে মূর্ত কিছুকে আকড়ে ধরে নিজের মনের আবেগ জানানো এবং বিপদ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করার আগ্রহ শিরকের অন্যতম কারণ। দুর্বল চিত্ত মানুষ অদৃশ্য কোনো কিছুর কাছে প্রার্থনা করে পুরো তৃপ্তি পায় না। মূর্ত কিছুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। এজন্য মৃত মৃত নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা বা তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশের জন্য মুশরিক ব্যক্তি একটি মূর্ত কিছু সন্ধান করে। এজন্য মূল বাহন (১) উক্ত ব্যক্তির সমাধি বা কবর, (২) উক্ত ব্যক্তির ছবি,মূর্তি বা প্রতিকৃতি এবং (২) উক্ত ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা দ্রব্য। সাধারণত এগুলিকে কেন্দ্র করেই শিরক আবর্তিত হয়।

ইসলামে শিরকের এ সকল উপকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন কোনোভাবে মানবীয় দুর্বলতা বা শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে কোনো মুমিন এগুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে শিরকে নিপতিত না হয়। ছবি, প্রতিকৃতি, মুর্তি ইত্যাদি তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থানের বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি। কবর যেন মানুষের অতিভক্তির বিষয়ে পরিণত না হয় সে জন্য কবর কেন্দ্রিক মসজিদ ও ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি কবর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচু করা, পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপরে কিছু লেখা ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। মুর্তি, ছবি ও প্রতিকৃতির পাশাপাশি উচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে খলীফা আলীর (রা) পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ ...وَلا صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا

"আলী (রা) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন : যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।"[৮১৪]।

আবূ মুহাম্মাদ আল-হুযালী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرَهُ وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرْتُهُ وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّيْتُهُ وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) ছিলেন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছ যে মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রা) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেন: আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি কেউ পুনরায় এসকল কাজের কোনো একটি করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফ্‌রী করল।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৮১৫]

যাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"রাসুলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।[৮১৬]

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।"[৮১৭]

এ অর্থে উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮১৮]

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা।[৮১৯]

৫. ৪. মুসলিম সমাজে শির্‌ক প্রবেশের প্রেক্ষাপট

৫. ৪. ১. মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা দেখেছি যে, সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষদেরকে তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন। শয়তান ও তার অনুসারিগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে আবার তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিপতিত করতে। মানবীয় দুর্বলতা, তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় মুমিনকে শয়তানের ক্ষপ্পরে পড়তে সাহায্য করেছে।

তাওহীদের বিশ্বজনীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাও'আত। কুরআন ও সুন্নাহে তাওহীদকে সমুন্নত রাখার ও শিরক-কুফর প্রতিরোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা দেখেছি। কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টা তাতে থেমে যায় নি। শয়তান তার অনুসারীদের নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করাতে। বিশেষ করে যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই শয়তানের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সফলতা লাভ করেছে।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তাঁর উম্মাতের মধ্যেও অনুরূপভাবে একই প্রকৃতির বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে। এ বিষয়ক কিছু হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ বিষয়ক অনেক হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ। এ সকল হাদীস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ইহূদী, খৃস্টান, পারস্যের অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি যেভাবে আসমানী হেদায়াত পাওয়ার পরেও শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল অবিকল সেভাবে মুসলিম উম্মাহর অনেকে শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হবে। পার্থক্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর মূল দীন বিনষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ এর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে বিশুদ্ধভাবে হেফাযত করবেন এবং উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ সর্বদা হক্কের উপর থাকবেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করবেন।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে শিরক থেকে সতর্ক থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পিপিলিকার পদচারণার মত সন্তর্পনে তা মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। এমনকি মুর্তিপূজার মত বিষয়ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে ঘটবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ

"কিয়ামতের পূর্বেই দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব 'যুল খালাসাহ'-র আশেপাশে আন্দোলিত হবে", যুল খালাসাহ ছিল তাবালায় অবস্থিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা যা তারা জাহিলী যুগে ইবাদত করত।[৮২০]

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ

"কিয়ামতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 'ওয়াসান' 'পূজিত দ্রব্যের' ইবাদত করবে।"[৮২১]

ওয়াসান (الوثن) বলতে মুর্তি, প্রতিমা ও যে কোনো প্রকার পূজিত দ্রব্য বা বস্তু বুঝানো হয়। আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ

"আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম তখন আমার গলায় ছিল একটি স্বর্ণের ক্রুশ। তিনি আমাকে বলেন, তোমার গলা থেকে এ 'ওয়াসান' বা পূজিত বস্তুটি ফেলে দাও।"[৮২২]

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুর্তিপূজা, দ্রব্য পূজা, স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বা বস্তু পূজার মত শিরকও মুসলিম উম্মাতের কারো কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। বাস্তব অবস্থাও তাই সাক্ষ্য দেয়।

৫. ৪. ২. ইহূদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ

বস্তুত মুসলিম সমাজের সকল শিরক, কুফর ও বিভ্রান্তির মূল ইহূদী আন্দোলন, যেমন খৃস্টান ধর্মের বিকৃতির মূল কারণ ইহূদী আন্দোলন। ইহূদী পৌল যেমন কাশফ, কারামত ইত্যাদির দাবি করে খৃস্টান সেজে ক্রমান্বয়ে খৃস্টান ধর্মকে বিকৃত করে, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা মুসলিম সেজে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বাস বিকৃত করে। পৌল যিরুশালেমের হাওয়ারী ও ইসরায়েলীয় খৃস্টানদের মধ্যে সুবিধা করতে না পেরে 'পরজাতিদের' নিকট গমন করে। ইবনু সাবা মদীনা-মক্কায় সুবিধা করতে না পেরে কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নও মুসলিমদের নিকট গমন করে। উভয়েরই দাবি দাওয়ার ভিত্তি 'অতিভক্তি'র মাধ্যমে মুক্তি। তবে পৌল খৃস্টধর্মের মূল উৎসগুলি বিকৃত করতে সক্ষম হয়, ফলে মূল খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইবনু সাবা এরূপ কিছু করতে সক্ষম হয় না। সে অগণিত মিথ্য কথা প্রচার ও প্রসার করে যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ যেন কেউ গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করে যায়। তবে সে মূল কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত করতে পারে নি।

মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া. কারামিতা, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুয ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। বাগদাদে মূল কেন্দ্রে বনূ বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে। কারামাতিয়্যা, বাতিনীয়া, হাশাশিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কূফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ 'সুন্নী' মুসলিম, সূফী, দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই।

৫. ৪. ৩. ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি

ইনশা আল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শীয়া মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল এ মতবাদে আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে অতিভক্তি।

তারা বিশ্বাসের উৎস ওহীর মধ্যে বা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি। বরং ওহীর তাফসীরে তাদের 'আলিম' বা ইমামদের ব্যাখ্যাকেই ওহীর মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে ইমাম, ইমামগণের খলীফা বা ফকীহ নামে বিভিন্ন মানুষের মতামতকেও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবে মূলত তারা কুরআন বা ওহীর কার্যকরিতাই অস্বীকার করেছে। তাদের মতে কুরআনের অর্থ বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কুরআনের সরল যে অর্থ বুঝা যায় তাও কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বরং কুরআনের তাফসীরে ইমামগণ বা তাদের প্রতিনিধি বুজুর্গগণ যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত। এছাড়া তারা প্রচার করে যে, ইমামগন ও তাদের প্রতিনিধিগণ কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এ জ্ঞানই মূলত দীনের মূল। তাদের কথা ও ব্যাখ্যার আলোকেই কুরআনের নির্দেশাবিল গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

পাশাপাশি তারা দাবি করে যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ ও তাদের বরপ্রাপ্ত ওলীআল্লাহগণ গাইবী বিষয়ের জ্ঞান ও ক্ষমতা রাখেন। বিশ্ব পরিচালনা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা তাদেরই হাতে দিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। কাজেই তাদের কাছে প্রার্থনা করা, গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর কাছে সরাসারি চাওয়া উচিত নয় ...।

স্বভাবতই তারা এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন থেকে কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। সহীহ হাদীস তো দূরের কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত হাদীস থেকেও তারা কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ইমামের নামে প্রচলিত জাল কথা, কুরআনের তাফসীর নামে প্রচলিত বিভিন্ন আলিমের মতামত, বিভিন্ন আলিমের কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদিকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। বস্তুত, ঈমানের উৎস থেকে একবার মুমিনকে বিচ্যুত করতে পারলে তাকে সবই গেলানো সম্ভব।

শীয়াগণের প্রভাবাধীন সমাজগুলিতে বসবাসরত 'সুন্নী' মুসলিমও তাদের এ সকল আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতার আক্রমনের পরে ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজে ইলম ও আলিমগণের কমতির কারণে এ সকল শিরকী

আকীদা প্রসার লাভ করতে থাকে।

৫. ৪. ৪. একজন শীয়া আলিমের অভিব্যক্তি

যুগে যুগে শীয়াগণের মধ্যে, বিশেষত মূলধারার দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণের মধ্যে অনেক আলিমের আবির্ভাব ঘটেছে যারা কুরআন কারীমের উপর নির্ভর করে শীয়াদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি সংশোধন করতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের অতিভক্তি, অজ্ঞতা, পেটপূজারী আলিমদের বিরোধিতা ইত্যাদি কারণে তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। আধুনিক যুগের এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ শীয়া আলিম ইমাম ড. মূসা আল-মূসাবী। তিনি তার লেখা 'আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ' অর্থাৎ 'শীয়াগণ ও সংস্কার' নামক গ্রন্থে শীয়াদের মধ্যে প্রচলিত অতিভক্তি ও শিরক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। 'আল-গুলূ' বা অতিভক্তি শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেন:

অতিভক্তি বা সীমালঙ্ঘন শুরু হয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় কর্মের মধ্য দিয়ে। বিশ্বাসের সীমালঙ্ঘন হলো একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের বিষয়ে ধারণা করবে যে, সাধারণ মানুষ যা পারে না এমন কারামত, মুজিযা বা অলৌকিক কাজ সে করতে সক্ষম। যেমন জীবিত বা মৃত কোনো মানুষের বিষয়ে বিশ্বাস করা যে, তিনি অন্য কোনো মানুষের জীবনে দুনিয়াতে বা আখিরাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল এনে দিতে পারেন অথবা ভাল বা মন্দ কোনো প্রভাব রাখতে পারেন।

বিশ্বাসের সীমালঙ্ঘনের মূল সূত্র আমাদের শীয়া মতাবলম্বীদের হাদীসের গ্রন্থাবলি এবং জীবনী ও গল্পমূলক গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখ কৃত গল্প-কাহিনীসমূহ। এ সকল গল্পে আমাদের ইমামগণ, আওলিয়ায়ে কেরাম ও পীর-মাশাইখের নামে অদ্ভুৎ অদ্ভুত অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলিই কর্মের সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষেরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের কবর-মাযারে যেয়ে তাদের সামনে নিজেদের দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে এবং তাদের নামে নযর-মানত পেশ করে, সরাসরি তাদের নিকট হাজত মেটানোর আবদার পেশ করে এবং আরো অগণিত এ জাতীয় কর্ম করে। এ সকল কর্মের কারণ ও উৎস এ সকল গল্প-কাহিনী।

অতিভক্তি বা সীমালঙ্ঘনের মানবীয় প্রবণতা অমুসলিমদের মধ্যেও রয়েছে। শীয়া ছাড়া অন্যান্য মুসলিম ফিরকা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তাদের ইমাম ও ওলীগণের ক্ষেত্রে এরূপ অতিভক্তি ও সীমালঙ্ঘন বিদ্যমান। ... তবে এ ক্ষেত্রে শীয়াগণই অগ্রগামী এবং তারাই এ সব কিছুর সূচনা করেছে। এর কারণ হলো আমাদের পুস্তকগুলিতে যাচাই বাছাই না করে সব গল্প-কাহিনী সংকলন করা হয়েছে এবং আমাদের আলিম ও ফকীহগণ এগুলির বিষয়ে কোনো সমালোচনা বা যাচাই বাছাই মূলক কথা বলেন না। ... এ সকল গল্প-কাহিনী বিশুদ্ধ না বানোয়াট সে বিতর্কে না যেয়েও সুনিশ্চিত বলা যায় যে, এগুলি সবই বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক।....

ইমামগণ ও ওলীগণের নামে যে সকল উদ্ভট কাহিনী বানানো হয়েছে সেগুলি শুনে সন্তানহারা মায়েরও হাসি পায়। ইমাম ও ওলীদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এগুলি বানানো হলেও এগুলি মূলত তাদের মর্যাদ হ্রাস করে।...

আমাদের আলিমগণ ইমামদের ইসমাত বা নিষ্পাপত্ব ও নির্ভুলত্ব দাবি করেন। তাঁরা তাঁদের ইলম লাদুন্নী দাবি করে। আমি বুঝি না এগুলির মাধ্যমে কিভাবে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? একজন মানুষ কোনো পাপ করার বা ভুল করার ক্ষমতাই রাখে না। অথবা বিনা কষ্টে ইলম লাদুন্নী লাভে কিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? মানুষের মর্যাদ তো বাড়ে নিজের চেষ্টায় পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের চেষ্টায় ইলম অর্জন করায়। উপরন্তু তাঁরা দাবি করেন যে ইমামগণ সকল গাইবী বিষয় জানেন। যে কুরআন মুমিনদের জন্য নূর ও জ্যোতিরূপে নাযিল হয়েছে সে কুরআনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না। তাহলে আমাদের মনগুলি কিভাবে সায় দেয় যে, আমাদের ইমামদের জন্য এমন বিশেষণ দাবি করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষণের চেয়েও বড়?

ইমাম ড. মুসাবী বলেন: শীয়াদের মধ্যে ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে যে অতিভক্তি ও সীমালঙ্ঘন বিদ্যমান তার অন্যতম দিগগুলি নিম্নরূপ:

(১) তাঁদের ইসমাত (**عصمة**) বা নিষ্পাপত্ব ও নির্ভুলত্ব দাবি করা
(২) তাদের ইলম লাদুন্নী দাবি করা
(৩) তাদের ইলহাম-ইলকা দাবি করা
(৪) তাদের মুজিযা ও কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করা
(৫) তাদের গাইবী ইলম দাবি করা
(৬) মাযারে চুমু খাওয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর আব্দার করা

তিনি বলেন, সর্বশেষ বিষয়টি অতিভক্তি ও সীমালঙ্ঘনের ব্যবহারিক ও কর্মগত প্রকাশ। এরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের কবরে যেয়ে তাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের হাজত-প্রয়োজন পেশ করছে এবং তা মেটানোর আব্দার করছে, সরাসরি তাদের নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করছে। এছাড়া এ সকল মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়টিও খুবই ব্যাপক। মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়ে আমাদের ফকীহ ও আলিমগণের সাথে আলোচনা ও তর্ক করতে করতে আমি সত্যই বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। তারা একই কথা বারবার বলে এরূপ কর্মের ওজর পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হাজার আসওয়াদ বা কাবাগৃহের কাল পাথরে চুমু খাওয়ার সাথে তারা কবর চুমু খাওয়ার তুলনা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়া হলো বিশেষ স্থানে ও বিশেষ ইবাদতের সুন্নাত, এটি কোনো সাধারণ অনুমোদন বা কর্ম নয়। এ বিষয়ে খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি হাজারে আসওয়াদের সামনে দাড়িয়ে বলেন: " হে পাথর, আমি জানি যে, তুমি পাথর ছাড়া কিছু নও, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ

তোমাকে চুম্বন করেছেন তাই তোমাকে চুম্বন করছি।"

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তাঁর হস্ত চুম্বন করতে দেন নি। বরং তিনি মুসাফাহা করতেন। এছাড়া আমরা কোথাও পড়ি নি যে, ইমাম আলী (রা) কাউকে তাঁর হস্ত বা পরিধেয় চুম্বন করতে দিয়েছেন। একব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিকের লাঠি চুম্বন করে; কারণ লাঠিটি ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। এতে রাগন্বিত হয়ে ইমাম জাফর সাদিক বলেন: "... যা তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না কেন তাকে চুম্বন করছ?"

ইমাম মুসাবী বলেন: আমি অনেক মুসলিম দেশে আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি যে, আমাদের দেশের শীয়াগণ ইমামগণের মাযারে যা করে তারাও তথায় একই কর্ম করে। আমি বিশ্বের অনেক দেশে খৃস্টানদের গীর্জায় গিয়েছি। সেখানেও দেখেছি যে তারা একইরূপ কর্ম করে। অবিকল একইভাবে তারা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতিকৃতি স্পর্শ করে বা মরিয়ম (আ)-এর পায়ের কাছে বসে বরকত গ্রহণ করছে। এরা মহান আল্লাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ঈসা মসীহ ও মরিয়ম (আ) এর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের হাজত পেশ করছে এবং সাহায্য প্রার্থনা করছে। আমি বৌদ্ধদের, শিনটোদের, হিন্দুদের এবং শিখদের মন্দির বা ধর্মালয়ে গিয়েছি। মুসলিম সমাজের মাযারে এবং খৃস্টানদের গীর্জায় যা দেখেছি এ সকল মন্দিরে বা ধর্মালয়েও তাই দেখেছি। এরা সকলেই একই ভাবে মাযার বা প্রতিকৃতির সামনে নযর-মানত বা উৎসর্গ পেশ করছে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার আব্দার করছে। মাযার-প্রতিকৃতিতে চুম্বন করছে, মাথা ঝুকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে এবং এগুলির সামনে বিনয়, ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে।

এভাবে আমি দেখেছি যে, অলীক কল্পনা ও মিথ্যা ধারণার মধ্যে সাতার কাটছে মানবতা। ...অথচ কুরআন এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। একদিকে বারংবার উল্লেখ করেছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কোনো গাইবী ইলম বা ক্ষমতার মালিক নন, অপরদিকে বারংবার বলা হয়েছে যে, একমাত্র মহান আল্লাহই সব জানেন এবং সব ক্ষমতার মালিক এবং কেবলমাত্র তাঁর কাছেই তোমরা সাহায্য চাও। আল্লাহ বলেছেন:

(১) "বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।"[৮২৩]

(২) "বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই অনুসরণ করি।"[৮২৪]

(৩) "বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[৮২৫]

(৪) "আমার বান্দাগণ যখন আমর সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।"[৮২৬]

(৫) "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"[৮২৭]

ড. মূসাবী বলেন, এ ঘৃণ্য অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের (শীয়া সম্প্রদায়ের) আলিমদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আমাদের পুস্তকগুলিকে যাচাই বাছাই করে অশুদ্ধ ও জাল কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ক বিভিন্ন মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।[৮২৮]

৫. ৪. ৫. শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা

আমরা দেখেছি যে, ইহূদী, খৃস্টান এবং মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ ও প্রকৃত বা কাল্পনিক ওলীগণের ইবাদত করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল বান্দাকে মহান আল্লাহ কিছু 'ক্ষমতা' প্রদান করেছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়। এদের সুপারিশ আল্লাহ শুনেন। এরূপ রুবূবিয়্যাতের শিরকের ভিত্তিতে তারা ইবাদতের শিরক করত। তারা সাধারণ বিপদ আপদ ও প্রয়োজনে এদেরকে ডাকত, এদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করত, এদের নামে মানত, নযর, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি করত, এদের মুর্তি বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে সাজদা করত, এদের উপর তাওয়াক্কুল করত, ভয়, ভালবাসা, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিরক করত।

ইহূদী ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের অনুসারী এ সকল বিভ্রান্ত শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা অবিকল একই যুক্তিতে এবং একই প্রকারের শিরক মুসলিম সমাজে প্রচলন করে। তবে স্বভাবতই তারা তাদের অনুসারীদের বুঝান যে, এ সকল বিষয় কখনোই শিরক নয়। বরং এগুলি নবী, নবী বংশের মানুষদের ও ওলীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন মাত্র। আর যারা এভাবে নবী-পরিবার, ইমামগণ বা ওলীগণের বিষয়ে 'শুভধারণা' পোষণ করে না, তাদের ডাকে না বা তাদের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি আল্লাহকে ডাকে তারা বেয়াদব ও

নবী-বংশের অবমাননাকারী।

ক্রমান্বয়ে সাধারণ মুসলিম সমাজেও এদের যুক্তিগুলি প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। সাধারণত শিরকের দ্বারা যারা জাগতিক ভাবে লাভবান হন সে সকল মানুষেরা এবং অনেক সরলপ্রাণ নেককার মানুষ ও আলিম বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এ সকল শিরককে বৈধতা প্রদান করতে থাকেন। তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাতকে প্রশংসা করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মাত বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত হক্কের উপর থাকবে। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ উম্মাতের মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করবে না। তৃতীয় অধ্যায়ে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।"

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

"শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসাল্লীগণ তার ইবাদত করবে। তবে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হানাহানি থাকবে।"[৮২৯]

তারা দাবি করেন যে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রবেশ করবে না। বস্তুত এসকল সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের অর্থ সাধারণভাবে উম্মাতের মর্যাদা প্রকাশ করা। উম্মাতের মধ্যে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক থাকবে না, কেউ কুফরী, শিরক বা নিফাকে লিপ্ত হবে না এরূপ কথা এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণ করা একান্তই বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। অন্যান্য অগণিত হাদীসে বিভ্রান্তির কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, ভণ্ড নবীগণ, মুরতাদগণ ও বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আরব উপদ্বীপে ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই শয়তানের ইবাদত করেছে এবং শিরক-কুফরে লিপ্ত হয়েছে।

শিরকী কর্মগুলির পক্ষে তাদের কেউ বলতে থাকেন যে, আল্লাহকে যতক্ষণ রাব্বুল আলামীন বা একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করছে ততক্ষণ তাকে মুশরিক বলা যায় না। কেউ বলেন, নবী-বংশের ইমামগণ বা ওলীগণকে তো এরা স্রষ্টা বা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে না, এরা স্বয়ং কোনো ক্ষমতা রাখেন তাও বলে না। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর ক্ষমতাতেই তারা ক্ষমতাবান এবং আল্লাহই তাদের এরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজেই এ বিশ্বাস শিরক নয়। আমরা দেখেছি যে, এগুলি যদি শিরক না হয় তবে ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদেরকেও মুশরিক বলা যায় না। তারা সুস্পষ্টভাবেই মহান আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত এবং শরীকগণকে আল্লাহই ক্ষমতা দিয়েছেন বলে দাবি করত। কিন্তু কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিভিন্ন মতামতের প্রাধান্যের কারণে অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনেকে বলেছেন যে, এরা যখন ইমামগণ বা ওলীগণকে ডাকে বা তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায় তখন মূলত আল্লাহর কাছেই চায়, এ সকল নেক মানুষের নাম নিয়ে মূলত এদের ওসীলা দিয়ে তারা আল্লাহর কাছে চায়। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর কারো কাছে চাওয়ার মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য। কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ, আলী (রা) বা অমুকের ওসীলায় আপনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন, তবে সে মূলত আল্লাহর নিকটেই চাচ্ছে, ওসীলা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। আর যে বলছে, হে আলী, হে আবুল খামীস, হে আব্বাস, হে অমুক আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, সে মূলত তার আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করছে তার ইবাদত করছে।

৫. ৪. ৬. সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ

সবচেয়ে বড় কথা যে, এ সকল বিশ্বাস ও কর্মের প্রয়োজন কী? কুরআনে কি এরূপ বিশ্বাস বা কর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন? কুরআনে ও হাদীসে যতটুকু আছে তার অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার কী? সাহাবীগণ কি এরূপ করতেন? নবী, ওলী, কারামত, আহলু বাইত ইত্যাদির বিষয়ে সাহাবীগণ কি বলতেন? কি করতেন? কিভাবে তাঁরা ভক্তি প্রকাশ করতেন? অবিকল তাঁদের মত বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সকল কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয় তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন কী?

বস্তুত, মুমিনের নাজাতের একটিই পথ, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসা। বিশ্বাসে, কর্মে ও কথায় সুন্নাত ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণই নাজাতের একামত্র সুনিশ্চিত পথ। সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৪. ৭. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর অভিমত

শীয় সমাজগুলিতে এবং অন্যান্য সমাজে প্রচলিত শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে শীয়া ইমাম ড. মূসা আল-মুসাবীর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। 'সুন্নী' সমাজগুলির মধ্যে প্রচলিত শিরকের উন্মেষ ও প্রচলন সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর (রাহ) কিছু বক্তব্য আমরা আলোচনা করব।

তিনি তাঁরা 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে তিনি আরবের মুশরিকদের শিরক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: "শিরক হলো আল্লাহর জন্য নির্ধরিত কোনো বিশেষণ বা গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করা। যেমন নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টিজগতের

পরিচালনার ক্ষমতা, যে ক্ষমতাকে 'হও বললে হয়ে যাওয়া' বলা হয়, অথবা নিজস্ব ইলম বা জ্ঞান, যে জ্ঞান চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত নয়, জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বা স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমেও প্রাপ্ত নয়, বা অনুরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা আত্মীক কোনো সূত্র বা মাধ্যম ছাড়া নিজস্ব সত্তাগত জ্ঞান, অথবা অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার ক্ষমতা, অথবা কারো উপর অলৌকিক ক্রোধ বা অভিশাপের ক্ষমতা, যে ক্রোধ বা অভিশাপের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র, অসুস্থ বা হতভাগ্য হয়ে যাবে, অথবা কোনো ব্যক্তিকে করুণা করার বা তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা যে করুণা বা সন্তুষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনী, সুস্থ বা সৌভাগ্যবান ও নিরাপদ হয়ে যাবে। এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই। তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত। কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন।

... এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে পারে। আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ..... হে পাঠক, মুশরিকদের আকীদা ও কর্ম সম্পর্কে এ সকল বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনি নিশ্চিত হতে চান তবে এ যুগের কুসংস্কারগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। বিশেষ করে যার মুসলিম দেশের প্রান্তে বা সীমান্তে বসবাস করে। লক্ষ্য করে দেখুন যে, ওলী বা বেলায়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? তারা প্রাচীন ওলীগণের বেলায়াতের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বর্তমানে আর এভাবে ওলী হওয়া তারা সম্ভব বলে মনে করে না। তারা কবর ও ওলীদের দরজায় যেয়ে পড়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক, বিদ'আত ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের মধ্যে তারা নিমগ্ন।

আরবের মুশরিকগণ যেভাবে ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিকৃত করেছিল এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করেছিল অনুরূপ বিকৃতি ও তুলনার মধ্যে এরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে।"[৮৩০] এ হাদীসটি এদের বিষয়ে পুরোপুরিই খাটে। পূর্ববর্তী মুশরিকগণ যত প্রকারের বিভ্রান্তি বা ফিতনায় নিপতিত হয়েছিল সেগুলির সবই মুসলিম নামধারী কোনো না কোনা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। তারা এসকল শিরকের গভীরে নিমজ্জিত রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।"[৮৩১]

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে ইহূদীদের বিভ্রান্তি আলোচনার পর বলেন: "সর্বাবস্থায়, পাঠক যদি ইহূদীদের এ সকল বিভ্রান্তির নমুনা মুসলিম উম্মাহর মধ্য দেখতে চান তবে অসৎ আলিমগণ এবং দুনিয়ার স্বার্থের অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকান। পিতা-পিতামহদের অন্ধ অনুকরণ এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়কর্ম। মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর মহান রাসূলের ﷺ সুন্নাত এরা ততটা গুরুত্ব দেয় না। আলিমগণ নিজস্ব মতামত, যুক্তিতর্ক, অকারণ বাড়াবাড়ি ও গভীরতার নামে সে সকল মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলিই তাদের দলিল, অথচ কুরআন ও সুন্নাতে এ সকল মতামতের কোনোরূপ সূত্র বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রমাণিত ও সহীহ বাণী বাদ দিয়ে জাল, বানোয়াট বা মাউযূ হাদীসের উপর নির্ভর করে এবং ভিত্তিহীন বাজে ব্যাখ্যা ও তাফসীরের পিছনে দৌড়ায়।"[৮৩২]

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি আলোচনা করে বলেন: "আপনি যদি এ সকল বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টদের নমুনা নিজের কাওমের মধ্যে দেখতে চান তবে আপনার সমাজের 'ওলী-আল্লাহ'দের সন্তানদের অনেকের দিকে তাকান। তাদের বিষয়ে এদের ধারণা ও আকীদা পর্যালোচনা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কোন্ পর্যায়ে এরা পৌঁছেছে। 'আর অচিরেই জালিমগণ জানবে যে, তাদের কি পরিণতি হবে[৮৩৩]।"[৮৩৪]

৫. ৫. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর

ইতোপূর্বে আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎকালীন আরব ও ইহূদী খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর আর সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। কারণ এগুলির আলোকে সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা খুবই সহজ। তা সত্ত্বেও এখানে শীয়াগণ এবং সমমনা মানুষদের প্রচারিত বিভিন্ন শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

৫. ৫. ১. রুবূবিয়্যাতের শিরক

আমরা ইতোপূর্বে রুবূবিয়্যাতের তাওহীদ এবং রুবূবিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আালোচনা করেছি। রুবূবিয়্যাতের বা প্রতিপালনের তাওহীদের মূল হলো, যে এ বিশ্ব পরিচালনা, সৃষ্টি, বিনাশ, ধ্বংস, রিয্ক, সম্পদ, সুস্থতা, অসুস্থতা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহরই। এ ক্ষমতায় কেউ তার শরীক নয় এবং তিনি

নিজেও কাউকে কখনো তাঁর এ ক্ষমতায় শরীক করেন নি। আল্লাহর নবীগণ, ওলীগণ, ফিরিশতাগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ এ সকল বান্দাকে ভালবাসেন, দয়া করে তাঁদের দু'আ ইচ্ছা করলে কবুল করেন, তাঁদেরকে ইচ্ছা করলে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন, ইচ্ছ করলে তাদের সুপারিশ কবুল করতে পারেন, তবে কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন নি, তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদেরকে কোনো ক্ষমতা দেন নি। আর কোনো মানুষকে তিনি কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কিছুই দেন নি।

আর এ পর্যায়ের শিরকের মূল হলো মুজিযা, কারামত, শাফা'আত বিষয়ক আয়াত, আল্লাহর মাহবূবিয়্যাত বিষয়ক কথা ইত্যাদিকে পূজি করে একথা মনে করা যে, আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো বিশেষ কর্মের কারণে বা বিশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ থেকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা, বিশ্বপরিচালনায় হস্তক্ষেপ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা লাভ করেছেন, করেন বা করবেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও যুক্তি এবং কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আমরা দেখেছি। এখন আমরা এ বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু বিষয় আলোচনা করব।

৫. ৫. ১. ১. ক্ষমতা বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূবে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের শিরক। আরবের মুশরিকগণ এ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করত, তবে আল্লাহ তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে এরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েছে বলে বিশ্বাস করত। শীয়াদের মধ্যে আলী (রা), তাঁর বংশের ইমামগণ, ইমামগণের খলীফাগণ, তাদের মধ্যকার ওলী-আল্লাহগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে এমন অগণিত উদ্ভট কল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, এ সকল মানুষ এরূপ কিছু ক্ষমতা রাখেন। শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও এরূপ শিরকী বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরের পরে, ক্রুসেড ও তাতার আক্রমন চলাকালীন ও পরবর্তী সময়গুলিতে লেখা আওলিয়াগণের জীবনী, তাঁদের নামে প্রচলিত অনেক কথাবার্তা থেকে এরূপ অনেক বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মেছে। মূলত এ সকল গল্প,কাহিনী ও এ সকল যুগের কোনো কোনো আলিমের কথাই এ সকল শিরকের পক্ষের 'দলীল'।

আমরা জানি যে, ইবাদতের শিরক বা কর্মের শিরকের উৎস হলো রুবূবিয়্যাতের শিরক বা আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো কল্যাণ বা অকল্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এরূপ বিশ্বাসই মানুষকে এরূপ ক্ষমতাধরকে ইবাদত করতে বা তাঁকে 'চূড়ান্ত ও অলৌকিকভাবে ভক্তি করতে ও তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ' করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য কুরআন কারীমে এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দূর করা হয়েছে। বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিষয়েও বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁর দায়িত্ব প্রচার ও দীন প্রতিষ্ঠা। কারো হেদায়াত, ভাল, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির কোনোরূপ দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেন নি। কুরআন কারীমের এ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি।

কুরআন কারীম ও তদসঙ্গে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলির পাঠ ও অধ্যয়নের অভাবই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এরূপ শিরকের প্রসারের মূল কারণ। এজন্য এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে যারা প্রচার করেন তারা কখনোই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে একটি সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যও পেশ করতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ অমুক আয়াতে বলেছেন বা অমুক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে বিশ্ব পরিচালনা বা কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন বা করেছেন, অথবা অমুক পর্যায়ে যে ব্যক্তিই পৌঁছাবে সে ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমুক পর্যায়ের ক্ষমতা লাভ করবে....। এ বিষয়ে যা কিছু 'দলীল' পেশ করা হয় সবই ইসলামের বরকতময় যুগগুলির পরে শীয়াদের প্রভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জনশ্রুতি, গল্প-কাহিনী, বিভিন্ন বুজুর্গের নামে প্রচারিত কথাবার্তা ও পরবর্তী যুগগুলির কোনো কোনো আলিমের মতামত মাত্র, যা সবই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে, অসংখ্য সহীহ মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসের সুস্পস্প ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীতে কথিত এ সকল ভিত্তিহীন বানোয়াট কথার উদ্ধৃতি দেওয়া, আলোচনা করা বা খণ্ডন করাও পাগলামি বলে মনে হয়। যেমন তারা বলেন: "আল্লাহ বলেছেন: হে মুহাম্মাদ (ﷺ), সবাই আমার সন্তুষ্টি তালাশ করে, আর আমি আপনার সন্তুষ্টি তালাশ করি, আমি আরশ থেকে ফারাশ পর্যন্ত আমার সকল রাজত্ব আপনার জন্য উৎসর্গ করেছি। আপনার হুকম চন্দ্র ও সূর্যের উপর কার্যকর; আপনার পুত্র আব্দুল কাদির জীলানীকে সালাম না দিয়ে সূর্য উদিত হতে পারে না। ...।"

সম্মানিত পাঠক, এ কথাগুলির বিষয়ে আপনি কী বলবেন? মহান আল্লাহ এ কথাগুলি বলেছেন তা আমরা কিভাবে জানলাম? আমরা জানি যে, কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদি ইসলামের কোনো দলীল নয় এবং আকীদার ভিত্তি নয়। নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহর কোনো কথা আমরা জানতে পরি না। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপরে যে ওহী নাযিল করেছেন- কুরআন ও হাদীস- তার মধ্যে এ কথা কোথাও নেই। তাহলে কি তাঁরা মনে করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবীর নিকট এ কথাগুলি আল্লাহ ওহী করে জানিয়েছিলেন? না হলে আমরা কিভাবে জানলাম? বিশেষত কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ যা কিছু বলেছেন সব কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক এ কথাগুলি। কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমে চাঁদ-সূর্য ও সকল কিছু চলে, মহাবিশ্বের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ভালমন্দ বা বিশ্ব পরিচালনার কোনো ঝামেলা

প্রদান করেন নি। এমনকি বদদোয়া করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এ সকল কথার বিপরীতে এ কথাগুলি মহান আল্লাহর নামে যারা বলতে পারেন তাঁদের সাথে আপনি কি কথা বলবেন? এ বিষয়ে ও অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁদের সকল বক্তব্য ও সকল দলীলেরই অবস্থা এই।

এমনকি কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকেও এ সকল কথার কোনোরূপ সামান্যতম সমর্থন পাওয়া যায় না। মুসলিম উম্মাহর ফিতনার যুগে কোনো ভাল বা খারাপ মানুষ এগুলি বলেছেন। এর বিপরীত, এর সাথে সাংঘর্ষিক, এগুলি খণ্ডন করে, এগুলি সমর্থন করে অথবা এর চেয়েও অনেক বাড়াবাড়ি কথা তাদের মত আরো অনেক ভাল ও মন্দ মানুষে বলেছেন। যারা বলেছেন তাদের জন্য আমরা সুধারণা পোষণ করতে পারি, ওজর সন্ধান করতে পারি, কিন্তু কখনোই কুরআন ও হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এ সকল কথাকে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি বানাতে পরি না।

৫. ৫. ১. ২. ইলম বিষয়ক শিরক

ইলমুল গাইবের দাবি কখন ও কিভাবে শিরক বা কুফর বলে গণ্য তা আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। ইহূদী আব্দুল্লাহ্ বিনু সাবা এবং তাঁর অনুসারীদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে শীয়াগণ আলী (রা), তাঁর বংশের ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে ইলমুল গাইবের বিশ্বাস পোষণ করে। এ বিষয়ে শীয়া ইমাম ড. মুসাবীর বক্তব্য আমরা উপরে দেখেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলম বিষয়ক আলোচনায় এবং এ অধ্যায়ে রুবূবিয়্যাতের শিরক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করেছি। এ সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে শীয়াগণ এবং তাদের সমমনা ও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত সুন্নী সমাজের এ শ্রেণীর মানুষেরা যা কিছু বলেন তা সবই উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্যের মত আজগুবি ও বানোয়াট কথাবার্তা, গল্প কাহিনী, কাশফ বা স্বপ্নের কথা এবং কোনো কোনো আলিমের মতামত ও ব্যাখ্যা মাত্র। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট অন্য কোনো নির্দেশনা আলোচনা করা ও সমন্বয় করা যায়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে এরূপ গল্প-কাহিনী, স্বপ্ন, কাশফ বা আলিমগণের মতামত আলোচনা করা মূলত কুরআন-হাদীসের সাথে বেয়াদবী এবং সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন:

تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر، لقوله تعالى (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ)...

"ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণক-জ্যোতিষী গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফ্রী; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন[৮৩৫]: "বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[৮৩৬]

তিনি আরো বলেন:

اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمهم الله أحياناً. وذكر الحنفية تصـريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي ﷺ يعلم الغيب؛ لمعارضة قوله تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ)...".

"জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী, কারণ তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘষিক[৮৩৭]: "বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[৮৩৮]

৫. ৫. ১. ৩. ওসীলা বিষয়ক শিরক

ওসীলা বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা সমাজে বিদ্যমান। ওসীলা কখনো ইসলাম নির্দেশিত বা সুন্নাত-সম্মত কর্ম, কখনো সুন্নাত বহির্ভুত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম এবং কখনো তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে বা উলূহিয়্যাতে শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান গুণাবলি, তাঁর পবিত্র নামসমূহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমানের ওসীলা দিয়ে সকাতরে আর্জি করি যে, তিনি যেন সঠিকভাবে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার এবং ব্যাখ্যা করার তাওফীক আমাকে প্রদান করেন।

'ওসীলা' শব্দটির বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে। সময়ের আবর্তনের কারণে একই ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আবার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গমনের কারণেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বাংলা ভাষায় এক শতাব্দী আগে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ ছিল সংবাদ। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন। কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় 'লাবান' অর্থ দুধ। কিন্তু বর্তমানে আরব দেশে 'লাবান' অর্থ ঘোল।

ভাষান্তরের কারণে অর্থের পরিবর্তন খুবই বেশি। আরবীতে 'জিন্‌স' অর্থ শ্রেণী বা লিঙ্গ, কিন্তু বাংলায় 'জিনিস' অর্থ এগুলির কিছুই নয়, বরং বাংলায় এর অর্থ দ্রব্য বা বস্তু। আরবীতে ও ফার্সীতে নেশা বা নাশওয়া অর্থ 'মাতলামী' বা মাদকতা। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ মাদকতা হয় আবার অভ্যস্ততাও হয়। একারণে অনেক সময় আমরা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়ে যায়। কেউ বলেন, নেশা হারাম। উত্তরে অন্যে বলেন, ভাত, চা ইত্যাদিও তো নেশা? বস্তুত বাংলা 'নেশা' বা অভ্যস্ততা হারাম নয়, বরং ফার্সী নেশা বা মাতলামী ও মাদকতা হারাম। অভ্যস্ততা হারাম বা হালাল হবে অভ্যাসের বিষয়ের বিধান অনুসারে, আর মাদকতা সর্বাবস্থায় হারাম।

৫. ৫. ১. ৩. ১. কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ওসীলা

'ওসীলা' শব্দটির অর্থের মধ্যে এরূপ বিবর্তন ঘটার কারণে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। ফলে সুন্নাত ও ইসলাম সম্মত ব্যবহার থেকে ওসীলা শব্দটি কখনো কখনো শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত প্রাচীন আরবী ভাষায় ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য। পরবর্তীকালে আরবী ভাষাতেই ওসীলা শব্দটির অর্থ হয় 'যদ্বারা নৈকট্য চাওয়া হয়' বা 'নৈকট্যের উপকরণ'। আধুনিক যুগে আরবীতে এবং বিশেষ করে বাংলায় ওসীলা শব্দটি 'উপকরণ', মধ্যস্থতা, যন্ত্র, হাতিয়ার, দূত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের পরিবর্তনের কারণে শব্দটির বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: "ওয়াও, সীন ও লাম: দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশ করে: প্রথম অর্থ: আগ্রহ ও তালাশ। ... দ্বিতীয় অর্থ চুরি করা।"[৮৩৯]

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির ও ভাষাবিদ রাগিব ইসপাহানী (৫০৭) বলেন: "ওসীলা: অর্থ আগ্রহের সাথে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: 'তোমরা তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর'। আল্লাহর দিকে ওসীলার হাকীকাত হলো ইলম ও ইবাদতের মাধ্যমে এবং শরীয়তের মর্যাদাময় বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ হলো নেক আমল বা নৈকট্য।"[৮৪০]

আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, মহান আল্লাহ তাঁকে 'ওসীলা' প্রদান করবেন। স্বভাবতই এখানে ওসীলা অর্থ উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং ওসীলা অর্থ নৈকট্য। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ নৈকট্য ও নিকটতম মর্তবা প্রদান করবেন।

'ওসীলা' শব্দটি কুরআনে দু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"বল, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।' তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।"[৮৪১]

এখানে আরবী জ্ঞাত পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, 'তারা ওসীলা সন্ধান করে কে কত নিকটতর', এ কথটির মধ্যে প্রথমে 'ওসীলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরে 'কুরবাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের ব্যবহার থেকেই সুস্পষ্ট যে, ওসীলা ও 'কুরবাহ' শব্দদ্বয় সমার্থক এবং ওসীলা সন্ধানের অর্থ নৈকট্য লাভের চেষ্টা।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৮৪২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি) বলেন:

وابتغوا إليه الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه ومعناه بما يرضيه والوسيلة هي الفعلية من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه

"তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর। এর অর্থ: তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান কর,অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে। ওসীলা শব্দটি 'তাওয়াস্‌সালতু' কথা থেকে 'ফায়ীলাহ' ওযনে গৃহীত ইসম। বলা হয় 'তাওয়াস্‌সালতু ইলা ফুলান বি-কাযা, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ করে অমুকে নিকটবর্তী হয়েছি।"[৮৪৩]

এরপর ইমাম তাবারী বিভিন্ন জাহিলী কবির কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, ওসীলা শব্দটির অর্থ নৈকট্য। অতঃপর তিনি

সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের মতামত সনদ সহ উদ্ধৃত করেন। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), তাবিয়ী আবূ ওয়ায়িল, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ, মুজাহিদ ইবনু জাবর, হাসান বাসরী, আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর, সুদ্দী আল-কাবীর, ইবনু যাইদ, প্রমুখ মুফাস্‌সির থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, সকলেই বলেছেন 'তাঁর ওসীলা সন্ধান কর' অর্থ তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য ও রেযামন্দিমূলক নেককর্ম করে তাঁর নৈকট্য ও মহব্বত লাভে সচেষ্ট হও।[৮৪৪]

এ আয়াতটি মূলত মুমিনের সফলতার মূল কর্মগুলি বর্ণনা করেছে: (১) ঈমান, (২) তাকওয়া, (৩) অতিরিক্ত নেককর্ম ও (৪) জিহাদ। নিজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত অর্জন করা। তাকওয়া মূলত ফরয পালন ও হারাম বর্জনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এরপর অতিরিক্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সর্বোপরি সমাজ, জাতি ও মানবতার জন্য দীন প্রচার, প্রসার, সংরক্ষন ও জিহাদ করতে হবে। ইতোপূর্বে আমরা বেলায়াত সংক্রান্ত হাদীসে বিষয়টি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত লাভ হয়। আর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়াত, নৈকট্য বা ওসীলা লাভের বা মাহবূবিয়্যাত অর্জনের ক্ষেত্রে মুমিনগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

উপরের বিষয়গুলি খুবই স্পষ্ট এবং এ অর্থে বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বা অসীলা সন্ধান করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু পরবর্তীকালে, ওসীলা শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মতভেদ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেগুলির অন্যতম: (১) দু'আর মধ্যে 'ওসীলা', (২) পীর-মাশাইখের 'ওসীলা' ও (৩) উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী অর্থে ওসীলা।

৫. ৫. ১. ৩. ২. দু'আর মধ্যে ওসীলা

মহান আল্লাহর কাছে দু'আর সময় কোনো কিছুর 'দোহাই' দেওয়াকে 'ওসীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দু'আর মধ্যে 'বা' (**البـــاء**) অব্যয়টি ব্যবহার করে দু'আ চাওয়া বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে। এ অব্যয়টির অর্থ দ্বারা, সাহায্যে বা কারণে। যেমন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আয় বলা হয়েছে: হে আল্লাহ, আপনার মহান নামগুলির দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন। আমি আপনার নামগুলি দ্বারা আপনার কাছে দু'আ করছি। আমার অমুক কর্মের দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন... ইত্যাদি। তবে এ অর্থে "হে আল্লাহ, অমুকের ওসীলায় (**بوســـيلة**) কথাটি কোনো হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। এ অর্থে আরবীতে 'বিহাক্কি' (**بحـــق**) অর্থাৎ "অমুক কর্ম বা ব্যক্তির অধিকারের কারণে বা দ্বারা' এবং 'বিহুরমাতি' অর্থাৎ "অমুকের সম্মানে' কথাও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হিসেবে এক্ষেত্রে 'ওসীলা' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় কোনো কিছুর দোহাই বা বা ওসীলা দেওয়া কয়েকভাবে হতে পারে:

(১) মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া।

(২) নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া।

(৩) কারো দু'আর দোহাই দেওয়া।

(৪) কারো ব্যক্তিগত মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া।

প্রথমত: মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া

যেমন বলা যে, হে আল্লাহ, আপনার রহমান নামের গুণে, বা গাফ্‌ফার নামের ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। এরূপ দোহাই দেওয়া কুরআন- হাদীসের নির্দেশ এবং দু'আ কবুল হওয়ার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

"এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে।"[৮৪৫]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০'র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৪৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো মাসনূন দু'আগুলি পাঠ করলে আমরা সেগুলির মধ্যে এরূপ অনেক দু'আ পাই, যাতে আল্লাহর পবিত্র নাম বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এরূপ বিশেষ নাম বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরূপ একটি দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন:

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِـــي عِلْـــمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ....

আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনার একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি

যে,) ... ।[৮৪৭]

আমার লেখা 'রাহে বেলায়ত' পুস্তকে পাঠক এরূপ অনেক মাসনূন দু'আ দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয়ত, নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া

নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতীত যুগের তিনজন মানুষ বিজন পথে চলতে চলতে বৃষ্টির কারণে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবল বর্ষণে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে গুহাটি তাদের জীবন্ত কবরে পরিণত হয়। এ ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা দু'আ করতে মনস্থ করেন। তারা একে অপরকে বলেন:

ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ

"জীবনে সর্বশ্রেষ্ট যে আমল করেছ তদ্বারা (তার ওসীলা দিয়ে) আল্লাহর কাছে দু'আ কর বা তার দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাক।"

তখন তাদের একজন তার জীবনে সন্তানদের কষ্ট উপেক্ষা করে পিতামাতার খেদমতের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ

"হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে আপনি পাথরটি একটু সরিয়ে দেন যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই।"

মহান আল্লাহ তৎক্ষণাৎ তার দু'আ কবুল করে পাথরটি একটু সরিয়ে দেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর এক সুন্দরী প্রেমিকার সাথে ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে পাপ পরিত্যাগ করার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً

"হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) আপনি পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিন।"

মহান আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি দু-তৃতীয়াংশ সরে যায়। তখন তৃতীয় ব্যক্তি নিজের অসুবিধা ও স্বার্থ নষ্ট করে একজন শ্রমিকের বেতন ও আমানত পরিপূর্ণরূপে আদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا

"হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) আপনি পাথরটি সরিয়ে দিন।"

আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি একেবারে সরে যায়।[৮৪৮]

নিজের ঈমান, মহব্বত ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়াও এ প্রকারের ওসীলা প্রদান। বুরাইদাহ আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ করছে নিম্নের কথা দিয়ে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, এ ওসীলায় (এদ্বারা) যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।"[৮৪৯]

এখানে আমরা দেখছি যে, ঈমান ও শাহাদতের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে এরূপ দু'আ করা যায়, যেমন: "হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সেই ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক আমল নেই যে, যার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র দরবারে দু'আ চাইব। শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা ﷺ-এর নামটি ঈমান নিয়ে মুখে নিয়েছি, এর ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর সুন্নাতের মহব্বতটুকু হৃদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল করতে পারিনি, তবে আপনার পথে অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাদের পথে চলতে চাই, আপনি সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন ...।" ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ কারো দু'আর দোহাই দেওয়া

কারো দু'আর ওসীলা দেওয়ার অর্থ এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ, অমুক আমার জন্য দু'আ করেছেন, আপনি আমার বিষয়ে তাঁর দু'আ কবুল করে আমার হাজত পূরণ করে দিন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, নেককার মুত্তাকী মুমিনদের নিকট দু'আ চাওয়া সুন্নাত সম্মত রীতি। এরূপ কারো নিকট দু'আ চাওয়ার পরে মহান আল্লাহর দরবারে উক্ত নেককার ব্যক্তির দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার বিষয়টি একটি হাদীস থেকে জানা যায়। উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন,

أَنَّ رَجُلا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهْ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ (فيحسن ركعتين) وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، (يا محمد) إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ (يا محمد إني أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتِيْ) (فَيُجْلِيْ لِيْ عَنْ بَصَرِي) اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ (وشَفِّعْنِي فِيْهِ) (اللهم شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ)

"একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমনে করে বলে, আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনি বলেনঃ তুমি যদি চাও আমি দু'আ করব, আর যদি চাও তবে সবর কর, সেটাই তোমার জন্য উত্তম। লোকটি বলেঃ আপনি দু'আ করুন। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন, সে যেন সুন্দর করে ওযূ করে (অন্য বর্ণনায়ঃ এবং দু রাকাত সালাত আদায় করে) এবং এই দু'আ করেঃ "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি (মনোনিবেশ করছি) আপনার নবী মুহাম্মাদের দ্বারা, যিনি রহমতের নবী, হে মুহাম্মাদ, আমি মুখ ফিরাচ্ছি (মনোনিবেশ করছি) আপনার দ্বারা আমার প্রতিপালকের দিকে আমার এ প্রয়োজনটির বিষয়ে, যেন তা মেটানো হয়। (অন্য বর্ণনায়ঃ যেন তিনি তা মিটিয়ে দেন, যেন তিনি আমার দৃষ্টি প্রদান করেন।) হে আল্লাহ আপনি আমার বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করুন (অন্য বর্ণনায়ঃ আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন এবং তাঁর জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। অন্য বর্ণনায়ঃ আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন এবং আমার বিষয়ে আমার নিজের সুপারিশও কবুল করুন।)"[৮৫০]

এ হাদীসে অন্ধ লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'আ চেয়েছে। তিনি দু'আ করেছেন এবং তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর দু'আর ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে নিজে দু'আ করতে। লোকটি সেভাবে দু'আ করেছে। তিরমিযীর বর্ণনায় দু'আর ফলাফল উল্লেখ করা হয় নি। তবে অন্যান্য সকল বর্ণনায় রাবী বলেন যে, দু'আ আল্লাহ কবুল করেন এবং লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে পায়, যেন সে কখনোই অন্ধ ছিল না।

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেনঃ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

"উমার (রা) যখন অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হতেন তখন আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে (রা) দিয়ে বৃষ্টির দু'আ করাতেন, অতঃপর বলতেনঃ হে আল্লাহ আমরা আমাদের নবী (ﷺ)-এর ওসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করতাম ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আমাদের নবী (ﷺ)-এর চাচার ওসীলায়, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা) বলেন, তখন বৃষ্টিপাত হতো।"[৮৫১]

আব্বাস (রা) নিম্নের বাক্যগুলি বলে দু'আ করলে আল্লাহ বৃষ্টি দিতেনঃ

اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكانى من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث

"হে আল্লাহ, পাপের কারণ ছাড়া বালা-মুসিবত নাযিল হয় না এবং তাওবা ছাড়া তা অপসারিত হয় না। আপনার নবীর সাথে আমার সম্পর্কের কারণে মানুষেরা আমার মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এ আমাদের পাপময় হাতগুলি আপনার দিকে প্রসারিত এবং আমাদের ললাটগুলি তাওবায় আপনার নিকট সমর্পিত, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।"[৮৫২]

এ হাদীসেও স্পষ্ট যে, আব্বাস (রা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন উমার (রা) আব্বাসের (রা) দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। তাঁর কথা থেকে বুঝা যায় যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত ছিলেন, ততদিন খরা বা অনাবৃষ্টি হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'আ চাইতেন এবং সে দু'আর ওসীলায় আল্লাহ তাদের বৃষ্টি দান করতেন। তাঁর ওফাতের পরে যেহেতু আর তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু তাঁর চাচা আব্বাসের (রা) কাছে দু'আ চাচ্ছেন এবং দু'আর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছেন।

চতুর্থতঃ কোনো ব্যক্তি, তাঁর মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া

আল্লাহর কাছে দু'আ করার ক্ষেত্রে 'ওসীলা' বা দোহাই দেওয়ার চতুর্ত পর্যায় হলো, কোনো ব্যক্তির, বা তাঁর মর্যাদার বা তাঁর অধিকারের দোহাই দেওয়া। যেমন জীবিত বা মৃত কোনো নবী-ওলীর নাম উল্লেখ করে বলাঃ হে আল্লাহ অমুকের ওসীলায়, বা অমুকের

মর্যাদার ওসীলায় বা অমুকের অধিকারের অসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। এরূপ দু'আ করার বৈধতার বিষয়ে আলিমদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। অনেক আলিম এরূপ দু'আ করা বৈধ বলেছেন। তাঁরা সাধারণভাবে উপরের দুটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। বিশেষত তাবারানী ও বাইহাকী অন্ধ ব্যক্তির হাদীসটির প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাদের বর্ণনার সার-সংক্ষেপ যে, খলীফা উসমান (রা)-এর সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে একটি প্রয়োজনে যায়। কিন্তু খলীফা তার প্রতি দৃকপাত করেন না। লোকটি উসমান ইবনু হানীফের (রা) নিকট গমন করে তাকে খলীফা উসমানের নিকট তার জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ করে। তখন উসমান ইবনু হানীফ লোকটিকে অন্ধ লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দু'আটি শিখিয়েছিলেন সে দু'আটি শিখিয়ে দেন। লোকটি এভাবে দু'আ করার পরে খলীফা উসমান (রা) তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।[৮৫৩]

এ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর ওসীলাই নয়, উপরন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরেও তাঁর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, সাহাবী, তাবিয়ী বা ওলী-আল্লাহর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনো কথা কোনো হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে এ মতের আলিমগণ সকলকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত ও তাঁর সাথে তুলনীয় ধরে এরূপ যে কারো নামের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয বলেছেন।

কোনো কোনো আলিম কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিসত্তার ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা জায়েয বলেছেন। অন্য কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া নাজায়েয বলেছেন। তাঁদের মতে, কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর ওসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয বলার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বাদ দিয়ে অন্য কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ করা তাঁর সাথে বেয়াদবী ছাড়া কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে অন্য অনেক আলিম কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির, তাঁর মর্যাদার বা তাঁর অধিকারের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা অবৈধ ও নাজায়েয বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এরূপ কোনো জীবিত বা মৃত কারো ব্যক্তিসত্তার ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনোরূপ নযির কোনো সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। এছাড়া নবীগণ ও যাদের নাম মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁরা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বা আল্লাহর কাছে তাঁর কোনো বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার আছে। সর্বোপরি তাঁরা উপরে উল্লেখিত উমার (রা) কর্তৃক আব্বাসের ওসীলা প্রদানকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যদি কারো দু'আর ওসীলা না দিয়ে তাঁর সত্তার ওসীলা দেওয়া জায়েয হতো তবে উমার (রা) ও সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বাদ দিয়ে আব্বাস (রা)-এর ওসীলা পেশ করতেন না।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গন্থে উমার (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে অসিলা করা শরীয়ত বিরোধী। যদি শরীয়ত সিদ্ধ হইত হযরত ওমর (রা) হুযুর (ﷺ)-কে অসিলা করিয়াই দোআ করিতেন। কারণ, মৃত বা জীবিত যে কোন ব্যক্তির চেয়েই হুযুর (ﷺ)-এর ফযীলত সীমাহীন-অনন্ত। তাহই হযরত ওমর (রা) এই কথা বলেন নাই যে, হে আল্লাহ, ইতি পূর্বে তো আমরা তোমার নবীকে অসীলা করিয়া দোআ করিতাম। কিন্তু এখন তিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই তাই আমরা তাঁহার রুহু মোবারককে অসিলা করিয়া তোমার কাছে আরযী বেশ করিতেছি। তাই কোন মৃত ব্যক্তিকে অসিলা করা মোটেই বৈধ নহে।"[৮৫৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) সকলেই একমত যে কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া মাকরূহ। আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الدَّاعِي: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ، أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ، وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলেছেন: 'আমি অমুকের অধিকার বা আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকার, বা বাইতুল হারামের অধিকার বা মাশ'আরুল হারামের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বা প্রার্থনা করছি' বলে দু'আ করা মাকরূহ।"[৮৫৫]

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন:

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وَبِحَقِّ فُلَانٍ لِأَنَّهُ لا حَقَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ...

"'আমি আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি এবং অমুকের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বলে দু'আ করা মাকরূহ; কারণ মহান আল্লাহর উপরে কারো কোনো অধিকার নেই।"[৮৫৬]

কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা শিরক নয়; কারণ, এতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না বা দু'আ করা হয় না; একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা হয়। এ বিষয়ক বিতর্ক জায়েয-নাজায়েযের মধ্যে সীমিত। কাজেই শিরক প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক বিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না।

পঞ্চমত: আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওসীলার কাছেই চাওয়া

ওসীলা বিষয়ক চূড়ান্ত শিরক হলো ওসীলার নামে ওসীলার কাছেই দু'আ করা বা ত্রাণ, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা। উপরে ওসীলা বলতে যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো কারো ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা। এর বিপরীতে আরেকটি কর্ম হলো, যাকে ওসীলা বলে মনে করা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাকেই ডাকা। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট শিরক।

পরবর্তীতে আমরা তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৫. ১. ৩. ৩. পীর-মাশাইখের ওসীলা

আমরা উপরে দেখেছি যে, আল্লাহ তাঁর ওসীলা বা নৈকট্য সন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী সকল মুফাস্সির একমত যে, নেক আমল হলো ওসীলা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অন্য কোনো মতামত প্রচারিত হয় নি। এরপর কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, 'পীর-মাশাইখ'-ও ওসীলা। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার প্রেক্ষাপট বুঝা যায়। তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এরপর মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় প্রশাসন, শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসে। বিশাল মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি রাজধানী বাদ দিলে সর্বত্র অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, বাতিনী শীয়াগণের প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিরক-কুফর প্রবল হয়ে উঠে। উম্মাতের এ দুর্দিনে সরলপ্রাণ প্রচারবিমুখ সুফী, দরবেশ ও পীর-মাশাইখ আম-জনগনের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে নিরলস চেষ্টা করে যান। তাঁদের সাহচার্যে যেয়ে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, ইসলাম ও ইসলামের হুকুম আহকাম কমবেশি শিক্ষা লাভ করত এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করত। সাধারণ মানুষদের ঈমান, ইসলাম ও আখলাক গঠনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো আলিম মতামত পেশ করেন যে, পীর-মাশাইখের সাহচার্যও একটি বিশেষ নেক আমল যা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এবং স্বার্থান্বেষীদের মিথ্যা প্রচারণার কারণে একথাটি ক্রমান্বয়ে শিরকী অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরবের মুশরিকগণ যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফিরিশতা, নবী, ওলী ও অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করত, ঠিক তেমনি অনেকে পীর-মাশাইখের ইবাদত করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে মনে করতে থাকে। কেউ বা ওসীলা বলতে 'মধ্যস্থতাকারী' বা উপকরণ বলে মনে করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, পীর-মাশাইখ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রহমত পেতে পারে না। এরূপ অনেক শিরকী ধারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ক ধারণাগুলি নিম্নরূপ:

(১) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একটি ওসীলা মনে করা

এ ধারণাটি মূলত ইসলাম-সম্মত। কুরআন ও হাদীসে নেককার মুমিন-মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ওসীলা অর্থ নেক আমল। আর কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে এরূপ মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণ, সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ভালবাসা এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেক-আমল বা ওসীলা।

তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, 'পীর' বলে কোনো বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। বরং আলিম, সত্যবাদী, মুত্তাকী, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। পীর নামধারী ব্যক্তির মধ্যে যদি এ সকল বাহ্যিক গুণ বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচার্য গ্রহণ আল্লাহর নৈকট্য নয়, বরং শয়তানের নৈকট্যের অন্যতম ওসীলা, যদিও এরূপ ব্যক্তি পীর, মুরশিদ, ওলী, বা অনুরূপ কোনো নাম ধারণ করে। আর যদি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত উপর্যুক্ত বাহ্যিক গুণাবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তিনি 'পীর' নাম ধারণ করুন আর নাই করুন তার সাহচর্য মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের ওসীলা বলে গণ্য।

কুরআন, হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মধারার আলোকে পীর-মুরিদীর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি, ভুল-ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' ও 'রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে। সম্মানিত পাঠককে পুস্তকদুটি পাঠ করতে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয়ত, মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তাঁর অসীলা, অন্য কোনো মানুষ বা তার কর্ম নয়। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেককার মানুষদের সাহচর্য গ্রহণই নেককর্ম ও অসীলা। ইসলামী অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির 'ওসীলা' হতে পারে না, কেবলমাত্র মুমিনের নিজের কর্মই তার ওসীলা। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তির জন্য ওসীলা হবেন না যতক্ষণ না সে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করবে এবং তাঁর শরীয়ত পালন করবে। এক্ষেত্রে মূলত মুমিনের ঈমান ও শরীয়ত পালনই ওসীলা। এর কারণে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আত, জান্নাতের সাহচার্য ইত্যাদি নসীব করে দিতে পারেন।

(২) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা মনে করা

অসীলা বিষয়ক বিভ্রান্তিকর ধারণার একটি হলো, পীরের সাহচার্যকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র ওসীলা বলে মনে করা। অগণিত নফল মুস্তাহাব নেক কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক-কর্ম হলো নেককার বান্দাদের সাহচার্য গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে ঈমান ও ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আহকাম মেনে চলাই মূল দীন। নেক-সাহচার্য এ সকল ইবাদত পালনে সহায়ক। সর্বদা কুরআন তিলাওয়া ও অধ্যয়ন করা, হাদীস, সীরাত, শামাইল পাঠ করা, সাহাবীগণের জীবনী পাঠ করার মাধ্যমেও প্রকৃত সাহচার্য গ্রহণ করা যায়।

(৩) পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা

এ বিষয়ক অন্য বিভ্রান্তি হলো, পীরের বেলায়াতকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাস করা। এরূপ বিশ্বাসের কারণে অনেকের ধারণা, আমার নিজের কর্ম যাই হোক না কেন, পীর সাহেব যেহেতু অনেক বড় ওলী, কাজেই তিনি আমাকে পার করিয়ে দিবেন। এরূপ বিশ্বাস কুরআন-হাদীসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, কে বড় ওলী তা নিশ্চিত জানা তো দূরের কথা কে প্রকৃত ওলী বা কে জান্নাতী তাও নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা বাহ্যিক আমলের উপর নির্ভর করে ধারণা পোষণ করি এবং সাহচার্য গ্রহণ করি।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, তাঁর সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবী বা অন্য কাউকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ত্রাণ করতে পারবেন না। প্রত্যেককে তার নিজের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নাজাত লাভ করতে হবে। মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তার নাজাতের ওসীলা। পীরের সাহচর্য থেকে মুমিন আল্লাহর পথে চলার কর্ম শিক্ষা করবেন, প্রেরণা লাভ করবেন এবং নিজে আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন।

এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো যে, মহান আল্লাহ কাউকে শাফা'আত করার উন্মুক্ত অনুমতি বা অধিকার দিয়েছেন বা দিবেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত কাফির-মুশরিক, ফাসিক-খোদদ্রোহী যাকে ইচ্ছা ত্রাণ করবেন। বস্তুত কারো সুপারিশ আল্লাহ শুনবেনই বা আল্লাহ তাকে ইচ্ছামত সুপারিশ করা অধিকার দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় শিরক করা। এ বিশ্বাসটি মূলত আরবের মুশরিকদের 'শাফা'আত' বিষয়ক বিশ্বাসের মত।

(৪) ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা

ওসীলা বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি হলো ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা। আমরা ইতোপূর্বে ওসীলা শব্দটির অর্থ ও তার বিবর্তন আলোচনা করেছি। কুরআনে মুমিনকে নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে কোনো অতিরিক্ত উপকরণ তালাশ করতে বলা হয় নি। উপকরণ দু প্রকারের: জাগতিক ও ধর্মীয়। জাগতিক উপকরণ সকলেই জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানে। যেমন ভাত সিদ্ধ হওয়ার উপকরণ পানি ও আগুণ, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার উপকরণ মাটি, পানি ও আলো। আর ধর্মীয় উপকরণ একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যায়। যেমন ওযূ করা সালাত কবুল হওয়ার উপকরণ, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া নেক আমল কবুল হওয়ার উপকরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও মানুষের উপকার করা রিযক বৃদ্ধির উপকরণ। পীরের সাহচর্য লাভ, মুরীদ হওয়া ইত্যাদি কোনো নেক আমল কবুল হওয়া, দু'আ কবুল হওয়ার উপকরণ নয়। কারণ কুরআন-হাদীসে কোথাও তা বলা হয় নি। এরূপ ধারণা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা এবং তা পরবর্তী শিরকী বিশ্বাসগুলি পথ উন্মুক্ত করে।

(৫) পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মনে করা

ওসীলা বিষয়ক শিরকী বিশ্বাসের অন্যতম হলো পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করা। দুভাবে এ বিশ্বাস 'প্রমাণ' করা হয়: প্রথমত কুরআনের অর্থ বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশরিকদের মত 'যুক্তি' পেশ করা। প্রথম পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে 'আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তাঁর কাছে যেতে, কাজেই সরাসরি তাকে ডাকলে হবে না। আগে ওসীলা ধরো।' এভাবে তারা কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করেন। বিকৃতির মূল ভিত্তি ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে। কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য এবং অসীলা সন্ধানের অর্থ মুমিনের নিজের নেক কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান। আর এরা বুঝান ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন, তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারেও পীর বা ওলীগণের রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন। পীর, বা ওলীর সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোনো দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না। বান্দা যতই আল্লাকে ডাকুক বা ইবাদত করুক, যতক্ষণ না তা 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে' অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তাঁর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে পীর ও ওলীগণ উকিল-ব্যরিষ্টারি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(ক) আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ছিল তাদের সকল শিরকের মূল।

(খ) এ সকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কোথাও ঘুনাক্ষরেও বলেন নি যে, তাঁর কাছে যেতে বা দু'আ কবুল হতে কখনো কারো সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন লাগবে। বরং বারংবার বলেছেন যে, তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে এবং বান্দা ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া দেন।

(গ) জাগতিক রাজা-বাদশাহর দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়, তার নিজের দরবারের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না, কারণ তিনি নিজেই তাকে ভালভাবে চেনেন। আল্লাহর সকল বান্দাই তাঁর দরবারের আপনজন। কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে আরেক চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে কেন?

(ঘ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ তার দেশের সবাইকে চেনেন না। যে ব্যক্তি তার দরবারে কিছু প্রার্থনা করতে গিয়েছে সে কি প্রতারক, মিথ্যবাদী না সত্যবাদী তা তিনি জানেন না। এজন্য তাকে আমলাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। মহান আল্লাহ কি এরূপ? কোনো বান্দার বিষয়ে কোনো পীর, ওলী কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি জানেন?

(ঙ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ ক্রোধ-বশত হয়ত প্রজার উপর কঠোরতা করতে পারেন, এক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলাদের সুপারিশ তার ক্রোধ সম্বরণ করতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ কি তদ্রূপ? মহান আল্লাহর দয়া বেশি না পীর-ওলীগণের দয়া বেশি?

(চ) জাগতিক বিচারালয়ে বিচারক জানেন না যে, সম্পত্তিটি কার পাওনা। উকিল-ব্যারিষ্টার সত্য বা মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও আইনের ধারা দেখিয়ে বিচারককে বুঝাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ কি তদ্রূপ? উকিল সাহেবরা কি মহান আল্লাহকে অজানা কিছু জানাবেন? নাকি তাকে ভুল বুঝিয়ে মামলা খারিজ করে আনবেন? কুরআন কারীমে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসেবে

তিনিই যথেষ্ট (كفى بالله وكيلاً)[৮৫৭] এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উকিল ধরতে নিষেধ করেছেন (ألا تتخذوا من دوني وكيلا)[৮৫৮]। এরপরও কি তাঁর কাছে অন্য কাউকে উকিল ধরার দরকার আছে?

(ছ) মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল। মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা ছাড়া এগুলি কিছুই নয়।

(৬) মধ্যস্ততাকারীকে উলূহিয়্যাতের হক্কদার মনে করা

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নামে ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের ইবাদত করা হলো আরবের মুশরিকদের অন্যতম শিরক যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। এরূপ অনুভুতি নিয়ে পীর-ওলীকে সাজদা করা, তাঁর নাম যপ করা, বিপদে আপদে দূর থেকে তাঁকে ডাকা, তার কাছে ত্রাণ চাওয় ইত্যাদি এ পর্যায়ের শিরক।

৫. ৫. ১. ৪. আল্লাহর হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একটি দিক যে, তিনি তাঁর প্রতিপালিতদের জন্য হুকুম, আহকাম বা বিধিবিধান প্রদান করেন। একমাত্র তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত এবং তাঁর নির্দেশই প্রকৃত হালাল বা হারাম অর্থাৎ বৈধতা ও অবৈধতা প্রদান করে। তাঁর বিধান অন্যান্য করার বৈধতায় বিশ্বাস, তাঁর কোনো বিধানের গ্রহণযোগ্যতায় অবিশ্বাস অথবা তিনি ছাড়া অন্য কেউ বিধান প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি তাঁর প্রতিপালনের তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক কুফর ও শিরক। সমাজে প্রচলিত এ পর্যায়ের শিরকের বিভিন্ন দিক রয়েছে। সেগুলির অন্যতম:

৫. ৫. ১. ৪. ১. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা

কোনো কর্ম যদি কুরআন-হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা পাপ হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে সে পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা বা হাসি-মস্করা করাও কুফ্র। মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন:

استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الاستهانة بها كفر... وكذا الاستهزاء بالشريعة الغراء كفر.

"কোনো পাপ তা সগীরা হোক বা কবীরা হোক, তা যদি সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে পাপ বলে প্রমাণিত হয় তবে তা বৈধ বা হালাল মনে করা কুফর। অনুরূপভাবে কোনো পাপকে হালকা বা গা-সওয়া বলে অবহেলা করাও কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তকে নিয়ে উপহাস বা মস্করা করাও কুফর।"[৮৫৯]

এখানে কুফর ও শিরক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারণ বান্দা আল্লাহর বিধান দানের সার্বভৌম ক্ষমতা ও তাঁর বিধানের অলঙ্ঘনীয়তা অস্বীকার করেছে এবং সাথে সাথেই সে নিজেকে বা অন্য কাউকে বিধান বিচারের বা বিধান প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে।

৫. ৫. ১. ৪. ২. আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস

মহান আল্লাহর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা বা তাঁর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তাঁর উপর আরোপ করা এই পর্যায়ের কুফর ও শিরক।[৮৬০] সমাজে প্রচলিত এ সকল কুফরের মধ্যে রয়েছে, পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, বিভিন্ন ইসলামী আইন, চুরির শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, মদপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের বিধান, তালাকের বিধান বা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত শরীয়তের কোনো বিধানকে নিয়ে উপহাস করা, তামাশা করা, এরূপ কোনো বিধান অচল, অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক বা অনুপযোগী বলে মনে করা, এগুলির প্রতি অন্তরের বিরক্তি বা আপত্তি অনুভব করা, বা এগুলি ইসলামের মধ্যে না থাকলে ইসলাম আরো উন্নত ধর্ম বলে প্রমাণিত হতো বলে মনে করা। এরূপ সকল বিশ্বাস ও ধারণাই উপরের বিশ্বাসের মত কুফর ও শিরক।

৫. ৫. ১. ৪. ৩. আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের বৈধতায় বিশ্বাস

আমরা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিশ্বাসসহ যদি কেউ তার ব্যতিক্রম করে বা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তবে তা পাপ বলে গণ্য হয়, কুফর বলে গণ্য হয় না। কিন্তু এরূপ কর্মে লিপ্ত মানুষ যদি এরূপ ব্যতিক্রম করাকে বৈধ বলে মনে করে তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ এতে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, বিধানদান ও তাঁর বিধানের অলঙ্ঘণীয়তা অস্বীকার করা হয় এবং অন্য কারো আল্লাহর বিধানের পর্যালোচনা বা বাতিল করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

সমাজে এ পর্যায়ের শিরক-কুফরের দুটি প্রকাশ আছে:

প্রথমত: কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে ফকিরী মত সংশ্লিষ্ট অতিভক্তি। এরূপ মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষ মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে করতে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে, তারপর আর তার শরীয়তের বিধিবিধান পালন করা জরুরী থাকে না এবং তার জন্য শরীয়ত লঙ্ঘন করা বৈধ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে কুফর ও শিরক। এরূপ বিশ্বাস

পোষণকারী যদি নিজে শরীয়ত পালন করেন তবুও তিনি কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবেন।

আমরা দেখেছি যে, সমাজে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পরবর্তী যুগের আওলিয়ায়ে কেরামের নামে প্রচলিত অগণিত সত্য-মিথ্যা বানোয়াট ও আজগুবি কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। এ সকল গল্প কাহিনীকে 'দলীল' করে এজাতীয় শিরক বিশ্বাসকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক শিক্ষিত অথচ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের ইসলামী আইন বিষয়ক অনুভূতি। অনেক শিক্ষিত মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এবং ইসলামের কিছু বিধান পালন করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধিবিধান, এগুলির বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের গত হাজার বছরের মিথ্যা প্রচারণার কারণে অনেক সময় ইসলামের কোনো কোনো বিধানকে সময়ের জন্য অনুপোযোগী অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করেন, অথবা অন্য ধর্মের বা সমাজের প্রচলিত বিধানকে উত্তম মনে করেন। এরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর বিধানের ব্যতিক্রম বিচার ফয়সালা প্রদানকে বৈধ এবং কোনো অপরাধ নয় বলে মনে করেন। এরূপ ধারণা কুফর ও শিরক। কেউ যদি ব্যক্তিগত দুর্বলতা, লোভ, অসহায়ত্ব, অজ্ঞতা বা অনুরূপ কোনো কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেন বা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে বিধান বা ফয়সালা প্রদান করেন তবে তা পাপ বলে গণ্য, কুফর বা শিরক নয়। কিন্তু যদি কেউ এরূপ করাকে বৈধ বলে মনে করেন বা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে বলে মনে না করেন তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৮৬১]

এ আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তা হলো, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিধান বা ফয়সালা প্রদান কুফর বলে গণ্য হতে পারে, যে কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধর্মচ্যুত বা মুরতাদ বলে গণ্য হবে, আবার তা কবীরা বা সগীরা গোনাহ বা পাপ বলে গণ্য হতে পারে, এক্ষেত্রে তা কুফর আসগার অর্থাৎ ক্ষুত্রতর কুফর বা রূপক কুফর বলে গণ্য হবে। বিষয়টি নির্ভর করবে বিচারক বা ফয়সালাকারীর অবস্থার উপরে। বিধানটি যে আল্লাহ প্রদান করেছেন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে বিধান বা ফয়সালা প্রদান তার জন্য জরুরী নয়, অথবা সে আল্লাহর নির্দেশিত বিধানটিকে অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে তবে তা কুফর আকবার বা পারিভাষিক কুফ্‌র ও ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা প্রদান জরুরী এবং বিচার্য বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানও সে জানে, কিন্তু সে উক্ত বিধান পরিত্যাগ করে অন্য ভাবে ফয়সালা দান করে এবং স্বীকার করে যে এরূপ করার কারণে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তবে সে পাপী। এরূপ পাপী ব্যক্তিকে রূপক অর্থে বা কুফর আসগরের অর্থে কাফির বলা হয়।

আর যদি সে উক্ত বিষয়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার সাধ্যমত বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে সে ভুল করে তবে সেক্ষেত্রে সে ভুলকারী বলে বিবেচিত। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করার করণে সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে এবং তার ভুলের অপরাধ ক্ষমা করা হবে।"[৮৬২]

৫. ৫. ২. ইবাদাতের শিরক

আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশার সাথে কারো সামনে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। আমরা জানি যে, ইসলামে নবীগণ, আলিমগণ, বয়স্কগণ, নেককার মানুষগণ, পিতামাতা বা শাসক-প্রশাসককে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ও আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছে। এদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে গেলে ভক্তি ও বিনয় আসবেই। পাশাপাশি চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো সামনেই প্রকাশ করা যাবে না। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমারেখা রক্ষা করা না গেলে ইবাদতের শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এ বিষয়ক শিরক আলোচনা আগে এ বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

(১) রুবুবিয়্যাতের শিরক থেকেই ইবাদতের শিরকের উৎপত্তি। কারো মধ্যে 'অলৌকিক' ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করলেই তার প্রতি 'অলৌকিক' ভক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা জন্ম নেয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনোরূপ কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই এবং আল্লাহ কখনো কোনোভাবে কাউকে তা দেন না। শাফা'আত, কারামাত, মুজিযা, দু'আ কবুল সবই মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁরই ইচ্ছাধীন। সর্বদা কুরআন ও হাদীস অর্থসহ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাওহীদের এ বিশ্বস সুদৃঢ় করাই ইবাদতের শিরক থেকে বাঁচার উপায়।

(২) হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ পিতামাতার দু'আ কবুল করেন এবং আরো জানি যে, তিনি তাঁর নেককার প্রিয় বান্দাদের বা ওলীদের দু'আ কবুল করেন। দুটি বিষয়ই হাদীসে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কখনোই আমরা দেখব না যে, কোনো মানুষ তার পিতামাতার কাছে দু'আর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে একজন 'ওলী'-র সামনে বা তার মাজারের সামনে সে 'চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব' প্রকাশ করছে। এর কারণ সে তার পিতামাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানে যে, পিতামাতার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন, তবে করা না করা আল্লাহ ইচ্ছ। আর 'ওলী'র ক্ষেত্রে তার ধারণা যে তাঁর দু'আ কবুল করা আর

সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন নেই, বরং তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ তাঁকে এত ভালবাসেন যে, তাঁর দু'আ তিনি ফেলতে পারবেন না.... ইত্যদি। আর এরূপ ধারণাই শিরকের উৎস।

(৩) কে কার পিতা ও মাতা তা সকলেই সুনিশ্চিতভাবে জানে। পক্ষান্তরে কে ওলী তা কেউই সুনিশ্চিতভাবে জানে না। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শীয়াদের মতামত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাহলে দেখুন! একজন নিশ্চিত জানেন যে, এ ব্যক্তি তার পিতা বা মাতা এবং নিশ্চিত জানেন যে, পিতা ও মাতার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন না। অথচ তিনিই একজন মানুষকে 'ওলী' বলে ধারণা করছেন, যদিও সে ব্যক্তি সত্যই আল্লাহর ওলী কিনা তা কোনোভাবেই তিনি বলতে পারেন না, তারপর তিনি তার বিশেষ অধিকারের ধারণা করছেন এবং এ দুটি 'ধারণা'র ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন।

(৪) ভালবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে ইসলামী অনুভূতি ও শিরকী অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। শিরকী বিশ্বাসে মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি 'ওলী', সাধু, 'সাই বাবা', 'অবতার' বা অনুরূপ কিছু। এ ব্যক্তি হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে। একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করে তাঁর একটু সুনজর লাভ করতে পারলেই তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে আমার কাণ্ডারী হবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

পক্ষান্তরে "ওলী"-র তা'যীমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা। তিনি আমার মালিকের অনুগত গোলাম। আমার মালিকের গোলামিতে তিনি অগ্রসর বলেই আমি তাঁকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক আল্লাহ খুশি হন। আমি আল্লাহর গোলামিকে ভালবাসি। আর তাঁর গোলামিতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসি। তাঁর অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিস্বার্থে ভালবাসি। আমার এই ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এই ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

(৫) ইতোপূর্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে শিরকী কর্মগুলির বর্ণনায় আমরা ইবাদতের শিরকে প্রকারগুলি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, সাজদা, কুরবাণী, উৎসর্গ, জবাই, মানত, দু'আ, ডাকা, ত্রাণ প্রার্থনা করা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালবাসা, আনুগত্য, যিয়ারত, তাবাররুক ইত্যাদি বিষয় শিরকের মূল। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করা, উৎসর্গ, জবাই বা মানত করা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভাবে ডাকা বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো উপর হৃদয়ের প্রগাঢ় ভয় ও ভালবাসাসহ চূড়ান্ত ভক্তিময় তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নিয়ে পথে বের হওয়া, নদীতে ঝাপ দেওয়া, যাত্রা শুরু করা, বাণিজ্য শুরু করা বা যে কোনোভাবে অলৌকিক নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল প্রকাশ করা শিরক। একইভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালবাস শিরক। এছাড়া আল্লাহ ছাড়া কারো চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা শিরক। যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, গুরু, সাঁই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করাকে জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে ... তাহলে নিঃসন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে।

(৬) আরবের কাফিরদের জন্য এবং ইহূদী-খৃস্টানদের জন্য যেমন তা শিরক, তেমনি মুসলিম নামধারী কেউ যদি কোনো নবী, ওলী, মাজার, কবর, স্মৃতিময় দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করে তবে তাও একইরূপ শিরক বলে গণ্য হবে। অজ্ঞতার কারণে কেউ হয়ত মনে করতে পাারেন যে, আরবের মুশরিকগণ এ সকল ইবাদত মূর্তি বা প্রতিমার জন্য করত বলেই কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। নবীগণ ও ওলীগণ তো আর অক্ষম প্রতিমা নন, বরং তাঁর সক্ষম আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা সব শোনেন, দেখেন এবং সুপারিশ করেন, কাজেই তাদেরকে ডাকলে, তাদের উপর তাওয়াক্কুল করলে বা তাদের জন্য মানত করলে অসুবিধা কোথায়। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণেই এরূপ কথা বলা হয়। প্রথমত, যারা মূর্তিপূজা করেন তারা কখনোই মনে করেন না যে, মাটি বা পাথরের মুর্তিটি তাদের ডাক শোনে বা প্রয়োজন মেটায়। বরং তারা মনে করেন যে, এ মূর্তিটি যার, সে ব্যক্তির আত্মাই তাদের ডাক শোনে এবং প্রয়োজন মেটায়। শুধু তার স্মৃতি হিসেবে মূর্তিকে তারা সামনে রাখে। আমাদের দেশের যে কোনো হিন্দু পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেও তা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুর্তি ইত্যাদি জড় পদার্থের পূজা ছাড়াও আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও জিন্নগণেরও ইবাদত করত, খৃস্টানগণ ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর ইবাদত করত, ইহূদীগণ উযাইর (আ)-এর ইবাদত করত। কুরআন ও হাদীসে এদেরকে ডাকা, ত্রাণ চাওয়া, এদের জন্য মানত, জবাই, উৎসর্গ, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি কর্মকে একইভবে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে। উপরে ওসীলা বিষয়ক কুরআনের আয়াতে আমারা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: "বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।'

তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।"[৮৬৩]

সাহাবীগণ উল্লেখ করেছেন যে, কাফিররা যে সকল ফিরিশতা ও জিন্নদের ইবাদত করত তাদের বিষয়ে এ কথা বলা হয়েছে। এ সকল ফিরিশতা বা জিন্ন জীবিত ছিলেন, তাঁরা আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন, কিন্তু কুরআনে তাদের ডাকাকে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে এবং স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, বিপদ কাটানোর বা ত্রাণ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই।

উপরের আলোচনা থেকে সমাজে প্রচলিত ইবাদত বিষয়ক শিরকী কর্মগুলি আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তারপরও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছু শিরকের বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। নিম্নে এ জাতীয় কিছু কর্মের আলোচনা করছি।

৫. ৫. ২. ১. গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল আলিম একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা করাই শির্ক। কারণ, ইবাদত ছাড়া বা চূড়ান্ত ভক্তির প্রকাশ ছাড়া কেউ কাউকে সাজদা করে না। জাগতিক ভয়, ভীতি, সম্মান ইত্যাদির জন্য একজন আরেকজনের পা জড়িয়ে ধরতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একমাত্র অলৌকিক ও অপার্থিব ভক্তি ও বিনয়ের অর্ঘ্য ছাড়া কেউ কারো জন্য সাজদা করে না।

আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন:

والسجود أصل لانه شرع عبادة بلا قيام كسجدة التلاوة، والقيام لم يشرع عبادة وحده، حتى لو سجد لغير الله تعالى يكفر بخلاف القيام.

"সাজদাই হলো মূল; কারণ সাজদা কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়া তদ্রূপ নয়, দাঁড়ানো কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবে শরীয়তে নির্ধারিত নয়। এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে, দাঁড়ানোর বিষয়টি তদ্রূপ নয়।"[৮৬৪]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা যাইলায়ী বলেন: "ইমাম মুহাম্মাদের 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালাতের মধ্যে সাজদাই মুল, কিয়াম বা দাঁড়ানো হলো দাঁড়ানো থেকে সাজদায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ... এর কারণ সাজদাই হলো মাটির উপর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশ করা। এজন্য যদি কেউ মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য দাঁড়ালে বা রুকু করলে কাফির বলে গণ্য হবে না।"[৮৬৫]

হানাফী ফিক্‌হের অন্যতম ইমাম আল্লামা সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেন: "...এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তাযীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাজদা করা কুফ্‌রী।"[৮৬৬]

মুসলিম উম্মাহর অনেক আলিম সাজদাকে দুভাগে ভাগ করেছেন: (১) সুজূদু তাহিয়্যাহ (**سجود تحية**) বা সালামের সাজদা এবং (২) সুজূদু ইবাদাত (**سجود عبادة**) বা ইবাদতের সাজদা। তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের সাজদা করা সরাসরি শির্ক। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালাম-জ্ঞাপক সাজদা করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কাজ, তবে তা সরাসরি শির্ক বলে গণ্য হবে না। যদি কেউ এরূপ হারাম কাজকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে তবে তা কুফ্‌র বলে গণ্য হবে।

কুরআন থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতাগণ আদমকে সাজদা করেন এবং ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁকে সাজদা করেন। তাদের এ সাজদা কিরূপ ছিল তা নিয়ে মুফাস্‌সিরগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন তারা মাটিতে মাথা রেখে পরিপূর্ণ সাজদা করেন এবং কেউ বলেছেন যে, তারা রুকুর মত মাথা ঝুকিয়ে সালাম করেন, আর রুকু করাকেও কুরআন কারীমে সাজদা বলা হয়েছে।[৮৬৭] সর্বাবস্থায় এরূপ সালাম জ্ঞাপক সাজদা বা 'প্রণাম' করা পূর্ববর্তী শরীয়তে বৈধ ছিল, তবে ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে, যেমন ভাইবোনে বিবাহ, দুবোনকে একত্রে বিবাহ, মদপান ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল কিন্তু ইসলামী শরীয়তে হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সম্মান জ্ঞাপক বা সালাম জ্ঞাপক সাজদা করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আবূ হুরাইরা, মু'আয ইবনু জাবাল, সুহাইব, যাইদ ইবনু আরকাম, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, সুরাকা ইবনু মালিক, আয়েশা, ইসমাহ, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা, কাইস ইবনু সা'দ (ﷺ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮৬৮] এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, وفي حديث آخر: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ... وفي حديث آخر: لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ

لبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوْجِهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সাথে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে সাজদা করে। তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ সকল অবলা জীব-জানোয়ার ও বৃক্ষলতা আপনাকে সাজদা করে, কাজেই আমাদেরই অধিকার বেশি যে আমরা আপনাকে সাজদা করব। তখন তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং তোমাদের ভ্রাতাকে সম্মান কর। আমি যদি কাউকে অন্যের সাজদা করতে বলতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে। অন্য হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন: "কারো জন্য বৈধ নয় অন্যকে সাজদা করা", অন্য হাদীসে: কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয় অন্য মানুষকে সাজদা করা; যদি কোনো মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সাজদা করা বৈধ হতো, তবে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।[৮৬৯]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন:

إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ فَقَالَ لأَيِّ شَيْءٍ تَفْعَلُوْنَ هذا قَالُوا هَذِهِ تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ. قُلْنَا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ فَقَالَ: مَا هذا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَقِسِّيسِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَرَأَيْتُ الْيَهُوْدَ يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ فَقُلْتُ لأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هذا وَتَفْعَلُوْنَ هذا قَالُوا هذه تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ قُلْتُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: إِنهم كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، (في روياة ابن ماحه: لاَ تَفْعَلُوا) لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوْجِهَا

"তিনি সিরিয়া গমন করেন। তথায় তিনি দেখেন যে, খৃস্টানগণ তাদের নেককার বুজুর্গগণ ও আলিমদেরকে সাজদা করে। তিনি বলেন, তোমরা কেন এরূপ কর? তারা উত্তরে বলে: এ হলো নবীগণের তাহিয়্যাহ বা সালাম। আমরা বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার আমাদের বেশি। তিনি যখন নবী (ﷺ)-এর নিকট প্রত্যাগমন করলেন তখন তিনি তাঁকে সাজদা করলেন। তিনি বলেন: হে মু'আয, এ কি? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করে দেখলাম যে, খৃস্টানগণ তাদের পাদরি, দরবেশ ও বিশপদের সাজদা করে এবং ইহূদীগণ তাদের আলিম ও বুজুর্গ ও ফকীহদের সাজদা করে। আমি বললাম, তোমরা এ কি কর? তারা বলে বলে, এ হলো নবীগণের সালাম। আমি বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার তো আমাদের বেশি। তখন নবীউল্লাহ (ﷺ) বলেন, ওরা ওদের নবীগণের নামে মিথ্যা বলেছে, যেমন ওরা নবীগণের কিতাব বিকৃত করেছে। তোমরা এরূপ করো না। আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম।"[৮৭০]

অন্য হাদীসে কাইস ইবনু সা'দ (রা) বলেন:

أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ أَنِّي أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِيْ أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ

"আমি (পারস্যের সীমান্তবর্তী) হীরা নামক স্থানে গমন করি। আমি দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকার বেশি যে তাঁর জন্য সাজদা করা হবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলি, 'আমি হীরা গমন করে দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে। আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনারই অধিকার বেশি যে আপনার জন্য সাজদা করা হবে। তিনি বলেন, তুমি বলতো, তুমি যদি আমার কবরের নিকট গমন কর, তখন কি তুমি কবরকে সাজদা করবে? আমি বললাম: না। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ করবে না, আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের সাজদা করতে অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীগণকে অনুমতি দিতাম তাদের স্বামিগণকে সাজদা করতে।"[৮৭১]

উপরের হাদীসগুলি আলোচনা করে আল্লামা কুরতুবী বলেন:

وهذا السجود المنهي عنه قد أتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم وأستغفارهم فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه ضل سعيهم وخاب أملهم

"এ সকল হাদীসে যে সাজদা নিষেধ করা হয়েছে সে সাজদা জাহিল সূফীগণ তাদের রীতিতে পরিণত করেছে তাদের সামার মাজলিসে এবং তাদেরর পীর-মাশাইখের নিকট প্রবেশের সময়ে এবং তাদের দু'আ-ইসতিগফারের সময়ে। তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তাদের দাবিমত যখন তাদের কারো হাল এসে যায় তখন পায়ের কাছে সাজদায় পড়ে যায় কিবলামুখি অথবা অন্যমুখি হয়ে। তাদের মুর্খতার কারণেই তা তারা করে। তাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তাদের আশা বিনষ্ট হয়েছে।"[৮৭২]

ইবাদতের বা 'তাযীমের' সাজদা ও তাহিয়্যাহ বা সালাম-সম্ভাষণমূলক সাজদার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তাহিয়্যা বা সালামের সাজদা

জাগতিক, লৌকিক ও মানবীয় সাধারণ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তা চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি নয়, বর সাধারণ ও লৌকিক ভক্তি। অলৌকিক ভয়, ভালবাসা বা ভক্তির কারণে মানুষ তা করে না, বরং লৌকিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে তা করে। এর প্রচলন যে সমাজে রয়েছে সে সমাজের বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সকল মানুষই তার পিতা, মাতা, শিক্ষক, সমাজপতি বা রাজাকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন অন্য সমাজে দাঁড়িয়ে, মাথা ঝুকিয়ে বা স্যালুট দিয়ে এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়। এরূপ সাজদা পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল এবং ইসলামে তা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইবাদতের সাজদা হলো চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি। মানুষ যাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার কাছে নিজের চূড়ান্ত সমর্পন, অসহায়ত্ব ও অলৌকিক ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এরূপ সাজদা করে। পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা বা সাধারণ মানবীয় ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারীকে কেউ এরূপ সাজদা করে না, বরং স্রষ্টা, স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য, ব্যক্তি বা ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থানেই সে এরূপ সাজদা করে। সকল শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এরূপ সাজদা করা সরাসরি শির্ক ও কুফ্র।

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন ইবনু আলী আত-তূরী আল-কাদেরী আল-হানাফী (মৃ. ১১৩৮ হি) 'তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক' গ্রন্থে বলেন: "রাজা-বাদশার সামনে যে সাজদা করা হয় তা হারাম। যে করে এবং যে এরূপ কর্মে রাযি থাকে উভয়েই পাপী। কারণ এ কর্ম মুর্তিপূজকদের অনুকরণ। সাদর শহীদ উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ সাজদার কারণে কাফির বলে গণ্য হবে না, কারণ সে শুধু সালাম বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ করেছে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসী বলেন: তাযীম বা সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করা কুফ্‌রী।"[৮৭৩]

আল্লামা শামী তাঁর 'হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার গ্রন্থে বলেন:

تَقْبِيلِ الأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ آثِمَانِ لأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ وَهَلْ يَكْفُرَانِ: عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيمِ كُفْرٌ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لا وَصَارَ آثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ

"আলিম ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে ভূমি-চুম্বন বা জমিন-বুসী করা হারাম। যে ব্যক্তি তা করে এবং যে তাতে রাজি থাকে উভয়েই পাপী; কারণ তা মূর্তিপূজার অনুকরণ। এখন প্রশ্ন হলো: এরূপ ভূমি-চুম্বন-কারী এবং তাতে সন্তুষ্ট ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে কিনা? যদি ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তা করে তবে তা কুফর বলে গণ্য। আর যদি সালাম বা সম্ভাষণ প্রদানের জন্য করে তাবে কুফর হবে না, তবে এরূপ ব্যক্তি কবীরা গোনাহে লিপ্ত বলে গণ্য হবে।"[৮৭৪]

লক্ষণীয় যে, পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা ও অন্যান্য জাগতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তাহিয়্যার সাজদা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সালাম জ্ঞাপক সাজদার কল্পনা করা গেলেও নবী, ওলী বা অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত কারো ক্ষেত্রে বা কারো কবর-মাযারের ক্ষেত্রে তাহিয়্যার সাজদা কল্পনা করা যায় না। কারণ মানুষ যখন তার মাতা, পিতা, শিক্ষক বা রাজাকে সাজদা করে তখন সে কোনো অলৌকিক বা অপার্থিব ভয় বা ভক্তি নিয়ে তা করে না, বরং একান্তই জাগতিক ভয়, ভক্তি বা শিষ্টাচার হিসেবে তা করে। পক্ষান্তরে অলৌকিক ব্যক্তিত্বদেরকে কখনোই কেউ লৌকিক শিষ্টাচার হিসেবে সাজদা করে না, বরং অলৌকিক ও চূড়ান্ত ভক্তি হিসেবেই সাজদা করে। এজন্য চাঁদ, সূর্য, কবর, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিচিহ্ন, প্রতিকৃতি, মূর্তি, পূজনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্যকে সাজদা করলে তা ব্যাখ্যতীতভাবে শিরক বলে গণ্য হবে।

আরো লক্ষণীয় যে, তাহিয়্যাহ বা শিষ্টাচারের সাজদার অস্তিত্ব মূলত ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলিম সমাজে ইবাদত হিসেবে আল্লাহকে সাজদা করা ছাড়া অন্য কোনোরূপ সাজদার প্রচলন থাকে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মে ও সমাজেও মূলত অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, মূর্তি, বস্তু ইত্যাদিরই সাজদা করা হয়ে থাকে। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিম উভয় প্রকারের সাজদার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য না করেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা সরাসরি কুফর বা শিরক বলে গণ্য করেছেন। আর যারা পার্থক্য করেছেন তাঁরা একমত যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তাহিয়্যার সাজদা করা হারাম এবং এরূপ হারাম কর্মকে বৈধ বলে মনে করা কুফ্‌র।

৫. ৫. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ

কোনো কিছুর চারিদিকে আবর্তন করাকে তাওয়াফ বলা হয়। সাজদা ও সালাতের মতই তাওয়াফ একটি ইবাদত। সালাত-সাজদা ও তাওয়াফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে থেকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহর জন্য সালাত ও সাজদার ইবাদত আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে আবর্তন বা তাওয়াফের ইবাদত একমাত্র কাবা গৃহের চারিদিকে আবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য এ ইবাদত পালন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"এবং তারা তাওয়াফ করুক প্রাচীন গৃহের।"[৮৭৫]

কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা দুভাবে হতে পারে:

প্রথমত, মহান আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালবাসা ও ভয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশের জন্য, অর্থাৎ একমাত্র

তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরূপ করা কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ, যেমন মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। কেউ যদি কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় অথবা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে তাওয়াফ করা বৈধ মনে করে তবে তা শিরক ও কুফর বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরূপ করা সুস্পষ্টতই শিরক, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাকে সামনে রেখে তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। লক্ষণীয় যে, শুধু আল্লাহকে খুশি করতে এবং তাঁরই প্রতি ভক্তি জানাতে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে কেউই তাওয়াফ করে না। যারা কোনো কবর, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা অন্য কিছুর তাওয়াফ করেন তারা আল্লাহর ইবাদতের কথা বললেও পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁর নেক-নজর লাভেরও উদ্দেশ্য তাদের থাকে। নইলে কাবা ঘর বাদ দিয়ে অন্যত্র তাওয়াফ করবেন কেন্?

৫. ৫. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা

আমরা ইতোপূর্বে দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, ত্রাণ প্রার্থনা ইত্যাদির লৌকিক ও অলৌকিক পর্যায়গুলি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য উপস্থিত কোনো মানুষ, জিন্ন বা ফিরিশতার কাছে লৌকিক ও জাগতিক সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু অলৌকিক ত্রাণ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায় না। দূরে অবস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে লৌকিক বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া শিরক।

আমরা আরো দেখেছি যে, ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণের অন্যতম শিরক ছিল সাধারণ বিপদে আপদে ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ, ওলীগণ বা অন্যান্য কাল্পনিক দেব দেবীদের ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করা। তারা সকলেই বিশ্বাস করত যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান প্রতিপালক এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার নেই। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল বান্দাকে আল্লাহ কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আল্লাহ এদের সুপারিশ শুনেন এবং এদের ডাকলে তিনি খুশি হন। অবিকল একইরূপ বিভ্রান্তির কারণে মুসলিম সমাজেও এ ধরনের শিরক প্রসার লাভ করেছে। শাহ ওয়ালি উল্লাহর বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি।

অগণিত মিথ্যা কল্প-কাহিনী, জনশ্রুতি ও শেষ যুগের কোনো কোনো আলিম নামধারী ব্যক্তির মতামতই এরূপ শিরকে লিপ্ত মানুষদের একমাত্র দলীল। এগুলির বিপরীতে একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনার কোনো মূল্যই তারা দেন না। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন: "কবর পূজারিগণ যে সমস্ত কারণে কবর পূজা করিয়া থাকে উহাদের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হইল নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে মিথ্যা হাদীস সৃষ্টি করা নিজেদের মনগড়া এই জাতীয় হাদীস প্রচার করিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়া আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। ..... কবর পূজারী সম্প্রদায় তাহাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে উহা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। মুক্তির কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অমুক দরবেশের মাজারে গিয়া বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ তাহাকে দুই-একদিনের মধ্যে সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দেয়। অমুক ব্যক্তি আসমানী বালায় নিপতিত হইলে অনোন্যপায় হইয়া অমুক কবরের দরবেশকে একাগ্রতার সাথে স্মরণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে আসমানী বালা দূর হইয়া যায়। এমনকি কেহ কেহ নিজের কথাও বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পতিত হইয়া শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের মাজারে নযর-নেওয়াজ লইয়া গিয়া তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেয় .....

নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমদের সকলকে এই শিরক ও বিদআত হইতে নিরাপদ রাখুন।... ঘর হইতে পা বাড়াইলেই যে আল্লাহর খালেছ ইবাদতখানা মসজিদ সেখানে যাওয়ার কষ্টটুকু ইহারা স্বীকার করিতে চায় না। অথচ মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন হাঁটিয়া গিয়া কবরের নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকাকেই শ্রেয় মনে করে।... ইহারা যদি কবরে না গিয়া রাস্তাঘাট, হাট-বাজর অথবা গোসলখানায় বসিয়াও এমন কাকুতি-মিনতি ও একাগ্রতার সাথে কান্নাকাটি করিয়া মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিত তবুও আল্লাহ তাদের দোআ কবুল করিতেন, তাহাদের দু'আ ব্যর্থ হইত না। সুতরাং এই অবস্থায় কবরের বুযর্গী ও প্রভাব মনে করা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ব্যতীত কিছুই নহে। আল্লাহ বিপদাপন্নের দোআ যে সকল সময়ই কবুল করিয়া থাকেন ইহা এই অজ্ঞেরা বুঝিতে চায় না। এমন কি কাফেরও যদি আল্লাহর নিকট একাগ্রতার সাথে দোআ করে আল্লাহ তাহাও কবুল করিয়া থাকেন।... ।"[৮৭৬]

কেউ কেউ এরূপ শিরককে 'ওসীলা ধরা' বলে চালাতে চান। তারা বলেন যে, যারা বিপদে আপদে ওলীগণের নাম ধরে ডাকেন ও সাহায্য চান, তাঁরা মনে করেন না যে, ওলীগণের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, বরং সকলেই জানে যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তবে তারা আল্লাহর কাছে ওসীলা হিসেবে এদের ডাকেন। আমরা দেখেছি যে আরবের মুশরিকগণও ঠিক একইরূপ যুক্তি পেশ করত। কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আর অনুপস্থিত কারো কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়ার মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য। প্রথম কর্ম শিরক নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি সুস্পষ্ট শিরক।

প্রসিদ্ধ তাফসীর-গ্রন্থ 'রূহুল মা'আনী'র প্রণেতা আল্লামা শিহাব উদ্দীন মাহমূদ আল আলূসী আল-হানাফী (১২৭০ হি) তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিরকের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ

عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমন করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলি আরোহী লয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেশিষ্টত হয়ে পড়েছে বলে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে: তুমি আমাদেরকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্ত র্ভুক্ত হবো।"[৮৭৭]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী (রাহ) বলেন: "এ আয়াত প্রমাণ করে যে, এরূপ অবস্থায় মুশরিকগণ মহান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকত না। আর আপনি ভালই অবগত আছেন যে, আজকাল মানুষেরা কি করে! জলে বা স্থলে যখন কোনো কঠিন বিপদ বা বড় কোনো সমস্যার মধ্যে তারা নিপতিত হয় তখন তারা এমন ব্যক্তিদেরকে ডাকে যারা কোনো ক্ষতি করেন না এবং উপকারও করেন না, যারা দেখেনও না এবং শুনেনও না। তাদের কেউ খিযির এবং ইলিয়াসকে ডাকে। আর কেউ আবুল খামীস এবং আব্বাস (আ)-কে ডাকে। কেউ বা কোনো একজন ইমামকে ডাকে। কেউ বা উম্মাতের বুজুর্গ-মাশাইখের মধ্য থেকে কারো কাছে আকুতি আবেদন পেশ করে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখবেন না যে শুধু তার মালিক-মাওলাকে ডাকছে এবং শুধু তাঁর কাছেই আকুতি আবেদন পেশ করছে। সম্ভবত তার মনের কোনে একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত। হে পাঠক, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকগণ এবং বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোন দল অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত? উভয় প্রার্থনাকারী ও আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য? আল্লাহর নিকটেই মনোবেদনা জ্ঞাপন করছি এমন এক যুগে, যে যুগে অজ্ঞতার প্রবল ঘুর্ণিঝড় সকলকে আচ্ছন্ন করেছে, বিভ্রান্তির প্রবল ঢেউ বিশাল আকৃতি নিয়ে আছড়ে পড়ছে, শরীয়তের নৌকার রশি ছিন্ন হয়েছে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনাকেই মুক্তির ওসীলা রূপে গণ্য করা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য সৎকাজে আদেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নানপ্রকারের বিপদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৮৭৮]

৫. ৫. ২. ৪. গাইরুল্লাহর জন্য মানত-নযর বা উৎসর্গ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, উৎসর্গ, জবাই, কুরবানী ইত্যাদি শিরক। জীবিত বা মৃত কোনো পীরের নামে, বাবার নামে, ওলীর নামে, তাঁর মাযারের নামে মানত করা, জবাই করা, মানত বা উৎসর্গের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পোষণ করা এ পর্যায়ের শিরক।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (১০৮৮ হি) আদ-দুর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَّامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ مَا لَمْ يَقْصِدُوا صَرْفَهَا لِفُقَرَاءِ الأَنَامِ وَقَدْ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، وَلا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ

"জেনে রাখ, মৃতদের জন্য নযর-মানত যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার-কবরের জন্য যে সব টাকাপয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য তা সবই বাতিল ও হারাম বলে ইজমা হয়েছে। যদি না তারা দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য তা ব্যয় করার মানত করে। মানুষেরা এরূপ নিষিদ্ধ নযর-মানতের মধে নিপতিত হয়েছে, বিশেষত বর্তমান যুগে।"[৮৭৯]

এর ব্যাখ্যায় আল্লমা ইবনু আবেদীন শামী (১২৫২ হি) "হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার" গ্রন্থে বলেন:

قَوْلُهُ (تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ) كَأَنْ يَقُولَ يَا سَيِّدِي فُلانٌ إِنْ رُدَّ غَائِبِي أَوْ عُوفِيَ مَرِيضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي فَلَكَ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّمْعِ أَوْ الزَّيْتِ ... (قَوْلُهُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ) لِوُجُوهٍ: مِنْهَا أَنَّهُ نَذْرٌ لِمَخْلُوقٍ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لا يَجُوزُ لأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لا يَمْلِكُ. وَمِنْهُ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ

"আওলিয়া কেরামের মাযারে তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য মানত করার ধরন এই যে, মানতকারী বলবে, হে অমুক হুজুর বা অমুক বাবা, যদি আমার হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে বা আমার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় বা আমার হাজত পূর্ণ হয় তবে তোমার জন্য অমুক পরিমান স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, মোমবাতি বা তেল দেব। এ প্রকারের মানত বাতিল ও হারাম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে:

প্রথমত, তা মাখলূক বা সৃষ্টির জন্য নযর-মানত করা, আর কোনো সৃষ্টির জন্য মানত-নযর জায়েয নয়। কারণ মানত-নযর ইবাদত এবং কোনো মাখলুকের বা সৃষ্টির ইবাদত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যার জন্য মানত করা হয়েছে তিনি মৃত। আর মৃত ব্যক্তি কোনো মালিকানা লাভ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, এরূপ মানতকারী ধারণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া মৃত মানুষও কাজে কর্মে বা দুনিয়ার পরিচালনায় কিছু করতে

পারেন, আর তার এ আকীদা কুফ্র।"[৮৮০]

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন।[৮৮১]

যারা কবরে, মযারে আউলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত বা জবাই করেন তাদের অনেকে মনে করেন যে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করছি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত করছি, কেবলমাত্র পশুটাকে বাবার বা ওলীর মাযারে এনে জবাই করছি, যেন তিনি সাওয়াব পান। এখানে প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত বা জবাই করা হয় তাহলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করেই তো নিয়্যাত করা যেত যে, আল্লাহ এ সাদকার সাওয়াবটি অমুককে পৌঁছে দিন, এত কষ্ট করে পশুটি মাযারে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? মাজার ময়লা করতে?

বাহ্যত এ কষ্টের কারণ হলো, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করলে তো আল্লাহ পাবেন, কবরস্থ ওলী বা 'বাবা' সরাসরি পাবেন না, আল্লাহর মাধ্যমে পাবেন। আর মাযারে নিয়ে জবাই করলে এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, আল্লাহর প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে এবং কবরস্থ 'বাবার' প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে। যদিও দ্বিতীয়টিই মূল উদ্দেশ্য এবং সে জন্যই এত কষ্ট করা, তবে আল্লাহকে শরীক রাখলে অসুবিধা নেই, এতে 'বাবা' নারায হবেন না!!

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী বলেন: "মহান্ আল্লাহ বলেছেন[৮৮২]: "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না...।" যারা আল্লাহর ওলীগণের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এখানে তাদের নিন্দার প্রতি ইশারা করা হয়েছে; কারণ তারা বিপদে আপদে তাদের নিকট ত্রাণপ্রার্থনা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করা থেকে গাফিল থাকে এবং এ সকল ওলীর জন্য তারা নযর-মানত করে। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা বলে, এ সকল ওলীরা হলেন আল্লাহর নিকট আমাদের ওসীলা। এবং বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্যই নযর-মানত করি এবং এর সাওয়াব ওলীর জন্য প্রদান করি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাদের প্রথম দাবির বিষয়ে তারা মূর্তিপূজকদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মূর্তিপূজকদের মতই, যারা বলত[৮৮৩]: আমরা এদের ইবাদত করি তো এজন্যই যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে।'

তাদের দ্বিতীয় দাবিটি আপত্তিকর হবে না, যদি তারা এরূপ মানতের মাধ্যমে ওলীগণের নিকট থেকে তাদের অসুস্থব্যক্তিদের সুস্থতা, তাদের হারানো মানুষের প্রত্যাবর্তন বা অনুরূপ কোনো হাজত প্রার্থনা না করে। কিন্তু তাদের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে যে, তারা এদের নিকট মানতের দ্বারা এরূপ কিছুই প্রার্থনা করে। এর প্রমাণ এই যে, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর জন্য মানত কর এবং এর সাওয়াব তোমাদের পিতামাতার জন্য দান কর, কারণ এ সকল ওলী-আওলিয়ার চেয়ে তোমাদের পিতামাতগণেরই সাওয়াবের প্রয়োজন বেশি, তবে তারা তা করবে না। আমি এদের অনেককে দেখেছি যে, তারা ওলীগণের কবরের পাথরের বেদিমূলে সাজদা করছে।

এদের অনেকে দাবি করে যে, সকল ওলীই তাদের কবরে বসে দুনিয়া পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, তবে তাদের বেলায়াতের মর্তবা অনুসারে তাদের ক্ষমতার কমবেশি রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বিশ্ব পরিচালনা এরূপ ক্ষমতা ৪ বা ৫ জন কবরবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ করেন। তাদের নিকট যদি প্রমাণ চাওয়া হয় তবে তারা বলেন, কাশফ দ্বারা তা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! এরা কত বড় জাহিল!! আর এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি কত ব্যাপক!!!

তাদের মধ্যে অনেকে দাবি করে যে, এ সকল ওলী-আউলিয়া তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেন। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বলে, এ সকল ওলীর রূহ প্রকাশিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো কখনো তারা বাঘ, সিংহ, হরিন বা অনুরূপ প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে। এ সবই ভিত্তিহীন বাতিল কথা। কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের প্রথম যুগে ইমামগণের কথার মধ্যে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সকল মিথ্যাচারী মানুষে দীন-ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য বাতিল ও বিকৃত ধর্মের মানুষদের নিকটেও এরা হাসি-মস্করার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি বাতিল মতবাদ ও নাস্তিকতার অনুসারীরাও এদের নিয়ে হাস্যকৌতুক করে। আমরা আল্লার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"[৮৮৪]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে বলেন: "কবর পূজারীদেরকে পীর পুরস্ত বা পীর পূজারীও বলা হয়। কবর পূজারী সম্প্রদায় কবর পূজাকে ফরয ইবাদত তথা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি হইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সুন্নত ইবাদত ও অযীফা করার চেয়ে কবর পূজাকে অধিক ফযীলতপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ মনে করে। তাই তাহারা কবর পূজাকে যে কোন প্রকার ইবাদতের পরিবর্তে করিয়া থাকে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত তারা কিন্তু কবর পূজার পরিবর্তে আল্লাহর কোন ইবাদতকে গুরুত্ব দেয় না এবং উহাকে যথেষ্ট মনে করে না। যখন কোন বুযর্গের উরশ বা মেলা ইত্যাদি হয় তখন সেখানে বহু দূর দূরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই ক্ষেত্রে কবর পূজারীরা সেই মেলায় উপস্থিত হওয়া ফরয ইবাদত মনে করে এবং অন্যান্য ফরয অর্জনকরার চেয়ে এটাকেই অধিক প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে।

কবর পূজারীদের আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্যময় কাজ হইল যাবতীয় পাথিব বিপদাপদ ও সঙ্কটময় কাজের সমাধান হওয়ার জন্য কবরের নিকট গিয়া এমন বিনয়তা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে যে,

মসজিদে বা অন্য কোথাও আল্লাহকে হাযির নাযির মনে করিয়া উহার শত ভাগের এক ভাগও করে না। কবরে শায়িত বুযর্গের নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকে এবং দোআ করে এবং তাহার নিকট জীবিকা ও সন্তানাদি কামনা করে। অত্যন্ত বিনয় ও মনযোগের সহিত মাথানত (করিয়া) কাপড়ের গেলাফ এবং চাদর লাগায়; কবরের উপর সুগন্ধি ছড়ায়। পূণ্যের কাজ মনে করিয়া লোবান, আগর বাতি জ্বালায় এবং কবরকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে। এই অযথা কাজে পীরের আত্মাকে খুশী করার নিয়তে তাহার সানিধ্য লাভের চেষ্টা করে। আপাতঃদৃষ্টে দেখা যায় যে হিন্দু ও মুশরিক সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার জন্য যেভাবে অর্চনা করিয়া থাকে ঠিক সেই ভাবেই এই কবর পূজারিগণও সেই সমস্ত কাজকে পুণ্যময় মনে করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।"[৮৮৫]

৫. ৫. ২. ৫. তাবার্‌রুক বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকদের মধ্যে তাবাররুক বিষয়ক শিরক বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয়। তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে বরকরতে উৎস বলে মনে করে, তার সামনে 'চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে', উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নযর আশা করে তখন তা শিরকে পরিণত হয়। তাবার্‌রুকের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে তাবার্‌রুক করলে তা থেকে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাবার্‌রুকের সুন্নাত পদ্ধতি আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের কর্ম থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সবচেয়ে মূল্যবন ও বরকতময় স্মৃতি ছিল পবিত্র কাবা ঘর এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাজার আসওয়াদ, রুকন ইয়ামানী, মাকাম ইবরাহীম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার আসওয়াদে চুম্বন করেছেন। এ চুম্বন আল্লাহর নির্দেশ ও ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের চুম্বন, পাথর থেকে, বা পাথরের কারণে ইবরাহীম (আ) থেকে কোনো বরকত, দু'আ, কল্যাণ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নয়। সাহাবীগণও কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ ও সুন্নাত পালনের জন্যই তা চুম্বন করেছেন, পাথর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। উমার (রা) হাজার আসওয়াদ চুম্বন কালে বলেন:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

"আমি জানি যে, তুমি পাথর মাত্র, কোনো ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না, যদি না আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে চুম্বন করছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।"[৮৮৬]

'মাকামে ইবরাহীম' ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বরকতময় পাথর। কুরআন কারীমে একে সুস্পষ্ট নিদর্শন বলা হয়েছে এবং এর পিছনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ কখনোই সালাত আদায় করা ছাড়া কোনো ভাবে এ পাথরকে সম্মান করেন নি। কখনোই একে চুম্বন করেন নি, পানি দিয়ে ধুয়ে তা পান করেন নি বা অন্য কোনোভাবে একে সম্মান প্রদর্শন করেন নি।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর দেখেন যে, তাবিয়ী যুগের কিছু নও মুসলিম মাকামে ইবরাহীমে হাত বুলাচ্ছেন। তাঁরা এভাবে বরকতময় স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্যটিকে সম্মান করছিলেন। তখন তিনি বলেন:

لَمْ تُؤْمَرُوا بِهذا إنما أُمِرْتُمْ بالصلاة

"তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"[৮৮৭]

সুন্নাত নির্দেশিত স্থানগুলি-হাজার আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানী ছাড়া পবিত্র কাবাগৃহের অন্য কোনো স্থান চুম্বন, হাত বুলানো বা অন্য কোনোভাবে তাঁরা 'তাবাররুকের' চেষ্টা তাঁরা কখনো করেন নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওযুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, থুতু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেওয়া যেকোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের এসকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাসূল-প্রেমিক মুসলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসা কখনো গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে সাহাবীগণ কোনো সাহাবীর বা অন্য কোনো বুজুর্গের বা পূর্ববতী কোনো নবী-ওলীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্যের প্রতি এধরনের আচরণ করেননি। তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্বাস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, বেলাল, ইবনু মাসউদ (ﷺ) বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ী তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি।[৮৮৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেমন মু'মিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিও মুমিনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থান। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি ইস্তিঞ্জা করেছেন

সেখানে ইস্তিঞ্জা করা। এমনি যেখানে তিনি ফরয সালাত আদায় করেছেন সেখানে তাঁরা নফল সালাত আদায় করতেন না, বরং তিনি যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন তাই সেখানে আদায় করার চেষ্টা করতেন। এমনকি তিনি হজ্জ-উমরার সফরে যেখানে সালাত আদায় করেছেন, সেখানে তাঁরা হজ্জ-উমরার সফরেই শুধু সালাত আ্দায় করতেন, অন্য সময়ে শুধু সেখানে সালাত আদায় করার জন্য যেতেন না। অর্থাৎ সাহাবীগণ তাবাররুক করতেন হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে। এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি আমার এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শুধু দ্রব্য বা স্থানকে ভক্তি করা বা তার প্রতি অলৌকিক ভক্তি প্রকাশের প্রবণতা তাঁরা কঠোরভাবে আপত্তি করতেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? তাঁকে বলা হয়: ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি বলেন :

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا، يَتَّبِعُوْنَ آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَّخِذُوْنَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعاً. مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فِـيْ هَـذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَمْضِ، وَلاَ يَتَعَمَّدُهَا.

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তো এই ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি খুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে। আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে চলে যাবে। বিশেষ করে এসকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না।"[৮৮৯]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ) উমার (রা)-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: "হযরত ওমার (রা)-এর বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে মানুষ যে সমস্ত নক্শাকৃত পাদুকা এবং হাতের ছাপ মারা পাথর বা এই জাতীয় কিছু কোন একস্থানে পুতিয়া প্রচার করে যে, ইহা অমুক বুযর্গের হাত বা পদচিহ্ন সম্বলিত বরকতময় পাথর। ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই পাথর যিয়ারত করার জন্য বহু দূর দূরান্ত হইতে আসে এবং সেখানে নযর নিয়ায করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য নিবেদন পেশ করে। নিঃসন্দেহে ইহা বিদ'আত ও সুন্নাতের বরখেলাফ। শরীয়ত মোতাবেক যখন এই সমস্ত বস্তুগুলি যিয়ারত করা এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সুন্নাতের পরিপন্থী তখন উহার নিকট দোআ করা, কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করা এবং মনোবঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা কোনমতেই তো জায়েয হইতে পারে না। বরং ইহা পরকালে মুক্তির ও নাজাতের পথকে বন্ধ করিয়া দেয়। .....

উল্লেখিত বস্তুসমূহ এবং উহা ছাড়া ইবাদতের আশায় সেখানে যাহা কিছু স্থাপিত করা হয়, উহা ভাঙ্গিয়া (ফেলা) ও উহার মূলোৎপাটন করা প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য কতর্ব্য।"[৮৯০]

তিনি আরো বলেন: "আমাদের বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত ও বিগলিত না হইয়া পারে না। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশিত সহজ সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত গোমরাহীর পথে চলিতেছি। যে সমস্ত পাথর ও স্থানসমূহ বুযর্গগণের সাথে সম্পর্কিত উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাযীম তাকরীমে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। শিরক ও বিদয়াতে লিপ্ত হইতে আমাদের অন্তর কোন সময় ভয়ভীতি অনুভব করে না। এই সমস্ত স্থান ও বস্তুসমূহকে নিজেদের কিবলাহ, মাকসুদ ও মনের আশা আকাঙ্খা পূরর্ণ হওয়ার একমাত্র উৎস মনে করিয়অ বহুদূর দূরান্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেইখানে আসিয়া লোকজন উপস্থিত হয়। নযর নেওয়া দিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, সুগন্ধি ছড়াইয়া, আলো জ্বালাইয়া বুযর্গদের আত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। তেমনিভাবে এই সমস্ত লোক বুযর্গদের তাসবীহ, লাঠি, পাদুকা এবং অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসকেও ঐ বুযর্গের স্থলাভিষিক্ত মনে করে। ....

এই যুগে যদি কোন পীরের লাঠি, পাগড়ী, পাদুকা বা জামা কাপড় কিছু পায় তবে উহা অতি সম্মানের সাথে কোন উঁচুস্থানে সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানটিকে যিয়ারত করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া উহাকে দরগাহ শরীফে পরিণত করে। এই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে কোন কোন লোক প্রপাগাণ্ডা করিয়া বলিয়া থাকে, আমি অমুক বুযর্গের ব্যবহৃত পাদুকা দ্বারা এমন উপকার পাইয়াছি যাহা বর্তমান যুগের জীবিত বুযর্গদের নিকটও পাওয়া যায় না। ......

এই কপটতা এমন এক স্তরে দাঁড়ায় যে, বুযর্গগণ যখন তাহাকে এই জাতীয় শরীয়ত বিরোধী অন্যায় কাজ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন তখন তাহারা নানা প্রকার ওযর-আপত্তি, টাল-বাহান ও বুযর্গদের প্রতি মহব্বত পোষণের বাহানা অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া থাকে- এই জাতীয় কথা আমরা তাহাদের প্রতি মহব্বতের দরুনই বলিয়া থাকি। পরে যখন এই কপটতার রোগ সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন এই জাতীয় লোকেরা প্রকাশ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। যাহারা তাহাদের এই সমস্ত কাজে তাহাদিগকে বাধাদান করে তখন তাহারা বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়া বলিতে থাকে- ইহারা আল্লাহর অলীদের মত ও পথের বিরোধী তাহাদের কাশফ কেরামত অস্বীকার করে। যেমন ইহূদীগণ হযরত ঈসা (আ)-কে হযরত ওযায়ের (আ)-এর অস্বীকারকারী ও বিরোধী এবং মুসলমানদেরকে হযরত ঈসা (আ)–এর শত্রু ও বিরোধী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হযরত ঈসা (আ) এতটা অপরাধীই ছিলেন যে, তিনি হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। মুসলমানদের অপরাধ- তাহারা হযরত ঈসা (আ)–কে আল্লাহর সন্তান বলিয়া মানে না।

মোট কথা প্রতিটি গোমরাহ সম্প্রদায়ই হিদায়াত প্রাপ্ত শরীয়তের অনুসারী লোকদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত

করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। এই প্রকার অপমান করার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে জন সমাজে বলিয়া বেড়ায় যে, এই সমস্ত লোক অমুক অলীর বিরোধী ও শত্রু, তাহার মত ও পথকে ইহারা বিশ্বাস করে না। মক্কার মুশরিকগণও হুযূর (ﷺ) এবং সাহাবা কিরামদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিত। তাহারা নবীবরকে (ﷺ) সাবী অর্থাৎ বেদ্বীন এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধী ও শত্রু বলিয়া লোক সমাজে বলিয়া বেড়াইত।"[৮৯১]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ আরো বলেন: "শয়তান আদম সন্তানদের আদিম ও অকৃত্রিম শত্রু। সে প্রতি যুগে প্রতি স্থানে প্রথমে কোন আল্লাহর বন্ধুর কবরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লয়। তারপর একমাত্র উপাস্য আল্লাহকে বাদ দিয়া পূজা-পার্বনের জন্য ঐ কবরটিকে প্রতিমা বা মূর্তিতে পরিণত করে। ইহার পর শয়তান তাহার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের মধ্যে জোর গলায় প্রচার করিতে আরম্ভ করে যে, যাহারা এই কবরের পূজা পার্বন, উহার পাশে ওরস ও মেলা করিতে বারণ করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে এই বুযর্গের শত্রু। তাহারা এই বুযর্গকে অসম্মান করার এবং তাহার প্রাপ্য হক তাহাকে না দেওয়ার জন্যই এইরূপ করিতেছে। শয়তানের এই অপপ্রচারে উত্তেজিত হইয়া একদল অজ্ঞ ও ইলম বিবর্জিত লোক এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। এমনকি তাহাকে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহাদের প্রতি কুফরী ফতওয়া দেয়, তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। বাধা প্রদানকারীদের দোষ কি? তাহাদের দোষ হইল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে কাজ করার নির্দেশ দিয়াচেন তাহারা জন সাধারণকে সেই কাজ করার জন্য আহ্বান করেন। আর যে কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন- উহা করা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন।"[৮৯২]

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন, যে বৃক্ষের কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে[৮৯৩]। এ বৃক্ষ প্রসঙ্গে ইবনু উমর (রা) বলেন: হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বৎসর আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবীও ঐ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল।[৮৯৪]

অন্য হাদীসে নাফে' (রাহ) বলেন: কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় 'বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ' নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে সালাত আদায় করত। খলীফা উমর (রা) এ কথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। পরে তিনি ঐ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয়।[৮৯৫]

এ হাদীসটি উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: "ভবিষ্যতে যাহাতে শিরকের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় তজ্জন্যই হযরত ওমর সেই গাছটি কাটিয়অ ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটির ন্যায় যাহা কিছু মূতি ও প্রতীমার শ্রেণীভুক্ত যাহার কারণে অসংখ্য ফেতনা ফাসাদ এবং বিদ'আতের প্রচলন হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দরুন কঠিনতম বিপদাপদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে উহার বেলায় হুকুম কি হইতে পারে?

হযরত ওমর (রা)–এর কাজের তুলনায় অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হইল হুযূরে আকরাম (ﷺ)-এর মসজিদে দেরার, যে মসজিদ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইসলামের ক্ষতি সাধন করার পরামর্শ গৃহরূপে নির্মান করিয়াছিল- উহা জ্বালাইয়া দেওয়া। তিনি শিরক ও বিদআতের পথ রুদ্ধ করার মানসেই এই কাজ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত মসজিদ, মন্দির কবরের উপরে তৈয়ার করা হয় অথবা স্মৃতিসৌধরূপে নির্মাণ করা হয় এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অহরহ শিরক ও বিদআতের স্রোত বহিয়া চলিতেছে উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া মসজিদে দেরার ধ্বংসের তুলনায় কোন অংশেই কম পুণ্যের কাজ নহে। ইসলাম এই সমস্ত মাটির সাথে মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে।

যে সমস্ত মিনার ও গম্বুজ মৃত বা শহীদ লোকের কবরের উপর স্থাপিত তাহাও ধ্বংস করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। কারণ হুযূর (ﷺ)-এর বিরোধিতা ও ইসলামের নাফরমানী করার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার অস্তিত্ব এইগুলিতে বিরাজ করিতেছে। .... এই সৌধসমূহ ধুলিস্যাত করিয় দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ হইল হুযুর (ﷺ)-এর পবিত্র বাণী। তিনি কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এই সমস্ত করে তাহাদের প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছেন। যে সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতি হুযুর (ﷺ) নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন এবং যাহাদের নির্মাতাকে তিনি অভিশপ্ত বলিয়াছেন- উহা দ্বিধাহীন চিত্তে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করিয়া ফেলাই মুসলমানদের এক অপরিহার্য কর্তব্য। আবার যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়, আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে, ঝাড় বাতি লটকায়, সুগন্ধি ছিটায়, আগরবাতি জ্বালায়- তাহাদের প্রতিও নবীয়ে আকরাম (ﷺ) অভিসম্পাত করিয়াছেন।

অতএব যে কাজ করায় হুযূর (ﷺ) অসন্তুষ্ট হইয়া লানত করিয়াছেন উহা কবীরা গোনাহ। ইহার উপর কেয়াস করিয়াই ওলামায়ে কিরাম ফতওয়া দিয়াছেন কবরের জন্য মোমবাতি বা প্রদীপের তৈল মানত করাও হারাম। কারণ এই জাতীয় মানত করাই পাপের কাজে মানত করা। কেহ যদি এই জাতীয় মানত করিয়া আদায় না করে তবে তাহার পাপ হইবে না। এই জাতীয় কবরের জন্য ওয়াকফ করাও জায়েয নহে। শরীয়ত মতে এতদপ্রকার মানত করা না জায়েয। এই সমস্ত বস্তুকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং উহার প্রচলন জারি রাখাও শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য।"[৮৯৬]

৫. ৫. ২. ৬. তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর 'অলৌকিকভাবে' নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা শিরক। এ জাতীয় শিরক এখনো এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক। যেমন কোনো কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহর নামের সাথে গাজী পীর, চাচী পীর, পাঁচ পীর, খোয়াজ খিযির, বদর পীর বা অনরূপ কোনো সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া। অনুরূভাবে মা, বাবা, খাজা বাবা, পাক পাঞ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা কোনো কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য কিছুকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রা)-কে বরকতের মালিক মনে করে ওযন করার সময় তাঁর নাম নিয়ে বা 'মা বরকত' নাম নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেওয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা .... ইত্যাদি অগণিত শিরকী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান। বস্তুত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাব, পূর্ববর্তী ও পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, মানবীয় দুর্বলতা, আলিমগণের অসতর্কতা, স্বার্থান্বেষীদের লোভ ও অপপ্রচার, শয়তানের প্রতারণা ইত্যাদি কারণে এভাবে সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলিমগণ শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

আনুগত্য বিষয়ক শিরক প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে" এ আয়াত উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে বলেন: "উল্লেখিত আয়াতে শিরককে ইহূদী ও খৃস্টানদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সত্ত্বেও অন্য কোনো সম্প্রদায় ঐ সমস্ত কাজ করিলে তাহাদের জন্যও উহা শিরক হইবে এবং তাহারা মুশরিক নামে পরিচিত হইবে। বর্তমান যুগে কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক বলিয়া বেড়ায়, পীর-ফকীরগণ যাহা আদেশ করে উহা বিনাদ্বিধায় মানিয়া চলা ওয়াজিব। তাহাদের আদেশ নিষেধ যদি শরীয়ত বিরোধীও হয় এবং শরীয়ত যদি উহা প্রত্যাখ্যানও করে তথাপি আমাদের পক্ষে উহা পালন করা কর্তব্য। তাহদের উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে হাফেয সিরাজীর একটি রূপক কবিতা প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করায়। হাফেয সিরাজী বলিয়াছেন: 'পীরে কামেল যদি তোমার জায়নামাযকে শরাব দিয়া রঙিন করার আদেশ দেন তবে তোমার পক্ষে উহা কার্যকরী করা প্রয়োজন। কারণ পথ প্রদর্শক কখনও পথ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন না।' ফলে ইহারাও 'আরবাবাম মিন দূনিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে মাবুদ সাব্যস্তকারীদের ন্যায় শিরকে তমসায় তমসাচ্ছাদিত। ....।"[৮৯৭]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ) আরো বলেন: "সাধারণ কোনো মানুষ যদি কোনো একজন ফকীহকে একথা ভেবে তাকলীদ বা অনুসরণ করে যে, তাঁর মত মানুষের কোনো ভুল হতে পারে না এবং তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই সঠিক এবং তার মনের মধ্যে এরূপ চিন্তা করে যে, উক্ত আলিমের মতের বিরুদ্ধে দলিল প্রকাশ পেলেও তার অনুসরণ ত্যাগ করব না, তবে তা হবে পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগিগণকে রাব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করা। ... কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথাকেই একমাত্র দীন মনে করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা হালাল বা হারাম করেন তা ছাড়া অন্য কিছুকেই হালাল বা হারাম বলে মনে করে না, তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাণী ও শিক্ষা সম্পর্কে তার জ্ঞানের কমতির কারণে কারো তাকলীদ-অনুসরণ করে এবং বাহ্যিকভাবে সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করতে থাকে এবং কোনো বিষয়ে তার কর্ম সুন্নাতের খেলাফ হলে কোনো বিতর্ক-আপত্তি না করেই তা বাদ দিয়ে সুন্নাত গ্রহণ করে তবে তা কখনোই আপত্তিকর নয়।"[৮৯৮]

মুশরিকদের ভালবাসার শিরক সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: "একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।"[৮৯৯]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী বলেন: "মহান আল্লাহ এখানে মুশরিকদের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন আমরা অনেক মানুষকে সে অবস্থায় দেখতে পাই। এ সকল মানুষ যে সকল মৃতব্যক্তির নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করে ও সাহায্য চায় তাদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা উৎফুল্ল উল্লসিত হয়। তাদের নামে মিথ্যা কাহিনীগুলি শুনলে তারা উল্লাসে উদ্বেলিত হয়। এসকল কাহিনী তাদের মর্যি ও পছন্দ মত হয় এবং তাদের আকীদার পক্ষে হয় বলেই তারা এরূপ উল্লসিত হয়। যারা এরূপ কাহিনী বর্ণনা করে তাদেরকে তারা খুবই মর্যাদা দেয় এবং ভক্তি করে। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কথা উল্লেখ করে, একমাত্র তিনিই সকল কার্য পরিচালন করেন এবং সকল ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে এবং তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার প্রতি তারা বিতৃষ্ণা বোধ করে। এরূপ কার্য যে করে তার প্রতি তারা অন্যন্ত বিরক্ত হয় এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করে। তাকে তারা অপছন্দনীয় দল-মতের অনুসারী বলে অভিযোগ করে। একব্যক্তি একদিন কঠিন বিপদে পড়ে কোনো কোনো মৃতমানুষের নিকট ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা করছিল এবং বলছিল, হে বাবা অমুক, আমাকে রক্ষা কর। আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহকে ডাক, বল: হে আল্লাহ; কারণ মহাপবিত্র আল্লাহ বলেছেন: 'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।"[৯০০] আমার একথায় ঐ ব্যক্তি ক্রোধন্বিত হয়। পরে আমি শুনেছি যে, সে আমার বিষয়ে বলেছে: অমুক ওলীগণের মর্যাদা অস্বীকার করে। আমি শুনেছি যে, তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহর চেয়েও ওলীরা দ্রুত ডাকে সাড়া দেন। এ কথা যে কত বড় কুফরী তা সহজেই বুঝা যায়। আমরা দু'আ করি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেন।"[৯০১]

৫. ৫. ৩. শিরকের সেকাল ও একাল

শিরক বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীয়াগণ ও তাদের দ্বারা

প্রভাবিত বা অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিপ্ত মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অদ্ভুৎ মিল দেখতে পাই।

(১) সকলেই আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করেন। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই বলে স্বীকার করেন।

(২) সকলেরই শিরকের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাঁদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ তিনি ফেলেন না। এরূপ বান্দাদের ডাকলে তাঁরা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ডাকলে এরা বান্দাকে আল্লাহ বেলায়াত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়।

(৩) আল্লাহর 'প্রিয় বান্দা' নির্ধারণও সকলের ক্ষেত্রে একইরূপ: ওহীর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কিছু সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দার পাশাপাশি অনেক কল্পিত ব্যক্তিত্বকে এরা 'আল্লাহর প্রিয়' বলে দাবি করে।

(৪) সকলেরই দলীল দু'আ ও শাফা'আত বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার বিকৃতি, মুজিযা বিষয়ক ভুল ধারণা, কিছু যুক্তি, কল্পনা, দাবি এবং লোকাচার।

(৫) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় কুরআনের যে সকল যুক্তি ও বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি তা সবই পূর্ববর্তী মুশরিকদের মত একইভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান শিরকে লিপ্ত মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে আমরা শুধু একটি আয়াত পর্যালোচনা করব।

(৬) আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন: "বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।"[৯০২]

(৭) সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীগণ, ফিরিশতাগণ, সত্যিকার বা কাল্পনিক ওলীগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলিল কি? এদের মধ্যে যারা ফিরিশতা, নবী বা সত্যিকার নেককার মানুষ তাঁদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ডাকতে হবে কেন? তাদের নামে মানত করতে হবে কেন? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

মুসলিম সমাজের যাদের ইবাদত করা হয় বা বিপদে আপদে যাদের ডাকা হয় যেমন আলী (রা), ফাতিমা (রা), পাক-পাঞ্জাতন, আলী বংশের ইমামগণ, 'গাওস', 'কুতুব' বা অন্যান্য নামে পরিচিত বিভিন্ন ওলী-আল্লাহগণ এদের বিষয়েও একই প্রশ্ন এবং উত্তরও একই।

(৭) এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার, মানত করার বা সাজদা করার বৈধতা প্রমাণিত হতো। কিন্তু কখনোই মুশরিকগণ এরূপ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি। কুরআনে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বারংবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, যে বিষয়ে তিনি কোনো 'সুলতান' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেন নি।[৯০৩] আর আল্লাহর সাথে শিরক করার মত যুক্তি, বিবেক ও ওহী বিরুদ্ধ কাজ ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশের সাথে কুফরী করা।

(৮) মুসলিম সমাজের যে সকল মানুষে শিরকে লিপ্ত তাদের অবস্থাও একই। তারা কখনোই কুরআন-হাদীস থেকে একটি নির্দেশনাও দেখাতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকতে, সাহায্য চাইতে, সাজদা করতে, অন্য কারো নামে মানত, উৎসর্গ করতে বা অন্য কাউকে ইবাদত করতে কোনোরূপ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন। কিছু বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, যুক্তি, কল্পনা বা গল্পকাহিনী তাদের সম্বল।

(৯) উপরের আয়াতে সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা ভিত্তিক প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল। এর পাশাপাশি জিন ও মানুষ শয়তানের প্রচারিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী: "অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে

তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।" এগুলিই মুশরিকদের সম্বল।

(১০) মুসলিম কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবেন? মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন, শুনেন। তিনি দয়াময় এবং তিনি বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও ভালবাসেন। তিনি প্রদান করলে কেউ ঠেকাতে পারে না এবং তিনি ঠেকালে কেউ দিতে পারে না। তাঁকে ডাকলে এবং তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন এবং এবং সাড়া দেন। তাহলে আমি কেন তাকে ছেড়ে অন্যকে ডাকব? আমরা প্রতিদিন বারংবার 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন' (**إياك نعبـــدُ وإيـــاك نســتعين**) বলে ঘোষণা করি যে: একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য চাই। তবে কেন আমরা অন্যকে ডাকব? মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন একমাত্র তাঁকেই ডাকতে। এর বিপরীতে কোথাও তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে অনুমতি দেন নি। এরপরও আমরা কেন অন্যকে ডাকব বা অন্যের কাছে ত্রাণ চাইব?

(১১) তাবিল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করা হলো ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র। মহান আল্লাহ বলেন:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـــذِهِ الشَّـــجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

"অতঃপর শয়তান তাদের গোপনকৃত লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই শুধু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলে যে, আমি অবশ্যই তোমাদের একজন হিতাকাংক্ষী।"[৯০৪]

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই। বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ অবশ্যই মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের 'ইল্লাত' কারণ, হেকমত ও রহস্যটা জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার। পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে....।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে। মহান আল্লাহ সকল বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। শিরকের পথ রোধ করতে কবর পাকা করতে, কবররে উপর ঘর বা গম্বুজ বানাতে, কবর উঁচু করতে, কবরে কিছু লিখতে কবরের নিকট মসজিদ বানাতে, কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এর বিপরীতে কখনোই এরূপ কোনো কাজ করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। এখন শয়তান বলছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। সকল শিরক, কুফর ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। এ বিষয়ে মুমিনকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্দ্বিধায় আক্ষরিকভাবে পালনই নাজাতের পথ।

৫. ৬. কুফ্‌র বনাম তাকফীর

৫. ৬. ১. তাকফীর বা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা

উপরের আলোচনায় আমরা কুফর ও শিরকের পরিচয় জানতে পেরেছি। আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল কুফর বা শিরক অনেক মুসলিম নামধারী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। সমাজের অনেক মানুষই নিজেকে মুমিন ও তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবি করার পরেও উপরে আলোচিত বিভিন্ন প্রকার শিরক বা কুফরের মধ্যে লিপ্ত থাকেন। এদের এ সকল কর্ম শিরক বা কুফর বলে আমরা নিশ্চিত জানার পরেও এদেরকে কাফির বা মুশরিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ইসলামের নির্দেশ। কোনো কর্মকে কুফর বা শিরক বলা এবং কোনো ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ক মূলনীতি এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। এছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিভ্রান্ত মুসলিম ফিরকাকে কাফির বলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি আমরা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

তাকফীর অর্থ কাউকে কাফির বলা বা কাফির বলে অভিযুক্ত করা। (seduction to infidelity, charge of unbelief)। অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে দাবিকারী কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা করা। কাউকে কাফির বলার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যেমন কবীরা গোনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কাফির বলা, সুস্পষ্ট কুফরী কর্মের কারণে কাফির বলা, অস্পষ্ট কুফরীর কারণে কাফির বলা, কাল্পনিক কুফরীর কারণে কাফির বলা ইত্যাদি।

৫. ৬. ২. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)

"যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির

না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"[৯০৫]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

"যদি কেউ তার ভাইকে বলে, হে কাফির, তবে তাদের দুজনের একজনের উপর এই কফরীর দায়ভার বর্তাবে।"[৯০৬]

আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ عَلَيْهِ

"যদি কেউ কোনো মানুষকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে 'হে আল্লহর শত্রু' আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার উপর বর্তাবে।"[৯০৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلاً إِلاَّ بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كَافِراً وَإِلاَّ كُفِّرَ بِتَكْفِيْرِهِ

"যে কোনো মানুষ যদি অন্য কাউকে কাফির বলে গণ্য করে তবে দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে। যদি সে কাফির হয় তবে ভাল, নইলে তাকে কাফির ঘোষণা করার কারণে কাফির ঘোষণাকারীই কাফির হয়ে যাবে।"[৯০৮]

সাবিত ইবনু দাহহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে।"[৯০৯]

এই অর্থে অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একই অর্থে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হওয়া প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শঃই তাঁর সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন্ দিকে রাওয়ানা দিবেন বা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন করবেন তা কিছুই বলেন না। তার উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব কম রক্তপাতে পবিত্র মক্কা বিজয় সম্পন্ন করা। সাহাবী হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা অভিমুখে রাওয়ানা দিবেন। তিনি মক্কার কাফিরদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেন। এ বিষয়ে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি, যুবাইর ও মিকদাদ-তিনজনকে বললেন, দ্রুত রাওদা খাখ-এ চলে যাও। সেখানে একজন মহিলা যাত্রী পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি নিয়ে আসবে। আমরা তথায় যেয়ে মহিলাকে পেলাম। তাকে বললাম চিঠিটি দাও। সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি যদি চিঠিটি না দাও তবে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী করব। তখন মেয়েটি তার খোপার ভিতর থেকে চিঠিটি বের করে দিল। চিঠিটি ছিল হাতিবের পক্ষ থেকে মক্কার কাফিরদেরেক লিখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাতিব, এ কী? হাতিব বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। আমি কুরাইশ বংশের লোক নই, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মক্কায় ছিলাম। মক্কা থেকে হিজরত করে আসলেও আমার পরিজন তথায় বাস করছে। আপনার কুরাইশ সাহাবীগণের কাফির আত্মীয়স্বজনেরা তাদের ধনসম্পদ ও পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু আমার কেউ নেই। আমি চেয়েছিলাম এই খবর প্রদানের মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের একটু উপকার করতে, যেন তারা আমার পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখে। আমি কুফরীর কারণে, ধর্মত্যাগ করতে বা কাফিরদের কুফরীতে সন্তুষ্টির কারণে আমি এ কাজ করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাতিব তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে। তখন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি। তিনি বলেন, হাতিব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আর সম্ভবত আল্লাহ বদরবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি।"[৯১০]

এখানে হাতিবের কাজ বাহ্যত ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের বিজয়ের জন্য ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিশ্বাঘাতকতা এবং কুফর। এজন্যই উমার তাকে মুনাফিক বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না দিয়ে তার কাছে এ কাজের ব্যাখ্যা চেয়েছেন এবং তার ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ

"একব্যক্তি জীবনভর সীমালঙ্ঘন ও পাপে লিপ্ত থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে: আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে। এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে। এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমূদ্রের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সন্তানগণ তার ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে। তখন আল্লাহ যমিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে। তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনর্জীবিত হয়ে তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার প্রতিপালক: আপনার ভয়ে। তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।"[৯১১]

এখানে আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমূদ্রে ছাড়িয়ে দিলে মহান আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তিও দিতে পারবেন না। বাহ্যত তার এরূপ ধারণা ছিল অজ্ঞতা প্রসূত। এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আমরা দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫. ৬. ৩. তাকফীরের মূলনীতি

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মুলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ ও ইসলাম বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী, বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন বা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানে দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে এ হলো ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافرا.

"আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ না সে সে পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের 'ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না। বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।"[৯১২]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: "আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু'মিন বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে। ... যেসব বিষয় ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গন্ডি হতে বের হয় না।"[৯১৩]

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আহলু কিবলা' বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলূহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা

বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি। এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখি হওয়া বাতিল ও অর্থহীন।

এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ অনুসারে কুফ্‌র বা শিরক বলে গণ্য তবে তার কর্মকে অবশ্যই শির্‌ক বা কুফর বলা হবে, তবে 'ব্যক্তিগতভাবে' উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা এজাতীয় কোনো ওযর তার আছে কিনা।[৯১৪]

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ
বিদ‘আত ও বিভক্তি

আকীদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির কারণ ও স্বরূপ না জানলে এরূপ বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর বিভক্তি ও ফিরকার আলোচনার পূর্বে বিদ‘আতের আলোচনা অত্যাবশ্যক, কারণ বিদ‘আতই বিভক্তির একমাত্র কারণ। এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ‘আতের পরিচিতি, প্রকারভেদ, উৎপত্তি, কারণ ও কর্মবিষয়ক বিদ‘আতগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। এখানে প্রসঙ্গত বিদ‘আতের পরিচয় আলোচনার পরে আকীদা বিষয়ক বিদ‘আত প্রসঙ্গে আলোচনা সীমিত রাখার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক ও কবুল্যিত প্রাথনা করছি।

৬. ১. বিদ‘আতের পরিচয়

৬. ১. ১. অভিধানে বিদ‘আত

বিদ‘আত শব্দটি আরবী 'বাদা'আ' (بـــدَعَ) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ইসম। বাদ'আ অর্থ নব-উদ্ভাবন বা অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান (Innovation)। বিদ‘আত অর্থ নব-উদ্ভাবিত বিষয়।[৯১৫] ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু দুরাইদ (৩২১ হি) বলেন, "বাদা'আ অর্থ কোনো কিছু শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 'বাদী', অর্থাৎ উদ্ভাবক ও অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব-দাতা বা সৃষ্টিকর্তা। যে ব্যক্তি কোনো বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে তার বিদ‘আত-কারী বা উদ্ভাবক। ইসম 'বিদ‘আত'।"[৯১৬]

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেনঃ

والبِدْعَةُ: الحَدَثُ في الدين بعد الإكْمال.

"আল-বিদ‘আত অর্থ পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন।"[৯১৭]

ফাইরোয-আবাদী (৮১৭ হি) বলেনঃ

والبِدْعَةُ بالكسر: الحَدَثُ في الدين بعدَ الإكْمَالِ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبيِّ ﷺ من الأَهْواءِ والأَعْمالِ

'বিদ‘আতঃ পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে যে মতবাদ বা কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে।"[৯১৮] ইবনু মানযূরও অনুরূপ বলেছেন।[৯১৯]

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৭৯০ হি) আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলেনঃ

الْبِدْعَةِ وَهِيَ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الْأَمْرَ إذَا ابْتَدَأَهُ وَأَحْدَثَهُ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نُقْصَانٌ مِنْـــهُ. وَعَرَّفَهَا الشُّمُنِّيُّ بِأَنَّهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ الْمُتَلَقَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ حَالٍ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَاسْتِحْسَـــانٍ وَجُعِلَ دِينًا قَوِيمًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

"আল-মুগরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বিদ‘আত শব্দটি 'ইবতাদ‘আ' ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম। ফিলটির অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ‘আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।' শুম্মানী বিদ‘আতের সংজ্ঞায়

বলেন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ভাল মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ'আত'।"[৯২০]

আল্লামা ইবরাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি) বলেন:

فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

"বিদ'আত বলতে বুঝায় দীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতির তুল্য কোনো নব-আবিস্কৃত- উদ্ভাবিত তরীকা বা পদ্ধতি মহান আল্লাহর অতিরিক্ত ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।"[৯২১]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতের পরিচয়ে বলেন:

وَهِيَ اعْتِقَادُ خِلافِ الْمَعْرُوفِ عَنْ الرَّسُولِ لا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ

"বিদ'আত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোনো বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা।"[৯২২]

৬. ১. ২. কুরআন কারীমে বিদ'আত

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার আগ্রহে কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে পারেন না। মহান আল্লাহ খৃস্টানদের বিষয়ে বলেন:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।"[৯২৩]

খৃস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমুখি হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। আবার খৃস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি না করে সংসার-বিরাগী হতে কোনো নিষেধও ছিল না। ধার্মিক খৃস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা 'রাহবানিয়্যাহ' বা সন্ন্যাসবাদ (monasticism, to become a monk) রীতি উদ্ভাবন করে। তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে রীতি আবিষ্কার করা। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খৃস্টান মঠগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।

৬. ১. ৩. হাদীসে নববীতে বিদ'আত

আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক অর্থে বিদ'আত অর্থ খারাপ কিছু নয়; নব-উদ্ভাবিত বিষয় ভাল বা খারপ হতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ধর্মের বিষয়ে নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মহান স্রষ্টার কর্ম ও বিশেষণের প্রকৃতি, তাঁর সন্তুষ্টির পথ, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এজন্য এ সকল বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয়। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব প্রদান করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওহীর বাইরে কোনো ধর্মীয় মতামত তৈরি করা, ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম উদ্ভাবন করা ধার্মিক মানুষের জন্য শয়তানের প্রবঞ্চনার দরজা খুলে দেয়। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করেছেন।

ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ (রা) দুটি নেককর্মে পদ্ধতিগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যতিক্রম করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছু দিনে সিয়াম পালন করতেন, পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় করতেন। বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি:

(১) তাহাজ্জুদ ও নফল সিয়াম ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিভিন্ন হাদীসে এ ইবাদত বেশি বেশি পালন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ ইবাদত যত বেশি পালন করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে। কাজেই অর্ধেক রাতের চেয়ে সারারাত তাহাজ্জুদে সাওয়াব বেশি হওয়ার কথা। অনুরূপভাবে মাসের কয়েকদিন সিয়াম পালনের চেয়ে পুরো মাস সিয়াম পালনে বেশি সাওয়াব হওয়ার কথা।

(২) সারারাত তাহাজ্জুদ বা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতির বাইরে।

(৩) এরূপ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতি অপছন্দ করার নামান্তর বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

(৪) তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক নয়। তবে তার স্থিতি যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে।

(৫) তিনি তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদতকে বিদ'আত বলেছেন।

অন্যান্য অনেক হাদীসে এভাবে বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'নব-উদ্ভাবন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব আলোচনাকালে এ অর্থের অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে। কাজেই তোমার দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা বা গোমরাহী।"

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

"সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের (ﷺ) আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা এবং সকল পথভ্রষ্ঠতা জাহান্নামের মধ্যে।"[৯২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلامُ وَالْهَدْيُ فَأَحْسَنُ الْكَلامِ كَلامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ أَلا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"বিষয় শুধুমাত্র দুটি : বাণী ও আদর্শ। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ ও পথ হলো মুহম্মদ ﷺ -এর আদর্শ ও পথ। সাবধান! তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে; কারণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবউদ্ভাবিত বিষয়। আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"ই বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা।"[৯২৫]

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর যুগের মুসলমানদের: সাহাবীদের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।"

সহীহ মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।"[৯২৬]

তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ فِيْ بِدْعَةٍ وَمَنِ اسْتَنَّ بِيْ فَهُوَ مِنِّيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[৯২৭]

বিদ‘আত বিষয়ক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি দেখতে পাই:

(১) আভিধানিকভাবে সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদ‘আত বলা হয়, তবে হাদীসে নববীতে ‘আমাদের কর্মের মধ্যে’ বা ‘দীনের মধ্যে’ ‘নব উদ্ভাবিত বিষয়’-কে বিদ‘আত বলা হয়েছে।

(২) বিদ‘আতকে ‘সুন্নাতের’ বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকওয়া, আল্লাহর ভয় ও ইবাদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকেই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো মত, কথা, কর্ম বা রীতিকে তাকওয়া, বুজুর্গী বা ইবাদত বলে গণ্য করাই বিদ‘আত।

(৩) বিদ‘আত মূলত বর্জনের সুন্নাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি বা বলেন নি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা বর্জন করেছেন তা ইবাদতের উদ্দীপনায় করা বা বলা বা তাকে ইবাদত, কামালাত বা বুজুর্গি মনে করাকে বিদ‘আত বলা হয়েছে।

(৪) ইবাদতের উদ্দীপনাতেই বিদ‘আতের উৎপত্তি। ইবাদতের উদ্দীপনায় নেককার ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি, প্রকার বা রীতিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করলে তা বিদ‘আতে পরিণত হয়।

(৫) কবুলিয়্যাত বা সাওয়াবের আশাতেই বিদ‘আত করা হয়, এজন্য বিদ‘আত কবুল হবে না বলে বারংবার হাদীসে বলা হয়েছে এবং বিদ‘আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) আভিধানিকভাবে বিদ‘আত নিন্দনীয় নয়, বরং তা ভাল বা মন্দ হতে পারে। তবে হাদীসে নববীতে বিদ‘আত সর্বদা নিন্দনীয় এবং সকল বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা। এর কারণ যেখানে অপূর্ণতা আছে সেখানে নতুনত্ব প্রশংসনীয়। আর যেখানে পরিপূর্ণ পূর্ণতা বিদ্যমান সেখানে পূর্ণতার অতিরিক্ত কোনো সংযোজনীর প্রয়োজন আছে মনে করার অর্থই পূর্ণকে অপূর্ণ মনে করা।

৬. ১. ৪. সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে বিদ‘আত

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আব্‌দ্ আলকারী বলেন:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

“একদিন আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। কোথাও একব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) সালাত আদায় করছে। কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট্ট একটি জামাতে সালাত আদায় করছে। এ দেখে উমার বললেন: আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেওয়া ভালো হবে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি উবাই ইবনু কা’বকে ইমাম নিযুক্ত করে একত্রে (তারবীহের) সালাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তাঁর সাথে বের হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে জামাতে সালাত (তারাবীহ) আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে উমার বললেন: এটি একটি ভালো বিদ‘আত, তবে যা থেকে এরা ঘুমিয়ে থাকে তা বেশি উত্তম। তিনি বুঝালেন যে, এ সকল মানুষ প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু শেষ রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো হতো।”[৯২৮]

কিয়ামুল্লাইল অর্থাৎ রাতের সালাত বা তারাবীহের নিয়মিত জামাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে না থাকতে উমার তাকে ‘বিদ‘আত’ বলেছেন। স্বভাবতই একান্তই আভিধানিক অর্থে তা ‘বিদ‘আত’ বা নতুন বিষয়, কারণ দীনের মধ্যে তা নতুন নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি:

(১) রামাদানের রত্রিতে কিয়ামুল্লাইল গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত।

(২) কিয়ামুল্লাইলে কুরআন পাঠ ও খতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত।

(৩) এ জন্য জামা‘আত সুন্নাত-সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কয়েকবার জামা‘আতে তা আদায় করেছেন। তবে ফরয হওয়ার আশংকায় নিয়মিত জামাতে আদায় করেন নি।

(৪) রামাদানের কিয়ামুল্লাইল, কিয়ামুল্লাইলে কুরআন খতম ও মাঝে মাঝে জামাতে আদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। তা নিয়মিত জামাতে আদায়ের রীতি তাঁর সময়ে ছিল না। এজন্য উমার (রা) একে বিদ‘আত বলেছেন। তিনি একে ভাল বিদ‘আত বলেছেন।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বিদ‘আতকে বিভ্রান্তি বললেন, অথচ উমার কিভাবে একটি বিদ‘আতকে ভাল বিদ‘আত বললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আভিধানিক অর্থেই এ কর্মকে বিদ‘আত বলেছেন এবং সে অর্থে একে ভাল বিদ‘আত বলেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক ব্যতিক্রমের অধিকার রাসূলুল্লাহ ﷺ খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণকে দিয়েছেন এবং এরূপ কর্মকে তাঁদের সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। কোন্ কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কারণে করেন নি, তবে তাঁর পরে করা যেতে পারে, তাও তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতেন। এ জ্ঞানের আলোকেই উমার (রা) নিয়মিত কিয়ামুল্লাইলের জামা‘আতকে ‘ভাল বিদ‘আত’ বলেছেন।

সুন্নাতের আলোকে খুলাফায়ে রাশেদীনের এরূপ কর্ম এবং জাগতিক, সাংসারিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছাড়া

ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে সাহাবীগণ সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল প্রকার ইবাদত, বন্দেগি, নেককর্ম, মতামত, বিশ্বাস সবই বিদ'আত। তাঁরা সর্বদা 'সুন্নাতে'র বিপরীতে 'বিদ'আত' এবং 'ইত্তিবা' বা অনুসরণের বিপরীতে 'ইবতিদা' বা উদ্ভাবন উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে এ অর্থে কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি। এক হাদীসে ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন :

فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ

"তোমরা অবশ্যই ইল্‌ম শিক্ষা করবে। আর খবরদার! তোমর কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হবে না, খবরদার! তোমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না। খবরদার! তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।"[৯২৯]

তিনি আরো বলেন :

اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ

"তোমরা অনুসরণ কর, উদ্ভাবন করো না, কারণ দীনের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ।"[৯৩০]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন :

اَلاِقْتِصَادُ فِيْ السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الاجْتِهَادِ فِيْ الْبِدْعَةِ

"বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নাতের উপর অল্প আমল করা উত্তম।"[৯৩১]

উসমান বিন হাদির বলেন: আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে বলি: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন:

نَعَمْ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالاسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلا تَبْتَدِعْ

"হ্যাঁ, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে। তুমি অনুসরণ বা ইত্তিবা করবে, বিদ'আত উদ্ভাবন করবে না।"[৯৩২]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

مَا أَتَى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلاَّ أَحْدَثُوْا فِيْهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيْهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوْتَ السُّنَنُ

"প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ'আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলীন হয়ে যাবে।"[৯৩৩]

ইমাম সূয়ূতী (রাহ) বর্ণনা করেছেন, হুযাইফা (রা) বলেন:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلاَ تَتَعَبَّدُوْا بِهَا؛ فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآخِرِ مَقَالاً، فَاتَّقُوا اللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، خُذُوا طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"সাহাবায়ে কেরামগণ যে ইবাদত করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোনো নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উদ্ভাবন করার) কোনো সুযোগ রেখে যাননি। হে আল্লাহর পথের পথিকগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।"[৯৩৪]

হুযাইফাহ (রা.) দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন: তোমরা কি দুটি পাথরের মাঝখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছ? তাঁরা বলেন: খুব সামান্য আলোই পাথর দুটির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ، حَتَّى لاَ يُرَى مِنَ الْحَقِّ إِلاَّ قَدْرُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنَ النُّوْرِ، وَاللهِ لَتَفْشُوَنَّ الْبِدَعُ حَتَّى إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالُوْا: تُرِكَتِ السُّنَّةُ

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি: বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এই দুটি পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে : সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই

সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে)।[৯৩৫]

গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন:

بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ يَا أَبَا أَسْمَاءَ إِنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ قَالَ وَمَا هُمَا قَالَ رَفْعُ الأَيْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي وَلَسْتُ مُجِيبَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. قَالَ لِمَ؟ قَالَ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَة

"উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান (খিলাফাত ৬৫-৮৬ হি./ ৬৮৪-৭০৩ খ্রি.) আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ বললেন: বিষয় দুটি কী কী? খলীফা বললেন: বিষয় দুটি হলো: (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর খুত্বার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় হাত তুলে দু'আ করা এবং (২). ফজর এবং আসরের সালাতের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ করা। তখন গুদাইফ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুটি বিষয় আমার মতে তোমাদের বিদ'আতগুলির মধ্য থেকে সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এ দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না। খলীফা বললেন: কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? গুদাইফ বলেন: কারণ নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।"[৯৩৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুটি বিষয় গুদাইফ বিদ'আত বলেছেন দু'টি বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত। জুমআর খুৎবা প্রদানের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দু'আর সময় দু হাত তুলার কথাও প্রমাণিত। খুত্বা চলাকালীন সময়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে তিনি দুহাত উঠিয়েছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে কোনো যুক্তি তর্কে আমরা বলতে পারি খুৎবার সময় দু'আ করা জায়েয, দু'আর সময় দু'হাত তোলাও জায়েয এবং খুৎবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ করাও জায়েয। কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া খুৎবার মধ্যে অন্য কোনো দু'আতে তিনি দুহাত উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দু'আ করতেন। আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন। তিনি যতটুকু করেছেন তাঁর একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা.) একদিন বলেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ! فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلالَةٌ.

"তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মুমিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়ত কোনো ব্যক্তি বলবে : মানুষের কী হলো, আমি কুরআন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না? কুরআন ছাড়া কোনো নতুন মত বা কাজ উদ্ভাবন না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। (আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোনো মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা) খবরদার! তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথভ্রষ্ঠতা।"[৯৩৭]

এ হাদীসের আলোচনায় আল্লামা শাতিবী উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতের উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদতে আধিক্য অর্জন। বিদ'আতী আল্লাহর ইবাদতের দিকেই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, ইবাদতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী মনে করেন না। এছাড়া মানবীয় প্রকৃতি পুরাতন ও নিয়মিত কর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা লাভ করা যায় যা পুরাতনের মধ্যে থাকে না। এজন্য বলা হয় 'প্রত্যেক নতুনের মধ্যেই মজা'। বিদ'আতীদের তত্ত্ব এই যে, মানুষের মধ্যে অপরাধ বেড়ে গেলে যেমন অপরাধ ধরা ও বিচার করার জন্য পদ্ধতিও বেড়ে যায়, অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে ইবাদতে অবহেলা প্রসার লাভ করলে তাদের অবহেলা কাটাতে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মু'আয (রা) এ বিষয়েই সাবধান করেছেন। শাতিবী বলেন, এদ্বারা বুঝা যায় যে, ইবাদতের বাইরে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য নয়।[৯৩৮]

৬. ১. ৫. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছি। আমরা দেখছি যে,

সাহাবীগণ দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদেরকে বারংবার সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং বিদ'আত, উদ্ভাবন বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলে জানাচ্ছেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে দীনের বিষয়ে উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ'আতের উৎপত্তি হয়। সাহাবীদের সাহচার্য বঞ্চিত আবেগী ধার্মিক মানুষেরা দীন পালনের বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মত, বিশ্বাস বা কর্মের মধ্যে নিপতিত হতে থাকে। সাহাবীগণ এ সকল ব্যতিক্রম প্রতিরোধে সচেষ্ট ছিলেন। এরপরও ক্রমান্বয়ে বিদ'আত প্রসার লাভ করতে থাকে।

এ সকল বিদ'আত দু ভাগে বিভক্ত: (১) আকীদা বা বিশ্বাসের বিদ'আত (**البدعــة العقديــة**) এবং কর্মের বিদ'আত (**البدعــة العمليــة**)। আমাদের আলোচনা আকীদার বিদ'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, কারণ ইফতিরাক মূলত আকীদার বিদ'আতকে কেন্দ্র করে। কর্ম বিষয়ক বিদ'আত সম্পর্কে আমি 'এহইয়উস সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ৩০-৩৫ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীগণ নবী-বংশের ভালবাসা ও ভক্তির নামে বিভিন্ন বিদ'আতী আকীদা প্রচলন করে, যা কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাদের এ সকল বিদ'আতী বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে:

(১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আলীর (রা) রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং ইসলামী আকীদার মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(২) আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ।

(৩) আলী (রা) তাঁর মৃত্যুর পরে আবার ফিরে আসবেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বিশেষ কিছু গোপন ইলম দান করেছেন এবং আলীর (রা) নিকট গুপ্ত ইলমের ভাণ্ডার রয়েছে।

(৫) আলী (রা)-এর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, সম্পর্ক বা বিশেষত্ব রয়েছে বা তিনি অবতার।

(৭) সাহাবীগণের প্রতি কুধারণা পোষণ করা, তাঁদেরকে ধর্মচ্যুত বা মুরতাদ মনে করা ও তাঁদের সকলকে বা অধিকাংশকে গালি দেওয়া।

প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সকল বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা কিছু মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। আলী (রা) নিজে এদের বিভ্রান্তি দূর করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যারা তাঁর উলূহিয়্যাত বা 'আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক' দাবি করত বা তাকে সাজদা করত তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সর্বশেষ যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে তাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

আলী (রা)-এর সময় থেকে (৩৫-৪০হি) খারিজীগণের বিদ'আতী আকীদার উন্মেষ ঘটে। তাদের বিদ'আতী আকীদার মধ্যে রয়েছে:

(১) কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিম কাফির বলে গণ্য।

(২) পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের ইমামত অবৈধ এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

প্রথম হিজরীর শেষভাগ থেকে কাদারীয়াদের বিদ'আতের উন্মেষ ঘটে। এসময়ে ক্রমান্বয়ে মুরজিয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আকীদাগত বিদ'আতসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আমরা এদের বিদ'আতী আকীদাগুলি ফিরকাসমূহের আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ১. ৬. সুন্নাত ও বিদ'আত: তুলনা ও পার্থক্য

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রকৃত অনুসারী এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুধাবনকারী বলে দাবি করেছে। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে একমাত্র নাজাত-প্রাপ্ত ফিরকা বলে দাবি করেছে। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে তাদের মতের পক্ষে অনেক 'অকাট্য (!) দলীল প্রদান করেছে। এ সকল দাবির যথার্থতা বুঝতে হলে সুন্নাতের সঠিক পরিচয় বুঝতে হবে। আমরা দেখব যে, কথায় ও কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর বা ওহীর হুবহু অনুসরণই সুন্নাত। এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য অনুধাবনের জন্য।

সাহাবীগণ সম্পর্কে শীয়া আকীদা ও নাসিবী আকীদা

শীয়গণের একটি বিদ'আতী মত এই যে, হাতে গোনা অল্প কয়েকজন সাহাবী ছাড়া আবূ বাকর (রা), উমার (রা), উসমান (র) ও অন্যান্য সকল সাহাবী (رضي الله عنهم) ধর্মত্যাগ করেছিলেন বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযূ বিল্লাহ!)। এর বিপরীতে 'নাসিবাহ' (**الناصبة**) সম্প্রদায়ের বিদ'আতী আকীদা এই যে, আলী (রা) সত্য-বিচ্যুত ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ককে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেন এবং তিনি ক্ষমতার লোভে হাজার হাজার মানুষের রক্তপাতের ব্যবস্থা করেন। তার সময়ের সকল গৃহযদ্ধের জন্য তিনি দায়ী। (নাউযূ বিল্লাহ!)

এরা কয়েকটি হাদীসকে তাদের মতের পক্ষে অকাট্য (!) দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي

فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

"কিয়ামতের দিন প্রথম কাপড় পরানো হবে ইবরাহীম (আ)-কে। আমার সাহাবীদের কিছু মানুষকে ধরে বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, আমার সাহাবীগণ! আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: আপনি এদেরকে ছেড়ে চলে আসার পর থেকে তারা অবিরত পিছিয়ে যেতেই (ধর্মত্যাগ করতেই) থেকেছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা (ইসা আ.) যে কথা কলেছেন সে কথাই বরব, আমি বলব[৯৩৯]: 'আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে ফেরত নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক, আর আপনি তো সর্ব-বিষয়ে সাক্ষী।"[৯৪০]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

"আমি হাউযের নিকট তোমাদের অগ্রবর্তী থাকব। কিছু মানুষের বিষয়ে আমি বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত পরাভূত হব। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, আমার সাহাবীগণ, আমার সাহাবীগণ! তখন বলা হবে: 'আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না।"[৯৪১]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

"আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ হাউযে আমার নিকট আগমন করবে। আমি যখন তাদের চিনতে পারব তখন তাদেরকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি তখন বলব: আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: "আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না।"[৯৪২]

উভয় সম্প্রদায় দাবি করে যে, এ সকল হাদীস তাদের মতের অকাট্য (!) দলিল। নাসিবীদের মতে এ সকল হাদীস আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর শীয়াগণ দাবি করেন যে, এগুলি আলী (রা) ও তাঁর একান্ত সঙ্গী কতিপয় সাহাবী বাদে সকল সাহাবীর বিষয়ে বলা হয়েছে। তাদের মতে এ সকল হাদীস প্রমাণ করে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আলী (রা)-কে ক্ষমতা প্রদান না করে সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে যান (নাউযু বিল্লাহ!)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে,

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাঁদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক স্থানে স্পষ্টত তাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(২) বিশেষ করে প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে।

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার সমাজে কিছু মুনাফিক বাস করত, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যেই মিশে থাকত এবং বাহ্যত তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এদের অধিকাংশই তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি। এদের বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

"মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দিব ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা-শাস্তির দিকে।"[৯৪৩]

(৬) এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরে তাঁর কাছে ইসলামগ্রহণকারী কিছু মানুষ ও আরবের

অন্যান্য অনেক মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করে। কেউ ভণ্ডনবীদের অনুসারী হয়ে যায় এবং কেউ যাকাত অস্বীকার করে।

এ সকল দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক কয়েকটি হাদীসকে তারা তাদের মতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ সকল হাদীসে কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি, অধিকাংশ সাহাবীর কথাও বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে যে, সাহাবী বলে পরিচিত কতিপয় মানুষ। শীয়াগণ ও নাসিবীগণ এ সকল হাদীসের শাব্দিক বক্তব্যকে গ্রহণ করে তার মধ্যে নিজেদের আকীদা সীমাবদ্ধ রাখে নি। এ হাদীসকে তাদের মতের 'বাহন' হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা নিজেদের মর্জি, পছন্দ ও অভিরুচি মত একটি মত বা আকীদা উদ্ভাবন করেছে যা তারা যেভাবে বলে সেভাবে কখনোই কুরআন কারীমে বা হাদীসে পাওয়া যায় না। এখানেই বিদ'আত ও সুন্নাতের পার্থক্য।

কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আকীদা: সকল সাহাবীর মর্যাদা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা, তাবূকযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা, বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা এবং সর্বোপরি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারদের সর্বোচ্চ মর্যাদা। তাঁদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা। পাশাপাশি এ বিশ্বাস যে, সাহাবী নামধারী বা সাহাবী বলে পরিচিত কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ বা পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে সাহাবীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমকালীন মদীনার বা আশেপাশে অবস্থানরত মুনাফিকগণ, যাদের কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, অথবা তাঁর ওফাতের পরে ভণ্ড নবীদের কারণে বা যাকাত অস্বীকার করার কারণে যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হন।

বিদ'আতী আকীদা: প্রায় সকল সাহাবীই সুপথ থেকে বিচ্যুত হন (নাউযূ বিল্লাহ!) কেবলমাত্র কয়েকজন সুপথে ছিলেন। তাঁদের মর্যাদার মাপকাঠি আলী (রা) ইমামতের পক্ষে কথা বলা।

দ্বিতীয় বিদ'আতী আকীদা: আলী (রা) ও তাঁর সাথী সাহাবীগণ সুপথ থেকে বিচ্যুত ছিলেন।

উভয় সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে উপরের হাদীসগুলির মত আরো অনেক সাধারণ অর্থবোধক আয়াত বা হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন এবং এর বিপরীতে সাহাবীগণের মর্যাদা বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন।

এখানে আমরা সুন্নাতপন্থী ও বিদ'আতপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছি। সুন্নাতপন্থীগণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত সকল বিষয় সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করেন। কোনোরূপ বৈপরীত্য সন্ধান করেন না। বাহ্যিক কোনো বৈপরীত্য দেখা গেলে তা কুরআন ও হাদীসের আলোকেই সমাধান করেন।

এখানে কুরআনের অনেক আয়াতে সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণিত। এর বিপরীতে কুরআনের একটি আয়াতেও সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। অগণিত হাদীসে সাধারণভাবে এবং নাম উল্লেখ করে সাহাবীগণের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির বিপরীতে কোনো একটি হাদীসেও সাহাবীগণের অমর্যাদা বা বিচ্যুতির কথা বলা হয় নি। এখানে কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সাহাবী হিসেবে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তিকে হাউয থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদের বিষয়ে বলা হবে যে, এরা আপনার পরে পশ্চাদপসরণ করেছিল বা নব-উদ্ভাবন করেছিল।

মূলত এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আর কোনো বৈপরীত্য থাকলে তাও সুন্নাতের আলোকে সমাধান করতে হবে। কুরআনের নির্দেশনা, মুতাওয়াতির হাদীসের নির্দেশনা অগ্রবর্তী থাকবে। এছাড়া অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াত বা হাদীসের কারণে সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সুনির্দিষ্ট নাম বা বৈশিষ্ট্যসহ মর্যাদা প্রকাশক হাদীসগুলি ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াত বা হাদীসকে সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসের বিপরীতে ব্যাখ্যা করতে হবে। কোনো তাফসীর, ব্যাখ্যা বা ব্যক্তিগত মতামতকে ওহীর বিপরীতে দাঁড় করানো যায় না বা এরূপ কিছুর ভিত্তিতে ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যাখ্যা করা যায় না। কেউ এর বিপরীত করলে বুঝতে হবে যে, সে নিজের মতকে ওহীর অনুসারী ও অনুগামী করতে রাযি নয়, বরং সে ওহীকে তার মতের অনুগামী ও অনুসারী বানাতে ইচ্ছুক। পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় আমরা দেখব যে, সকল বিদ'আতী আকীদা ও সুন্নী আকীদা একইরূপ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝতে পারি। সুন্নাত হলো ওহীর বা কুরআন-হাদীসের হুবহু অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যতটুক যেভাবে বলেছেন তা ততটুকু সেভাবেই বলা এবং যা বলেন নি তা বলা না বলা। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে ঈমান-আকীদা সীমাবদ্ধ রাখা। কুরআন বা হাদীসের সাথে নিজেদের ব্যাখ্যা, মতামত বা যুক্তি যোগ করে তা আকীদার অংশ না বানান। কুরআন ও হাদীসের সকল কথা সমানভাবে বিশ্বাস করা। কোনো কথা গ্রহণ ও বাকি কথা বাতিল না করা। ব্যাখ্যা করে কোনো ওহী বাতিল না করা, বরং ব্যাখ্যা করে সকল ওহী গ্রহণ করা।

পক্ষান্তরে বিদ'আত অর্থ ওহীর সাথে কোনো কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রম করে তা বিশ্বাস বা আকীদার অংশে পরিণত করা। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বলেন নি তা বলা, অথবা ব্যাখ্যা বা সমন্বয়ের নামে ওহীর অতিরিক্ত কিছু আকীদার মধ্যে সংযোজন করা অথবা ওহীর কিছু অংশ ব্যাখ্যার নামে বাদ দেওয়া। বিদ'আতপন্থীগণ সুন্নাতের অনুসরণ দাবি করেন। কিন্তু তাদের আকীদা বা বিশ্বাসগুলি হুবহু সুন্নাতের মধ্যে নেই। বরং তাদের আকীদা বা বিশ্বাস সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন।

৬. ২. ইফতিরাক ও ইখতিলাফ

ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভাজন ইসলামী আকীদার অন্যতম বিষয়। সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ও বিদ'আতের উদ্ভাবনই ইফতিরাকের মূল কারণ। ইফতিরাক বা বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর।

৬. ২. ১. ইফতিরাক

ইফতিরাক (**الافتراق**) শব্দটি আরবী 'ফারক', 'ফারাকা' (**فرق**) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা,

বিচ্ছিন করা ইত্যাদি। ইফতিরাক (**الافتراق**) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। ফির্কা (**الفرقة**) অর্থ দল, সংগঠন।

ইফ্তিরাক (**الافتراق**) শব্দটি 'ইজতিমা' (**الاجتماع**) শব্দটির বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৯৪৪]

এখানে আল্লাহ জামা'আত (**الجماعة**) বা ইজতিমা (**الاجتماع**)-এর বিপরীতে 'ইফতিরাক' ও 'তাফার্রুক' উল্লেখ করেছেন। ইজতিমা অর্থ ঐক্যবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া, দলবিহীন হওয়া ইত্যাদি।

৬. ২. ২. ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ

ইফতিরাকের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ 'ইখতিলাফ'। ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা। ইফতিরাক ও ইখতিলাফ-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ বা মতবিরোধিতা সাধারণভাবে বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি নয়। মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র 'হক্ক' ও অন্যমতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের 'অন্যদল' মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা 'বিচ্ছিন্নতা'-য় পরিণত হয়।

'ইখতিলাফ' ও 'ইফতিরাক'-এর পাথ্যর্কের মধ্যে রয়েছে:

(১) ইফতিরাক বা ফিরকাবাজি ইখতিলাফ বা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।

(২) সকল ইফতিরাকই (দলাদলি) ইখতিলাফ (মতভেদ), তবে সকল ইখতিলাফ (মতভেদ) ইফতিরাক (দলাদলি) নয়। ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।

(২) ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম ও আলিমদের মধ্যে 'মতভেদ' বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না।

(৩) শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়, বরং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

(৪) ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত নয়, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কার-প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি পুরস্কার লাভ করেন।

(৫) ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও ইখলাসের অনুপস্থিতি। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তি ও অন্যমতের আলিমকে 'বিভ্রান্ত' বলে মনে করেন না, বরং তার দলিলকে দুর্বল বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন।

(৬) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃতবোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলির সাথে 'ইফতিরাক' থাকতে পারে না। কেবলমাত্র এগুলির অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

(৭) ইখতিলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত, পক্ষান্তরে ইফতিরাক সকল ক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংস।

৬. ৩. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইফতিরাক

৬. ৩. ১. পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে ইফতিরাক

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে আসমানী হেদায়াত প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলি ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মূল কারণ ছিল ওহীর শিক্ষার ব্যতিক্রম করা বা ওহীর কিছু শিক্ষা ভুলে যাওয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করা, অতিভক্তি, পূর্ববর্তী গুরুদের অন্ধভক্তি ও অনুকরণ ইত্যাদি।

ইহূদী-খৃস্টানদের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"যারা বলে 'আমরা খৃস্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তার ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি। তারা যা করত আল্লাহ তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন।"[৯৪৫]

এ আয়াতে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানদের বিভক্তির মূল কারণ ছিল তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বা তাদের উপর

নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়া। আমরা দেখেছি যে, তাদের এ ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। তারা আল্লাহর কিতাব সাধারণ মানুষদের পড়তে দিত না, অনেক অবহেলা ও অযত্নে কিতাবের অনেক অংশ হারিয়ে ফেলে, অনেক কিছু পরিবর্তন করে এবং মনগড়া কথা রচনা করে তা দিয়ে মূল কিতাবের শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়।

অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অভাব, মতভেদকে শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, নিজের মতকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি ছিল পূর্ববর্তী উম্মাতদের ইফতিরাকের কারণ ও প্রকাশ। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

"তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন।"[৯৪৬]

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইফতিরাক ও দলাদলির কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং জ্ঞান আসার পরেও জিদ, হিংসা, ঔদ্ধত্য, নিজ মত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপরি ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

"তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজদের মধ্যে বিভেদ-দলাদলি করে।"[৯৪৭]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"এবং তোমাদের এ জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।"[৯৪৮]

আহলু কিতাবের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে ওহীর অতিরিক্ত মতামত উদ্ভাবন। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ

"হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না 'তিন'...।[৯৪৯]

আমরা দেখেছি যে, খৃস্টানগণ ওহীর শব্দগুলির অতিভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করে এরূপ ব্যাখ্যার উপর আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। খৃস্টধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, ঈসা (আ) কেন্দ্রিক বাড়াবাড়িই তাদের মধ্যকার সকল দলাদলি ও ফিরকাবাজির মূল বিষয় ছিল। ত্রিত্ববাদ নামক মনগড়া মতবাদ এবং ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা নিয়েই তাদের যত ফিরকাবাজি।

বিশ্বাসের মধ্যে ওহীর সাথে ব্যাখ্যার নামে মানবীয় মতামত, দর্শন ইত্যাদি যোগ করে তাকে ধর্মে বা ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করাকে কুরআন কারীমে 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরেকটি দিক ছিল কতিপয় 'পণ্ডিতের' প্রতি পরবর্তীদের অন্ধ ভক্তি ও তাদের মনগড়া মতামতের অন্ধ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের 'হাওয়া' অর্থাৎ প্রবৃত্তি, মনগড়া মত বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[৯৫০]

৬. ৩. ২. মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মাতকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ধর্মকে বিভক্ত করে

তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্ক থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ক একটি আয়াত এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছি। যে আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না বা দলাদলি করো না।" অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"[৯৫১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধচিত্তে তার অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"[৯৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[৯৫৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, করলে সেগুলি তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।"[৯৫৪]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির মধ্যে বিভক্তি এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে। 'যাতু আনওয়াত' বৃক্ষ বিষয়ক হাদীসটি আমরা 'তাবার্রুক বিষয়ক শিরকের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসে "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।"

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟

"তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে পদে অনুসরণ করবে: বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে।" আমরা বললাম: পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহূদী-খৃস্টানরা?" তিনি বলেন: 'তবে আর কারা?"[৯৫৫]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلا أُولَئِكَ

"কিয়ামত আগমনের আগেই আমার উম্মাত পূর্ববর্তী জাতিগুলি রীতি গ্রহণ করবে, বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে। তখন বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের মত?' তিনি বলেন: 'তাদেরকে বাদ দিলে আর মানুষ কারা?"[৯৫৬]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যাধির কারণে বিভক্তি ঘটে তা উল্লেখ করেছেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ...

“পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। বিদ্বেষ মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দীন মুণ্ডন করে।”[৯৫৭]

প্রথম অধ্যায়ে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোন প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।”

এ হাদীসে তিনি বিভক্তি থেকে আত্মরক্ষার পথ জানিয়েছেন, তা হলো, তাঁর ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অটল থাকা। অন্য হাদীসে তিনি বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের প্রকৃতি ও বিভক্তির সময় উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

“আমার পূর্বে যে উম্মাতের মধ্যেই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই উম্মাতের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাহাবী ছিলেন, তাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতেন। অতঃপর তাদের পরে এমন একদল উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটে যারা যা বলে তা করে না এবং যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা তারা করে। কাজেই যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি এদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। এর পরে আর শরিষা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকে না।”[৯৫৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে। এছাড়া তিনি সাহাবীগণের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক হাদীসে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন।

আলী এবং ইবনু মাসউদ (رضي الله عنهما) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ (أَحْدَاثُ) الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ) (يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلامِ (مِنَ الْحَقِّ) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।”[৯৫৯]

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বানীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[৯৬০]

উপরের সহীহ হাদীসগুলি সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এসকল হাদীস থেকে আমরা উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি ও বিভক্তির কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি। অন্য কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

"ইহূদীরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খৃস্টানগণও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"[৯৬১]

অন্য হাদীসে মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الكتابين) افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

"তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহূদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে। এ দলটি হলো জামা'আত।"[৯৬২]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْحَابِي

"ইসরায়েল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল বাদে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন: 'আমি এবং আমার সাহাবীগণ এখন যার উপর আছি।"[৯৬৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা একত্রিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর দীন ও হেদায়াত লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এরূপ বিভক্তি আসবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, বিভক্তদের দল-উপদল অনেক হলেও অনুসারী কম। কারণ আমরা দেখব যে, বিভক্তির মূল কারণ আকীদার উৎস হিসেবে ওহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ওহীর সাথে মানবীয় যুক্তি বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করা। আর এ পথ খুললেই বিভক্তির পথ খুলে যায়। এজন্য ফিরকাগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীন বিভক্তি খুবই বেশি। এতে ফিরকার সংখ্যা বাড়লেও অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, উপরের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভক্ত ৭৩ দলের ৭২ দলই জাহান্নামী। এর অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির বা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী। বরং এরা বিশ্বাসগত পাপের কারণে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকীদাগত বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। তাদেরকে বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন। তবে বিভ্রান্ত দল ও সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ছাড়া সকলকেই কফির বলে গণ্য করত ও করে।

৬. ৩. ৩. ইফতিরাকের কারণ

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী উম্মাত এবং এ উম্মাতের মধ্যে ইফতিরাক বা বিভক্তির কারণগুলি নিম্নরূপ:

৬. ৩. ৩. ১. ওহী ভুলে যাওয়া

কুরআন কারীমে আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মাতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত ওহীর একটি অংশ ভুলে গিয়েছিল, ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা একটু আগে দেখেছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।"[৯৬৪]

ওহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। অবহেলার মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া, ব্যাখ্যার নামে মূল ওহী বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাকেই ওহীর স্থলাভিষিক্ত করা, আহবার-রুহবানদের মাসূম বা নিষ্পাপ-নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে ওহীর সমতুল্য বলে গণ্য করা, ওহীর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা কথা প্রচার করা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বাদ দেওয়া, জাগতিক স্বার্থের কারণে ওহীর নির্দেশনা বিকৃত করা ইত্যাদি। পূর্ববর্তী জাতিগুলির ন্যায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি

মূল কারণ। বিভিন্নভাবে এরা ওহী ভুলেছে বা ভুলাতে চেষ্টা করেছে। যেমন:

(ক) ওহী বা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যার অধিকার কারো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে সরিয়ে রাখা। বিশেষ করে শীয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদাগুলির এটি অন্যতম।

(খ) ওহীর ব্যাখ্যায় কোনো আলিম, মা'সূম ইমামের বা অন্য কারো বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবি করে তার 'ইলম লাদুন্নী', কাশফ, ব্যাখ্যা বা মতামতকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া। এটিও শীয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম।

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে অন্য কোনো মানুষের নিষ্পাপত্ব বা নির্ভুলত্বে বা তাঁর ইলম লাদুন্নী, কাশফ বা ইলহামের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করে তার মতামতকে ওহীর সমতুল্য বা ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা। এতে মূল ওহীর আর কোনোই মূল্য থাকে না। কেবলমাত্র ওহীর ব্যাখ্যা নামে কথিত ইমামের মতামতই আকীদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায়। এটিও শীয়াদের বিভ্রান্তি র মৌলিক দিক।

(ঘ) ওহীর পাশাপাশি দর্শন, বৃদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে ওহীর মতই আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ওহীর তাফসীর বা ব্যাখার নামে নিজেদের বা কোনো আলিম বা বুজুর্গের মতামতকে ওহীর সাথে আকীদার অংশ বানিয়ে দেওয়া। সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(চ) তাবীল-ব্যাখ্যার নামে ওহীর কিছু বিষয় বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকীদার মধ্যে গণ্য করা। এতে ওহীর মূল ভাষা আকীদা থেকে 'ভুলে যাওয়া' হয়। সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ছ) বানোয়াট কথা বানিয়ে ওহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা বা জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার উপরে আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শীয়া ও অন্যান্য অনেক ফিরকার বৈশিষ্ট্য।

৬. ৩. ৩. ২. হাওয়া (الهوى) বা মনগড়া মতামতের অনুসরণ

হা, ওয়াও ও ইয়া তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত শব্দটির মূল অর্থ শূন্য হওয়া, খালি হওয়া বা নিপতিত হওয়া। এ ক্রিয়ামূল থেকে দু প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়: (ضرب يضرب) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাওয়া-ইয়াহবী (هَوَى، يَهْوِي) এবং এক্ষেত্রে অর্থ হয় নিপতিত হওয়া। এ ক্রিয়ার মাসদার: হুবিয়্যান (هُوِيًّا)। আর (سمع يسمع) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাবিয়া-ইয়াহবা (هَوِيَ يَهْوَى) অর্থাৎ ভালবাসা, প্রেম করা, পছন্দ করা, ইত্যাদি। এ ক্রিয়ার মাসদার 'হাওয়ান' (هَوَى)। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাওয়া (الهوى) শব্দের অর্থ প্রেম, ভাললাগা, পছন্দ করা (love, passion, wish, desire, pleasure) ইত্যাদি। বহু বচন: আহওয়া (الأهواء)।[৯৬৫]

কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হাওয়ান নাফস' (هوى النفس) বা ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে 'আহওয়া' (أهواء) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِي الأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ

"তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহূদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তারা পছন্দ বা মনগড়া মতের (**أهواء**) অনুসরণ করবে। এরা সকলেই জাহান্নমী, কেবলমাত্র একটি দল বাদে, যারা 'আল-জামা'আত'। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দল বের হবে যাদের মধ্যে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমনভাবে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে। তার দেহের সকল শিরা, উপশিরা ও অস্তিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।"[৯৬৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ 'ইত্তিবাউল হাওয়া' বা পছন্দের অনুসরণ বা মনগড়া মতের অনুসরণ। বস্তুত ধর্ম ও বিশ্বাসের মূল হলো ওহীর নিকট আত্মসমর্পণ। এর স্বরূপ হলো কোনো শিক্ষা বা নির্দেশনা ওহী বলে প্রমাণিত হলে নিজের মত বা পছন্দ-অপছন্দকে তার অধীন করে দেওয়া। প্রয়োজনে নিজের মত বা নিজের মনোনীত ব্যক্তির মত ব্যাখ্যা করে বাদ দিয়ে ওহীর মত ব্যাখ্যাতীতভাবে গ্রহণ করা।

এর বিপরীত হলো ইত্তিবাউল হাওয়া বা নিজের মনমর্যি বা পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা। এর স্বরূপ হলো, একটি মত বা কর্ম মানুষের কোনো কারণে ভাল লাগবে বা সঠিক বলে মনে হবে। এরপর সে এই মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। ওহীর যে বিষয়টি তার মতের পক্ষে থাকবে সেটি সে গ্রহণ করবে। আর যে বিষয়টি তার মতের বিরুদ্ধে যাবে তা সে প্রত্যাখ্যান করবে বা ব্যাখ্যা করবে।

আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ পূর্ববর্তী ধর্ম, প্রচলিত দর্শন, সামাজিক রীতি বা বিশ্বাসের প্রভাবে বা পূর্বপুরুষদের মতামতের প্রভাবে একটি বিশ্বাস বা কর্মকে ভালবেসে ফেলেন। এরপর তার কাছে ওহীর বিষয় প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণ করতে পারেন না। বরং ওহীর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বা না করে উড়িয়ে দেন এবং পছন্দনীয় মতটিই ধরে থাকেন। ইহূদী-খৃস্টানগণ এবং আরবের

কাফিরদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি ছিল অন্যতম কারণ। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ও বিভক্ত দলগুলিরও এটি মূল বৈশিষ্ট্য।

৬. ৩. ৩. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা বিভক্তি বা ইফতিরাকের অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের মধ্যে অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে। দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায় অথবা মতভেদসহ-ই অবিচ্ছিন্ন থাকা যায়: (১) ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং (২) পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন মতভেদ নিরসন করে বা মতভেদের গুরুত্ব কমিয়ে আনে। মতভেদকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ যদি ওহীর মাধ্যমে যা জানা যায় সেটুকু মূল ধরে ওহীর অতিরিক্ত বিষয়কে অমৌলিক সহ্যযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন তবে মতভেদের তীব্রতা কমে যায়। পাশাপাশি আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অপরের মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে।

মতভেদীয় সকল বিষয়কেই এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। সাহাবীগণের সকলের মর্যাদার স্বীকারোক্তিসহ তাঁদের পারস্পরিক তারতম্য নির্ধারণের বিষয়ে, ঈমানের প্রকৃতি ও কবীরা গোনাহকারী বিধানের বিষয়ে, তাকদীর ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে, আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার জন্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি সকলে এ বিষয়ে একমত হতেন যে, ওহীর মাধ্যমে বা কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক জানা যায় তা আমরা গ্রহণ করব। বাকি সমন্বয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে যা বলব তা ওহীর মত চূড়ান্ত বলে গণ্য করব না। বরং এগুলিকে ইজতিহাদী ব্যাখ্যা কাজেই এগুলির সমাধান না হলেও আমরা একে অপরের মত সহ্য করব। কারণ আমরা সকলেই একই ধর্মের অনুসারী ও পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ।

আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব সাহাবীগণের মধ্যে এদুটি বিষয়ে প্রগাঢ় বিদ্যমানতার কারণে তাঁদের মতভেদ কখনো বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিম ও ইমামগণও এদুটি বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে একদিকে তাঁরা তাঁদের আভ্যন্তরীন মতভেদগুলি সহজভাবে নিয়েছেন এবং তাঁদের মতভেদ বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয় নি। অপরদিকে তারা বিচ্ছিন্ন ফিরকাসমূহের মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতাও যথাসম্ভব সহজ করে দেখেছেন। তাদেরকে ভুলের মধ্যে নিপতিত ও বিভ্রান্তির শিকার বললেও ওহীর কোনো বিষয় সুস্পষ্ট অস্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁরা তাদেরকে কাফির বলেন নি। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন:

لا يكفر بها حَتَّى الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَسَبَّ الرَّسُولِ، وَيُنْكِرُونَ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَوَازَ رُؤْيَتِهِ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيلٍ وَشُبْهَةٍ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ ، إلا الْخَطَّابِيَّةَ ... وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً كَفَرَ بِهَا

"এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে এবং আখিরাতে তাঁর দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না। কারণ তাদের এ সকল মতামতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা। এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীন মামলা-মুকাদ্দামায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে খাত্তাবিয়্যাহ[৯৬৭] ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে। আর কোনো ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজন অবজ্ঞাত বিশ্বাস অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে।"[৯৬৮]

৬. ৩. ৩. ৪. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ক্ষেত্রে 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'সুন্নাত' এবং সাহাবীগণের 'সুন্নাত' অনুসরণ করাকে নাজাত, সফলতা ও হিদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্নাত শব্দের অর্থ, ও সুন্নাত অনুসরণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। বস্তুত সুন্নাত থেকে বিচ্যুতিই সকল বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খারিজী ফিরকার ইতিহাসে আমরা তা ভালভাবে দেখতে পাই। খারিজীগণ কুরআনের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবনের সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করত এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত।[৯৬৯]

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা হাদীস অস্বীকার করত না। সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করত ও প্রশ্ন করত। কিন্তু তারা 'সুন্নাত'-এর গুরুত্ব অস্বীকার করত। অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক, বিভ্রন্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা জরুরী মনে করত না। বরং কুরআন বা হাদীস থেকে সাধারণভাবে তারা যা বুঝেছে সেটিকেই চূড়ান্ত মনে করত।[৯৭০]

বস্তুত সুন্নাত-ই মুমিনের মুক্তির পথ। যতক্ষণ মুমিন সুন্নাতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ তার কোনো ভয় থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যেভাবে যতটুকু বলেছেন মুমিন যদি তা ততটুকু সেভাবেই বলেন এবং তিনি যা বলেন নি মুমিন যদি তা বলা বর্জন করে

তবে তার কোনো ভয় থাকে না। সুন্নাতের বাইরে গেলেই বিচ্যুতির সম্ভাবনা খুলে যায়। কারণ সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে যে সংযোজন বা বিয়োজন সে করে তা সঠিক না ভুল না নিশ্চিত জানার কোনো উপায় তার নেই। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি বা বলা বর্জন করেছেন তা না বললে দীনের কোনো ক্ষতি হবে সে চিন্তা করাও ভাল নয়।

৬. ৩. ৩. ৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, 'যা করতে বলা হয় নি তা তারা করবে।' অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে যে সকল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, ওহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে সে সকল কাজকে দীনের বা আকীদার অংশ বানিয়ে নেওয়া।

যেমন, ওহীর মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অসৎকাজে লিপ্তকে হত্যা করতে, শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু খারিজীগণ ওহীর অনুসরণের নামে তা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার নামে আলী (রা)-কে সাজদা করতে, তাঁর বিশেষ গাইবী জ্ঞান আছে বলে মনে করতে, তাকে নিষ্পাপ বলে দাবি করতে বা অন্যান্য সাহাবীকে ঘৃণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু শীয়াগণ তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশধরদেরকে ভালবাসা, তাঁদের আনন্দে আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও তাদের বেদনায় ব্যথিত হওয়া ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু বেদনায় ব্যথিত হওয়ার নামে মাতম বা তাযিয়া বের করা, শোক-সমাবেশ করা, নিজেকে আঘাত করে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি ইসলামের নির্দেশ নয়। অনুরূপভাবে তাঁদের জন্মদিনে বা অন্য কোনো দিনে তাঁদের ভালবাসা বা আনন্দের নামে মিছিল, উৎসব ইত্যাদি করাও ইসলামের নির্দেশ নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন জাল দলিল তৈরি করে শীয়াগণ এরূপ করে থাকে।

সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ই এরূপ করেছে। ওহীর ব্যাখ্যার নামে তারা এমন কথা বলেছে বা এমন কাজ করেছে যা করতে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

৬. ৩. ৩. ৬. অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

উপরের বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অনুসরণ করবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। এর একটি নমুনা দেখেছি যে, মুশরিকদের 'যাতু আনওয়াত' দেখে কেউ কেউ অনুরূপ কিছু নিজেদের মধ্যেও প্রচলন করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমর দেখি যে, এ বিষয়টি ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন, সমাজের পণ্ডিতদের বক্তব্য ইত্যাদির কারণেই বিভিন্ন বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়।

৬. ৩. ৩. ৭. মুহকাম রেখে মুতাশাবিহ অনুসরণ

কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ওহীর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় বক্তব্যকে গ্রহণ করা বা আকীদার ভিত্তি বানানো। মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি দ্ব্যর্থবোধক-একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময়- । যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়গুলির অনুসরণ করে।"[৯৭১]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, খৃস্টানদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি একটি দিক ছিল। তাদের নিকট বিদ্যমান 'কিতাবে' আল্লাহর একত্ব, ঈসা (আ)-এর মানবত্ব, রাসূলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। পাশাপাশি 'আল্লাহর রূহ', 'আল্লাহর কালিমা' ইত্যাদি কিছু বিশেষণ তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থও পরিষ্কার, তবে তা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এ সকল দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলিকে তারা একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যাকে তারা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা করে বাতিল করে।

মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিরও একই অবস্থা। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ জাতীয় অনেক নমুনা দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ৩. ৩. ৮. কর্মহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সন্ধান

ওহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করা। মুমিনের দায়িত্ব ওহীর নির্দেশ মত নিজের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা কর। ওহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়, ওহী নিয়ে বিতর্ক নয়। কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে কর্মহীন বিতর্ককে ভালবাসে। আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস। কারণ ওহী মূলত গাইবী বিষয়, এ বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর বিতর্ক কোনো চূড়ান্ত সমাধান আনতে পারে না। এজন্য হাদীস শরীফে ওহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনা জ্ঞানের পথ সুগম করে। মতবিনিময়ের মাধ্যমে আলোচকদের অজ্ঞতা বা ভুল দূর হয় এবং নতুন অনেক বিষয় জানা যায়। কিন্তু বিতর্ক তা নয়। বিতর্কের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি মত গঠন করে এবং যে কোনো ভাবে তার মতটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। নিজ মতের দুর্বলতা ধরা পড়লেও তা স্বীকার করতে রযি হয় না, কারণ তা তার পরাজয় বলে গণ্য হয়। এজন্য হাদীস শরীফে কুরআন নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

"আমি একদিন দুপুরের আগে আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। তিনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও বিতর্কে রত দুব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তখন তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"[৯৭২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

إِنَّ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا ضَلَّتْ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ انْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় বসে ছিলেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেন নি? আবার কেউ বলেন: আল্লাহ কি একথা বলেন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনতে পান। তিনি বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায়, যেন তাঁর মুখমণ্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে দাঁড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমাদের কাজ এটি নয়। তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন কর। যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন কর।"[৯৭৩]

অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَدَلَ

"কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা বিতর্কের লিপ্ত হয়।"[৯৭৪]

৬. ৪. বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি

৬. ৪. ১. ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ইফতিরাকের উন্মেষ ঘটে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছেন কোনোরূপ দ্বিধা, প্রশ্ন, স্বরূপ নির্ণয় বা প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে তা সবই সর্বান্ত করণে বিশ্বাস করেছেন।

ইসলামের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এদের অনেকেই সাহাবীদের সাহচার্য লাভ করতে পারেন নি। ফলে ইসলামের মূল প্রেরণা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে। এছাড়া তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন মতামত, বিতর্ক ও তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন যুক্তি, দার্শনিক মতামত ইত্যাদি তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এগুলির ভিত্তিতেই তারা ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক ও পর্যালোচনা শুরু করেন এবং নতুন নতুন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন।

এগুলির পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদও ইফতিরাকের একটি পেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবের মানুষের বংশতান্ত্রিক কবীলা প্রথার অধীনে বসবাস কর। তিনিই প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্বের ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরে আবূ বাকর (রা)-এর খলীফা নির্বাচন, উমরের (রা) নির্বাচন, উসমানের (রা) নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর ঐক্যমতের মাধ্যমে সমাধান হয়। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখব যে, আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা 'ইফতিরাক' বা বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি।

কিন্তু সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের জন্য এ সকল মতভেদ বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল। অজ্ঞতা, অপপ্রচার,

পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এ সকল রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক বা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, নতুন প্রজন্মের মুসিলমদের মধ্যে অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, প্রচলিত দর্শন বা আচার-আচরণের প্রভাব, রাজনৈতিক মতভেদ, অপপ্রচার ইত্যাদি ইফতিরাক বা ফিরকা ও দলাদলির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফিরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল এরূপ বিভক্তির ও বিভ্রান্তির শুরু করে (১) খারিজীগণ এবং (২) শীয়াগণ। সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারীয়া, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

৬. ৪. ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম বিষয় 'আহলূল বাইত' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের বিষয়ে উম্মাতের দায়িত্ব ও বিশ্বাসের পরিধি নিয়ে। আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের বিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলু বাইত ও সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা দেখেছি। এ সকল নিদের্শের আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের মানুষদের সম্মান করেছেন, ভালবেসেছেন ও ভক্তি করেছেন। পাশাপাশি দীন বুঝা ও পালনের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নাতের নববীর উপর নির্ভর করেছেন। নবী-বংশের জন্য কোনো বিশেষ 'পবিত্রতা' বা অধিকার প্রদান করেন নি। নবী-বংশের মানুষেরাও কখনোই এরূপ কিছু দাবি করেন নি।

উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উসমান (রা)-এর খিলাফাতকালে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক একজন ইহূদী ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিন্দায় অগণিত কথা বলতে থাকে। এ সব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলতো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকারে-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) ৩৫ হিজরীর ঘটনা আলোচনা কালে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ইয়ামানের ইহুদী ছিল। উসমান (রা) এর সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বিভিন্ন শহরে ও জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করতে থাকে। হিজাজ, বসরা, কূফা ও সিরিয়ায় তেমন সুবিধা করতে পারে না। তখন সে মিশরে গমন করে। সে প্রচার করতে থাকে: অবাক লাগে তার কথা ভাবতে যে ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে না। .... হাজারো নবী চলে গিয়েছেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব। ... মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী এবং আলী শেষ ওসীয়ত প্রাপ্ত দায়িত্বশীল।... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না, বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে। ...[৯৭৫]

এ সকল মিথ্যাচারের ভিত্তিতে 'আহলু বাইত'-এর ভালবাসা ও অধিকারের নামে শীয়াগণের বিভক্তি প্রকাশ পায়। তারা দাবি করে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনক্ষমতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর হিসেবে আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা এবং তাঁদের ক্ষমতা ও অধিকারে বিশ্বাস, তাঁদের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা, গাইবী জ্ঞান ও অপার্থিব অধিকারে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার অংশ।

৬. ৪. ৩. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান

আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখেছি যে, কুরআনে পাপ, জুলম, কুফর ইত্যাদি শব্দ কঠিন নিন্দা ও বিভ্রান্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে কাফির বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহান্নাম বাসের কথা বলা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যেতে পারে যে, পাপ, ফিস্ক, জুলম ও কুফরের একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নাম বাস। এ থেকে কেউ দাবি করতে পারেন যে, কর্ম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাস যতই ঠিক থাক, যদি কর্মের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দেখা দেয় তবে তা ঈমানের ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, শিরক ছাড়া সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেন। কঠিন কবীরা গোনাহে লিপ্ত মানুষদেরকে কুরআনে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগণিত সহীহ হাদীসে পাপী মুমিনের শাস্তিভোগের পরে জান্নাতে গমনের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আতের কারণে কবীরা গোনাহকারী মুমিন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, আমল বা কর্মের সাথে ঈমান বা বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক থাকলে কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে।

সাহাবীগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের নির্দেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছেন ও বিশ্বাস করেছেন। উভয় প্রকারের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে যে কোনোরূপ বৈপরীত্য আছে সে কথা তাঁরা কখনো কল্পনা করেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা কোনো প্রশ্নও করেন নি। কারণ উভয় অর্থের মধ্যে সরাসরি কোনো সংঘর্ষ নেই এবং উভয় অর্থই মানবিক বুদ্ধি ও জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য। কাজেই এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন না করে

মুমিন নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম প্রশ্ন ছিল এটি। প্রাথমিক শীয়াগণের পরে মুসলিম উম্মাহর প্রথম ফিরকা খারিজীগণ কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায়। তাদের মতে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয়। ঈমান ও কুফরের মাঝে আর কোনো মধ্যম অবস্থা নেই। কাজেই যার ঈমানের পুর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে।[৯৭৬]

আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৭ হিজরী সাল থেকে খারিজী বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে।

এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তারা দাবি করে যে, ঈমান ও ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ঈমান বা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে তাহলে কোনো গোনাহের কারণেই কোনো অসুবিধা হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক অথবা নাই মানুক, সকল মুমিনই সরাসরি জান্নাতী হবে।

৬. ৪. ৪. রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইমামত

খারিজীদের মতামতের একটি বিশেষ দিক ছিল 'রাষ্ট্র ব্যবস্থা' ও রাষ্ট্র প্রধান। ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় 'ইমামত' বা নেতৃত্ব একসূত্রে বাঁধা। রাষ্ট্রপ্রধানই সালাতের ইমামতি করেন, ইমাম নির্ধারণ করেন এবং জিহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্র-প্রধানও হতে পারে না। এ কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাকে অপসারণ ও সে জন্য যুদ্ধ ও অস্ত্রধারণ করাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে গণ্য করে। এ দায়িত্বে অবহেলা করা বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী বলে গণ্য করে।

শীয়াগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়া সম্পন্ন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের ইমামদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকীদার অংশ মনে করে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

৬. ৪. ৫. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

ইসলামের তাকদীরে বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয়না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। কুরআন কারীমে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 'লাওহে মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। কুরআন কারীম বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মহান ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না।

আবার কুরআন থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিই যে, মানুষ তার নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী। মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না। বরং প্রত্যেককে তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

সাহাবীগণ এ সকল আয়াত ও এ বিষয়ক সকল হাদীস সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছেন। এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তাঁরা কল্পনা করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে কিছু মানুষ এ বিষয়ে বৈপরীত্য কল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে কিছু মানুষ বলতে শুরু করে যে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই। তাদের মতে তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। ক্রমান্বয়ে এ মতটি একটি 'দল' বা ফিরকায় পরিণত হয়। এদের 'কাদরীয়া' বলা হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও অনুরূপ মত গ্রহণ করে।

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কলের পুতুলের মতই সে কর্ম করে। এদের 'জাবারিয়্যাহ' বলা হয়।

৬. ৪. ৬. আল্লাহর বিশেষণ: বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা

ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণ। প্রাচীন কাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তাঁর একত্ব বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত। প্রায় সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি-অনন্ত সত্তা হিসেবে আল্লাহই একমাত্র সত্তা এবং এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ। কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, তাঁর কর্ম, তাঁর বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এ সকল মতের অনুসারীগণ স্বীকার করেছেন যে, মানুষ তার মানবীয় জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, দর্শন ও যুক্তি দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। মানুষ বুঝতে পারে যে, নিখুত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে সৃষ্ট, পরিচালিত, পরিবর্তিত ও ক্ষয়শীল এ বিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক মহাক্ষমতাশীল স্রষ্টা আছেন। মানুষ এও বুঝতে পারে যে, স্রষ্টার প্রকৃতি, স্বরূপ, কর্ম, বিশেষণ মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অগম্য, কারণ মানুষ যা কোনোভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেনি বা যার তুলনীয় কিছুই তার ইন্দ্রিয় বা কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করেনি তা সে ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান বা কল্পনায় ধারণ করতে পারে না। এরপরও মহান স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম ও বিশেষণাদি সম্পর্কে মানুষ দর্শন,

কল্পনা ও যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে চেষ্টা করেছে এবং এ বিষয়ে অনেকেই অনেক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশ করেছে। এ সকল মতামত সবই 'অন্ধের হস্তি দর্শন'-এর মতই। এগুলি অন্তহীন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারে নি। কারণ কার্ মতটি সঠিক তা ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞানের গম্য কোনো বিষয় দিয়ে কোনোভাবে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। কুরআন কারীমে আল্লাহর আসমা ও সিফাত বা নাম ও বিশেষণ সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের এ জাতীয় কিছু বিভ্রান্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

ওহীর সাথে মানবীয় 'আকল', জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির সম্পর্ক ও সমন্বয় বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আকীদার উৎস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণের কথা ওহীর মাধ্যমে জানা যায় তা মানবীয় জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, অবোধ্য নয় বা অসম্ভব নয়। যেমন মহান স্রষ্টা মানুষকে তার পাপের জন্য শাস্তি দিবেন বা ক্ষমা করবেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় বিবেক ও বুদ্ধিতে সম্ভব। তবে কোন্টি কিভাবে তিনি করবেন সে বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। একজন হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ দয়াময়, কাজেই তিনি তার প্রিয় সৃষ্টিকে শাস্তি দিতে পারে না, তিনি কাউকে কোনো শাস্তি দিবেন না। অন্য ব্যক্তি হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তিনি যদি কোনো পাপীকে শাস্তি না দেন তবে তা তাঁর ন্যায় বিচারের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না। .... মহান আল্লাহর প্রতিটি বুদ্ধিগম্য সিফাত বা কর্ম নিয়ে এরূপ বিতর্ক করা যায়। যেহেতু মহান আল্লাহর সিফাতগুলি গাইবী জগতের বিষয় সেহেতু সকল বিতর্কই অন্তহীন, চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত কোনো ফলাফলে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে সাহাবীগণের রীতি ও পদ্ধতি ছিল এ সকল বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সর্বান্তকরণে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা এবং এর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা না করা। আমরা দেখেছি যে, গাইবী বিষয়ে যুক্তি, তর্ক বা দর্শন কোনো সমাধান দিতে পারে না।

প্রথম হিজরী শতকের শেষাংশ থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মে নও-মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ক পুরাতন দার্শনিক ও ধর্মীয় বিতর্ক ও বিভ্রান্তি প্রবেশ করে। কেউ কেউ বলতে থাকে মহান আল্লাহর কোনো কর্ম বা বিশেষণ থাকতে পারে না। কারণ তাতে অমুক বা তমুক দিক থেকে তার অনাদিত্ব নষ্ট হয় বা সৃষ্টির সাথে তার তুলনা হয়ে যায়। কেউ বা অন্য দর্শন বা যুক্তি দিয়ে তাদের এমতের বিরোধিতা করেন। প্রত্যেকে তার মতের পক্ষে ও বিরোধী মতের বিপক্ষে অনেক 'যুক্তি' পেশ করতে থাকে। এভাবে মহান আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ স্বীকার, অস্বীকার, ব্যাখ্যা, সৃষ্টির কর্ম ও বিশেষণের সাথে তুলনা ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয়।

আমরা দেখেছি প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই 'কাদারিয়া' ফিরকার মানুষেরা তাকদীর অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিত্ব অস্বীকার করে। এ সময় থেকে কেউ কেউ মহান আল্লাহ কালাম বা কথা বলার বিশেষণ অস্বীকার করেন। কারণ কথা বলা সৃষ্টির কর্ম। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ বিশেষণ আরোপ করলে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। কাজেই তাঁর ক্ষেত্রে এ বিশেষণ আরোপ করা যায় না। বরং আল্লাহ কথা বলেছেন মর্মে যে সকল আয়াত কুরআনে রয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তিনি এই অর্থের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে প্রদান করেছেন, অথবা তিনি কিছু কথা সৃষ্টি করে উক্ত ব্যক্তিকে শুনিয়েছেন ... ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহ্ম ইবনু সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি ভারতীয়, গ্রীক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সকল প্রকার সিফাত বা বিশেষণ থেকে বিমুক্ত বা 'নির্গুণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মু'তাযিলীগণও মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে।

৬. ৪. ৭. বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে সকল বিভ্রান্ত ফিরকার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি বিদ্যমান:

(১) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য ওহীর অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করা। যেমন দর্শন, যুক্তি, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত, তাফসীর, ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

(২) ওহীর ব্যাখ্যা বা ওহীর অর্থ নির্ণয়ে নিজেদের মতামতকেই ওহী বলে মনে করা এবং তাকে আকীদার ভিত্তি বানানো।

(৩) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে গুরুত্ব না দেওয়া।

(৪) আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামত ও শিক্ষার গুরুত্ব না দেওয়া।

(৫) কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের বক্তব্যের মধ্যে যে সকল বিষয় পাওয়া যায় না সেগুলিকেও আকীদার বিষয়বস্তু বানানো। সাহাবীগণ যে কথা বলেন নি, বা যে আকীদা পোষণ করেন নি বা যে বিষয়ে কোনো কথাই বলেন নি সে সকল বিষয়কে আকীদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৬) মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি বা পছন্দের ভিত্তিতে ওহীর মধ্যে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করা। ওহীর যে বিষয়গুলি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক বলে মনে হয় সেগুলির উপর ভিত্তি করে ওহীর অন্যান্য শিক্ষা ব্যাখ্যা করে বাতিল করা।

(৭) নিজেদের মত সমর্থন করতে ওহীর নামে মিথ্যা কথা বানানো।

(৮) উগ্রতা, নিজের মতকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করা ও অন্য মতের প্রতি অশ্রদ্ধা।

(৯) মতবিরোধিতার কারণে অন্যদেরকে 'কাফির' বলা। সকল বিভ্রান্তফিরকার মধ্যেই মতবিরোধীয় বিষয়াদির কারণে মুসলিমকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অতি আগ্রহ ও ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। সকলেই চেষ্টা করেন কিভাবে ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে বিরোধীদেরকে কাফির বলে প্রমাণ করা যায়।

৬. ৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই নতুন

প্রজন্মের মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে। তবে এদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। বিশেষ করে সাহাবীগণের সাহচার্য লাভকারী তাবিয়ীগণ সুদৃঢ়ভাবে সাহাবীগণের পথ অনুসরণ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতকে তারা সত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য করতেন। সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেন নি তা বলা বা করা তাঁরা অন্যায় মনে করতেন। তাঁরা এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদেরকে 'আহলুল বিদ'আত' বা 'বিদ'আত পন্থী' বলে অভিহিত করতেন।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (মৃত্যু ১১০হি) বলেন:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৫-৪০ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৯৭৭]

ইবনু সিরীন প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক সাহাবীর সাহচার্য লাভ করেন। এখানে আমরা দেখছি যে, এ সময় থেকেই সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ধারা দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথম ধারা 'আহলুস সুন্নাত' ও দ্বিতীয় ধারা 'আহলুল বিদ'আত'। মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি বুঝতে হলে এ পরিভাষাগুলি আমাদের বুঝতে হবে। আমরা এখানে বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

৬. ৫. ১. আহল

আহ্‌ল (**أهــل**) অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি। এভাবে আমরা দেখছি যে আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা বিদ'আতের অনুসারী।

৬. ৫. ২. সুন্নাত

৬. ৫. ২. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক ভাবে 'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম (ﷺ) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

৬. ৫. ২. ২. ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব

ইফতিরাক বিষয়ক হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, নাজাত, মুক্তি, জান্নাত ও সত্যের মাপকাঠি ও একমাত্র পথ 'সুন্নাতের অনুসরণ'। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও হাওয়ারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) নবীর (ﷺ) সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও (২) তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা। এ হাদীসে তিনি বিভ্রান্তদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) মুখের দাবির সাথে কর্মের অমিল এবং (২) অনির্দেশিত কর্ম। অন্য হাদীসে তিনি তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের মত ও পথের উপর থাককেই নাজাতের মানদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের ঈমান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের গুরুত্ব ও অনুকরণের ব্যতিক্রমের ভয়াবহতা বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি। এ অধ্যায়ে বিদ'আত প্রসঙ্গেও আমরা ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি।

৬. ৫. ২. ৩. সুন্নাতুস সাহাবা

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করাকে জান্নাত ও সফলতার পথ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর থাকাকে হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভক্তি ও মতভেদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে আরো অনেক নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে। এক হাদীসে উতবা ইবনু গাযওয়ান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّام الصَّبْرِ، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا يَا نَبِيَّ اللَّــهِ أَوَ مِــنْهُمْ قَالَ بَلْ مِنْكُمْ

"তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি তোমাদের এ পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।"[৯৭৮]

৬. ৫. ২. ৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত

'আহলুস সুন্নাত'-এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নববীতে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সুন্নাত' বলতে কী বুঝানো হয় তা জানতে হবে। এ বিষয়ে 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকুই বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নি তা না করাই সুন্নাত।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম করার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে তিনি বলেন: "...রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো 'কর্ম' অনুসরণ পরিত্যাগ করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সিয়াম পালন করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর অনুসরণে নফল সিয়াম পালন করতেন। কেবলমাত্র পদ্ধতিগত সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো, তিনি এ দুটি নেক কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় বর্জন করতেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ তা করতেন। মূল কর্ম সুন্নাত-সম্মত নেককর্ম হওয়া সত্ত্বেও কর্মের পাশাপাপশি বর্জনের ক্ষেত্রে বা পালনে ও বর্জনে হুবহু অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্মে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিন জন সাহাবী ইবাদতের আবেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন: "তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

এ হাদীসেও এ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেন।

তাবিয়ী আবূ ওয়ায়িল বলেন, আমি পবিত্র কাবা গৃহের খিদমত ও সংরক্ষেণর দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী শাইবা ইবনু উসমান (রা)-এর নিকট বসেছিলাম। তিনি বলেন,

جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا

"তুমি যেখানে বসেছ, উমার (রা) তথায় বসে বললেন: 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কাবা ঘরের মধ্যে যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত যত স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে তা কোনো কিছুই আমি রাখব না, বরং তা সবই আমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেব।' আমি বললাম, 'আপনি তা করতে পারেন না।' তিনি বললেন: 'কেন?' আমি বললাম, 'কারণ আপনার সঙ্গীদ্বয় (রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাকর ﷺ) তা করেন নি।' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, তাঁরাই সে দুই মানুষ যাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।"[৭৭৯]

এখানে উমার (রা) অনুসরণ-অনুকরণ করা বলতে 'না-করা'-য় বা 'বর্জন করা'-য় অনুসরণ অনুকরণ করা বুঝাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গীদ্বয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্‌র ﷺ কিছুই করেন নি। কাবা ঘরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মানুষের দান, মানত ইত্যাদির স্বর্ণ-রৌপ্য সংরক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলির বিষয়ে কিছুই করেন নি। যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছেন। তিনি এগুলি বণ্টন করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। এ বিষয়ে তিনি কোনো কিছু করা থেকে বিরত থেকেছেন। আবূ বাকর ﷺ-ও একইভাবে চলে গিয়েছেন। উমার (রা)-এর অধিকার ছিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। তিনি এ বিষয়ে কিছু করার চেয়ে কোনো কিছু করা বর্জন করে তাঁদের 'অনুসরণ' বা ইত্তিবা ও ইকতিদা করা উত্তম বলে মনে করেছেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কর্ম এবং বর্জন উভয়ই সুন্নাত। কর্মের ক্ষেত্রে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করা সুন্নাত, তেমনি বর্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুকরণ করাই সুন্নাত। এমনকি যে বিষয়ে তিনি কোনে আপত্তি বা নিষেধ করেন নি, শুধু বর্জন করেছেন সে বিষয়েও অনুকরণ বলতে বর্জন করাই বুঝায়। তিনি যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা করা অবৈধ নাও হতে পারে, তবে তা করলে অনুকরণ করা হয় না।

তাবিয়ী নাফি' (রাহ) বলেন :

إِنَّ رَجُلا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ للَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ للَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا (إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا) أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

"এক ব্যক্তি ইবনু উমরের (রা) পাশে বসে হাঁচি দেয় এবং বলে: 'আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম)।' তখন ইবনু উমর (রা) বলেন, আমিও বলি: 'আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ', তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (হাঁচি দিলে) এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা হাঁচি দিলে বলব: "আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল (সকল অবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)।"[৯৮০]

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইহলৌকিত বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি ও মর্যাদার জন্য তা অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা সালাত ও সালাম পাঠ করতে ভালবাসতেন। তাঁরা একান্তে, সমাবেশে সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো সালাত ও সালাম পড়তেন। সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সাওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাহাবী ইবনু উমর কেন হাঁচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না? তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ? তাহলে কি হাঁচির পরে দরুদ বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ? তা কখনোই নয়। এখানে ইবনু উমার (রা) সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ বা কর্ম ও বর্জনে হুবহু অনুসরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আল্লাহর হামদ পাঠ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাম পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিন সর্বদা তা পালন করবেন। তবে হাঁচির দু'আ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম পাঠ শেখান নি। তিনি এ সময়ে সালাম পাঠ বর্জন করেছেন। কাজেই এ দু'আর মধ্যে তা বর্জন করাই সুন্নাত।

তাবিয়ী মুজাহিদ (রাহ) বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সঙ্গে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহর বা আসরের সালাতের জন্য ডাকাডাকি করল। তখন তিনি বললেন :

اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ

"এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ'আত।"[৯৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে সালাতের জন্য শুধু আযান প্রদান করা হতো। এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন। পরবর্তী কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা সালাতে আসতে অবহেলা করছে। তখন অনেক আগ্রহী মুয়াজ্জিন আযানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন। আযানের পরে ডাকাডাকি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন নি। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। হয়ত অনেক যুক্তি দিয়ে বলা যেত, তিনি অমুক কারণে তা বর্জন করেছেন, বর্তমানে অমুক কারণে তা করা প্রয়োজন। কিন্তু সাহাবীগণ এ সকল যুক্তির ভিতরে না যেয়ে কর্ম ও বর্জনে তাঁর হুবহু অনুকরণ পছন্দ করতেন এবং অতিরিক্ত কর্মকে বিদ'আত বলে ঘৃণা করতেন। সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাসূলে আকরাম ﷺ -এর রীতি। তাঁর বাইরে তাঁরা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الأُمُوْرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْبِدَعَ، وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الاعْتِكَافَ فِيْ الْمَسَاجِدِ الَّتِيْ فِيْ الدُّوْرِ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত। আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে সালাতের স্থান বা ঘরোয়া মসজিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা।"[৯৮২]

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ী বা মহল্লার ঘরোয়া মসজিদে ইতিকাফ নিষেধ করেন নি। এর স্বপক্ষে অনেক কথা বলা যায়। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। এজন্য সাহাবী তা বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন।

৬. ৫. ২. ৫. হুবহু অনুকরণ

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাও সুন্নাত। আর 'কর্ম' ও 'বর্জন' হুবহু ও অবিকল হলেই তা সুন্নাত হবে, সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করে পালন বা বর্জন করলে তা ইত্তিবায়ে সুন্নাত বলে গণ্য হবে না। এখানে আল্লামা ইবনু সীরীনেরই একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ ১৮১ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন :

دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف [فنظر إليه محمد نظرة كراهة] فاشمأز عنه محمد وقال إن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدثني من لا أتهم أن النبي ﷺ قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع

"সাল্ত ইবনু রাশিদ নামক একজন্য তাবি-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুব্বা, পশমী ইযার ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের নিকট প্রবেশ করেন। ইবনু সিরীন তাঁর পোশাক দেখে বিরক্ত হন। তিনি বিরক্তির সাথে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন: কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা বলেন যে, ঈসা (আ) পশমি পোশাক পরিধান করতেন। অথচ যাদের বর্ণনা আমি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করি সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতান, পশমি ও সুতি কাপড় পরিধান করেছেন। আর আমাদের নবীর সুন্নাত অনুকরণ করাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় ও বেশি উচিত।"[৯৮৩]

ইমাম ইবনু সিরীন দরবেশগণের 'সূফী' বা 'পশমি' পোশাক পরিধানের বিষয়ে আপত্তি করে বলছেন যে, ঈসা নবীর সুন্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। আবার তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমি পোশাক পরিধান করতেন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, এসকল দরবেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই অনুসরণ করছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কি?

আপত্তি অনুকরণের 'হুবহুত্বে'। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামাগ্রিক কর্ম ও বর্জনের সমষ্টিই তাঁর সুন্নাত। তিনি যে কাজ যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন সেই কাজ ততটুকুই করা ও বর্জন করাই সুন্নাত। কর্মে, বর্জনে বা গুরুত্বে তাঁর কাজের বিপরীত করার অর্থ তাঁর সুন্নাত বর্জন করা ও সুন্নাতের বিরোধিতা করা। ইবনু সিরীন এ কথাই বলেছেন।

তাঁর কথার অর্থ, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতি পোশাক পরিধান বর্জন করে পশমি পরিধান উত্তম। এজন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় সুতি পরিধান থেকে বিরত থাকেন এবং এ বর্জনকে তাকওয়া, দরবেশি বা বুজুর্গির পথ বলে মনে করেন। অথচ আমাদের নবীর সুন্নাত ছিল সুবিধা ও সুযোগমত সুতি বা পশমি পোশাক ব্যবহার করা। সুযোগ থাকলেও সুতি পোশাক বর্জন করে পশমি ব্যবহারের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বর্জন করা এবং তাঁর সুন্নাতকে দরবেশির জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করা। এজন্যই ইবনু সিরীন বলছেন যে, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম ও উচিত। আর তাঁর সুন্নাত সর্বদা পশমি পোশাক না পরা।

প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি.) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে বলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। তখন তাবিয়ী-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ ফকীহ আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি.), যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেন:

قَاتَلَهُ اللهُ! نَعَارٌ بِالْبِدَعِ

"আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"[৯৮৪]

সালাতের সালাম ফেরানো পরে এরূপ যিক্র, তাসবীহ ইত্যাদি সুন্নাত সম্মত ইবাদত। এ ব্যক্তি সুন্নাত সম্মত যিকরের বাক্য সুন্নাত সম্মত সময়ে পাঠ করে একটি সুন্নাত সম্মত ইবাদত পালন করেছেন। শুধু উচ্চস্বরে তা পালন করে যিকরটি পালনের পদ্ধতিতে সামান্য ব্যতিক্রম করেছে। এরূপ ব্যতিক্রমও তাঁরা গ্রহণ করতেন না। বরং একে বিদ'আত বলে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন।

৬. ৫. ৩. আল-জামা'আত

৬. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি

বিভক্তি বিষয়ক একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি হিসেবে বলেছেন: তারা জামা'আত। জামা'আত শব্দটি আরবী জাম' (**الجمع**) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, ঐক্যবদ্ধ করা (To gather, collect, unite, bring together, join) ইত্যাদি। 'জামা'আত' (**جماعـــة**) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (community, society).

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে 'জামা'আত' এবং 'ইজতিমা'-কে 'ফিরকা' ও 'ইফতিরাক'-এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরকা অর্থ দল, গ্রুপ ইত্যাদি। এ অর্থে আরবীতে হিযব, কাউম, জামইয়্যাহ (**حزب، قوم، جمعية**) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর জামা'আত অর্থ দলবিহীন সম্মিলিত জনগোষ্ঠী বা সমাজ। যে কোনো স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে 'জামা'আত' বলা হয়। জামা'আতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন। এরা মসজিদের জামা'আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থৎ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা'আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক কোনে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ইফতিরাক ও জামা'আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত মসজিদের জামা'আত ভেঙ্গে ইফতিরাক এসেছে। তিনটি ফিরকা মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো 'দল' বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে 'জামা'আত' বলতে পারেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থা এরূপই। এটি মূলত কোনো দল বা ফিরকা নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণের অনুসরণে যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোনো দল বা ফিরকা তৈরি করেন নি তারাই 'আল-জামা'আত'।

৬. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য অর্থে আল-জামা'আত

কুরআন ও হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্যের আলোকে আমরা 'জামা'আত' (**جماعــة**) শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখতে পাই: (১) ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ, অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ, (২) সাহাবীগণ ও (৩) সাহাবীগণের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ধারার আলিম ও ইমামগণ।[৯৮৫]

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে 'জামা'আত'বদ্ধ বা দলাদলিমুক্তভবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং দল, ফিরকা তৈরি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসেও অনুরূপভাবে 'জামা'আত'-বদ্ধ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে, ইমাম বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে এবং 'বাইয়াত' বলতে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ বুঝানো হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৯৮৬]

মু'আবিয়া (রা:) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগ দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনার অধীবাসীগণের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৯৮৭]

অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ

"যে ব্যক্তি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া (রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য ছাড়া) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে এবং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না।"[৯৮৮]

মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ [عَلَيْهِ] إمام [بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ] مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার কোন ইমাম নেই (কোন রাষ্ট্র প্রধান ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার সে অধীন নয়), অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তাঁর গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৯৮৯]

এভাবে হাদীস শরীফে সর্বদা জামা'আত বলতে দলাদলিবিহীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে। ফিরকা অর্থাৎ দল বা গ্রুপকে 'জামা'আত' অর্থাৎ ঐক্য বা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি তাঁকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, এই ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপতিত হয়ে যায় কিনা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়্যাত ও খারাপির মধ্যে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ এনে দিলেন। এর পরে কি আবার কোনো অকল্যাণ আসবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে কিছু জঞ্জাল-ময়লা থাকবে। আমি বললাম, সেই জঞ্জাল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও রীতি অনুসরণ করবে। তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে। আমি বললাম, এই ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে?

তিনি বলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহ্বানকারীগণ (আবির্ভুত হবে), যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ-আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এই অবস্থায় পড়ে যায় তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

"তুমি মুসলিমদের জামা'আত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোনো জামা'আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল (ফিরকা) সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।"[৯৯০]

এসকল হাদীসে সুস্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণকে বুঝানো হয়েছে। এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সেই সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সেই সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত, তার দল বা গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।[৯৯১]

৬. ৫. ৩. ৩. সাহাবীগণই মূল জামা'আত

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে কখনোই ইফতিরাক-এর পর্যায়ে যায় নি। তাঁদের ইখতিলাফ বা মতভেদ ছিল মূলত ব্যবহারিক ও ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতি বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ নিস্পত্তি হয়েছে। আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা 'ইফতিরাক' পর্যায়ে যায় নি। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত: অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও তাঁর বিরোধিতায় আয়েশা (রা), মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীর রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা আলী (রা)-এর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতেন। তবে মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশ নেন নি। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শাবী (১০৪ হি) বলেন, জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪ জন ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেন নি: আলী, আম্মার, তালহা এবং যুবাইর (ﷺ)।"[৯৯২]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, "যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।"[৯৯৩]

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যার এরূপ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা সর্বদা একে রাষ্ট্রীয় ও ইজাতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে পৃথক 'দল' বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেন নি। এ বিষয়ে আলী (রা), আম্মার (রা) প্রমুখ সাহাবীর সুস্পষ্ট মতামত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়বাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্মার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।"[৯৯৪]

এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আলী (রা) ও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[৯৯৫]

এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তি বা ইফতিরাকের পর্যায়ে যায় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাবিয়ীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর

'জামা'আত' বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' অর্থ 'সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসারীগণ'। সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতু সাহাবাহ এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'আল-জামাত'আত' বলতে মূলত সাহাবীগণের মত ও পথ বুঝানো হয় এবং পরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবিয়গণের মতামত বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৬. ৫. ৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি

৬. ৫. ৪. ১. ইফাতিরাক ও বিভক্তির বিষয়াদি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূলনীতি বুঝতে হলে আমাদেরকে আহলূল বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাকের আকীদার মুলনীতি জানা দরকার। কারণ বিদ'আতীদের বিদ'আতের বিপরীতেরই তাঁরা সুন্নাত-সম্মত আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। উপরের বক্তব্য ও পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি হয় নি বা বিভক্তি মেনে নেওয়া হয়নি এবং কিছু বিষয়ে বিভক্তি হয়েছে।

(১) আকীদার উৎস: এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তি, দর্শন, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে আকীদার উৎসর ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নিকট দর্শন, যুক্তি ইত্যাদিই আকীদার মুল ভিত্তিতে পরিণত হয়। শীয়া সম্প্রদায়ের নিকট ইমামগণ বা ইমামগণের প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যায় আকীদার মূল উৎসরূপে স্বীকৃত। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও কাশফ, ইলহাম, ইলকা বা 'সরাসরি বিশেষ জ্ঞানকে তারা আকীদার উৎসরূপে গ্রহণ করে। এ সকল ফিরকার অনুসারীদের নিকট মূলত এ সকল অতিরিক্ত বিষয়ই আকীদার মূল উৎস হিসেবে পরিণত হয়। এগুলির ভিত্তিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য গ্রহণ করে বা ব্যাখ্যা করে বর্জন করে।

(২) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ: এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মতভেদ নেই। কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে বা রুবুবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার বা অবিশ্বাস করলে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাত। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ হয় নি। কেউ আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদ অস্বীকার করলে বা এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে কাফির বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়েছে। তাকে আর বিভ্রান্ত মুসলিম ফিরকা বলে গণ্য করা হয় নি, বরং অমুসলিম কাফির ফিরকা বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৪) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। মূলত মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভক্তি ও ফিরকাবাজি এ বিষয়টি নিয়েই। আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেযামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শাস্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কাদারিয়াহ, জাবারিয়াহ, খারিজী, মু'তাযিলী, জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি সকল ফিরকার উদ্ভব। তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ বিষয় কেন্দ্রিক।

(৫) রিসালাতের বিশ্বাস। এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে। কোনো কোনো সীমালঙ্ঘনকারী শীয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের সর্বজনীনতা, তাঁর আদর্শের অলঙ্ঘনীয়তা, তাঁর খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে শীয়া মতবাদের মধ্যে রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসার দাবি যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে যাদের বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে এবং যারা আনুগত্যে-অনুকরণে অগ্রগামী তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। শীয়াগণ এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়। সাধারণভাবে ওলীগণের বিষয়ে এবং বিশেষত আলী-বংশের ইমামগণের বিষয়ে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করে তারা তাদেরকে রিসালাতের কিছু মর্যাদা দিয়েছে এবং এভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করেছে। শীয়া মতবাদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে 'ইমাম' হিসেবে অথবা ইমামগণের 'খলীফা' হিসেবে অনেক মানুষের ইসমাত বা নিষ্পাপত্ব ও অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকার কল্পনা করা হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত কুরআন ও সুন্নাতের গুরুত্ব মূলত বিনষ্ট হয়েছে। এ বিশ্বাস অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর অবস্থা মূলত তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য গ্রন্থের মত হয়ে যায়। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা কিছুই থাক না কেন তা ইমামগণ বা বা ওলীগণ কর্তৃক কাশফ, ইলহাম বা 'ইলমু লাদুন্নী'-র ভিত্তিতে দেওয়া ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে সব কিছু বাতিল বলে গণ্য হবে। মু'তাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু মুজিযা অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করেছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ ও নবীবংশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। আমরা দেখছি যে, শীয়াগণের এ বিভ্রান্তি মূলত আকীদার উৎস কেন্দ্রিক।

(৫) মালাইকা ও গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয় নি। তবে গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি দিক আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে বলে আমরা দেখেছি ও দেখব।

(৬) আখিরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফা'আত ও জান্নাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়। এগুলির মধ্যে শাফা'আত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক মতভেদ।

(৭) তাকদীরের বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত কেন্দ্রিক। মহান আল্লাহর ইলম, ন্যায়বিচার, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করেই এ বিষয়ক মতভেদ।

(৮) পাপী মুমিনের বিধান বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহর ক্ষমা, ক্ষমতা, দয়া, প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নেয়।

(৯) রাষ্ট্র ও মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ে বিভক্তি ঘটেছে। পাপী মুমিনের বিধান বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত এ বিষয়ক বিভক্তি জন্ম নেয়।

৬. ৫. ৪. ২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি

আহলুস সুন্নাতের নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের মূলনীতি, তা হলো সুন্নাত ও জামা'আত। আকীদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা, আল-জামা'আত বা সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের অনুসরণ করা ও উম্মাতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা। এ বিষয় দুটি আমরা উপরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। নিম্নের অনুচ্ছেদগুলিতে মতভেদীয় বিষয়গুলিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি।

৬. ৫. ৪. ২. ১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি

উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের উৎস। বিদ'আতী ফিরকাগুলি কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে নি। তারা কুরআন-সুন্নাহ আকীদার উৎস বলে স্বীকার করে। তবে আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মুল ভিত্তি। কেউ আকল, যুক্তি বা দর্শনের নামে এবং কেউ নবী-বংশের ইমামগণ, ওলীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগনের কাশফ, ইলকা, ইলহাম, ইলম লাদুন্নী, মতামত বা ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমত গ্রহণ করেছে বা ব্যাখ্যা করে পরিত্যাগ করেছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সকল নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাদের মতামতের উপর নির্ভর করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গুঢ়অর্থ নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যান্য ইমামের কিছু বক্তব্য প্রথম অধ্যায়ে আকীদার উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। মোল্লা আলী কারী লিখেছেন:

كان أبو حنيفة يكره الجدل على سبيل الحق، حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: كنا جلوسا عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقالوا: إن أحد هذين يقول: القرآن مخلوق، وهذا ينازعه ويقول: هو غير مخلوق. قال: لا تصلوا خلفهما. فقلت: أما الأول فنعم، فإنه لا يقول بقدم القرآن. وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ فقال: إنهما يتنازعان في الدين، والمنازعة في الدين بدعة

"আবূ হানীফা (রাহ) সত্যের পথেও বিবাদ-বিতর্ক অপছন্দ করতেন। ইমান আবূ ইউসুফ (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবূ হানীফার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ দুব্যক্তিকে নিয়ে তথায় আগমন করে বলেন: এ দুজনের একজন বলছে, কুরআন সৃষ্ট এবং অন্য ব্যক্তি তার সাথে বিতর্ক করছে ও বলছে, কুরআন সৃষ্ট নয়। তিনি বলেন: এদের উভয়ের কারো পিছনে সালাত আদায় করবেন না। আমি বললাম, প্রথম ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করব না একথা ঠিক, কারণ সে কুরআনের অনাদিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা হবে না কেন? তিনি বলেন, কারণ তারা দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক করছে আর দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক বিদ'আত।"[৯৯৬]

ইমাম তাহাবী বলেন:

ولا نخوض في الله. ولا نماري في دين الله. ولا نجادل في القرآن

"আমরা আল্লাহর বিষয়ে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইনা। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হইনা।"[৯৯৭]

ইমাম তাহাবী বলেন,

وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كله حَقٌّ.

"শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য।"[৯৯৮]

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন: "প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকার মূলনীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদ'আতের মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা 'আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল' ও 'যুক্তি' বলে কল্পনা করে

তার মানদণ্ডে বিচার করে। যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'র সাথে মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে 'মুহকাম' বা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আর কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'-র সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানকে তারা 'তাফবীয' বা অর্থ-বিচার আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া বলে আখ্যায়িত করে। অথবা তারা এরূপ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা 'ব্যাখ্যা' বলে আখ্যায়িত করে। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কঠিনভাবে তাদের এসকল কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। আহলুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনোভাবেই তারা সহীহ 'নাস্স' অর্থাৎ কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না। কুরআন বা সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় কোনো 'আকলী দলীল' বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তারা পেশ করেন না। ইমাম তাহাবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।"[৯৯৯]

আকীদার উৎস বিষয়ক মূলনীতিই আহলুস সুন্নাতের সকল আকীদার মুলনীতি ব্যাখ্যা করে।

৬. ৫. ৪. ২. ২. আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা করা পরিহার করা এবং সাথেসাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করা বর্জন করা। যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। আবার পাশাপাশি মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কথোপকথন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুজাস্‌সিমা বা মুশাব্বিহা ফিরকা আল্লাহর এ সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলী, জাহমী, কাদারী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকা মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে মহান আল্লাহর অন্যান্য সকল বিশেষণ ও কর্ম অস্বীকার করেছে। তারা বলে, মহান আল্লাহকে শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষণ বা কর্মে বিশেষিত করার অর্থই হলো তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কারণ সৃষ্টি শ্রবণ করে, কথা বলে, সমাসীন হয়, সৃষ্টির হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে....। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহ এ সকল বিশেষণের অধিকারী। বরং তিনি এ সকল বিশেষণ থেকে পবিত্র। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত এ সকল বিশেষণকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন তাঁর হস্ত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা করুণা, আরশের উপর সমাসীন হওয়ার অর্থ আধিপত্য লাভ করা। ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করা, ইত্যাদি।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে ওহীর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করেন। তাঁরা সকল সিফাত বা বিশেষণ তার প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করেন এবং বিশেষণের ধরণ ও পৃকৃতির বিষয় মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। সাথে সাথে তাঁরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, তাঁর এ সকল সিফাত বা বিশেষণ কোনোভাবেই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয়। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولم يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث له صفة ولا اسم. ... وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويري لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا .... وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالي في القرآن. فما ذكره الله تعالي في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالي بلا كيف.

"তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নয়। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্ত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফি'লী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ-সহ। তাঁর যাতী বা সত্ত্বাগত সিফাতসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফি'লী বা কর্মবাচক সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিয্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ তিনি অনাদি-অনন্তরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। ... তাঁর সকল বিশেষণই মাখলূকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের বিপরীত বা ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথার মত নয়। তিনি শুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। ... তাঁর ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তার বিশেষণ কোনোরূপ 'স্বরূপ', কিরূপ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর

সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মানুষদের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ (সিফাত), কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ (সিফাত), আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনোরূপ কিরূপ, কিভাবে বা কেমন করে প্রশ্ন করা ছাড়াই।[১০০০]

মোল্লা আলী কারী বলেন:

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: "نقر بأن الله على العرش استوى، من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا إليه لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علوا كبيراً"، انتهى. ونعم ما قال الإمـــام مالـــك رحمه الله حيث سئل عن ذلك الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب

"ইমাম আ'যম (রাহ) তাঁর 'ওসীয়াত' নামক পুস্তকে বলেছেন: "আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন, আরশের প্রতি তাঁর কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, বরং তিনি মাখলূকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন। আর যদি তার আরশের উপরে উপবেশন করার বা স্থির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।"

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন। তাঁকে আল্লাহর আরশের উপরে সমাসীন হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: "সমাসীন হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী।"[১০০১]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন,

وتعالى عن الحدود والغايات، الأركان والأعضاء الأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.. والعرش والكرسي حق. وهو مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.

"আল্লাহ্ সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য। প্রতিটি বস্তু তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর উর্ধে। সৃষ্টিজগত তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না।"[১০০২]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইফতিরাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতভেদীয় বিষয়ই মহান আল্লাহর তাওহীদুল আসমা ও সিফাত বিষয়ক। আর এ জাতীয় সকল বিষয়েই তাঁরা এ মুলনীতি অনুসরণ করেছেন।

৬. ৫. ৪. ২. ৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কোনো ব্যক্তির নিষ্পাপত্ব, অভ্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তাঁরা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য 'কারামত' বা মর্যাদা ও নিয়ামত বলে গণ্য করেন। কিন্তু এগুলিকে আকীদার উৎস হিসেবে বা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। আলিম বা বজুর্গ ব্যক্তি যতই বড় হোন, তিনি কখনোই ইসমাত বা অভ্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) বলেন:

كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মত গ্রহণ করা হয় এবং কিছু মত বাদ দেওয়া হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম এ কবরে যিনি শায়িত আছেন তিনিই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ।"[১০০৩]

এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না। কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে যাচাই করেই সকল কথা গ্রহণ করতে হবে। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাত বিচার করা যায় না, বরং কুরআন ও সুন্নাত দিয়ে প্রত্যেকের কথা যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। অমুক বলেছেন কাজেই তা দীনের প্রমাণ বা আকীদার দলীল এরূপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী ইমাম আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবনু উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" –তে লিখেছেন:

الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[১০০৪]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং নেককার মানুষদের ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নেককার মানুষদেরকে ভালবাসেন, কিন্তু কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না। তাঁরা সকল মুমিনকে আল্লাহর ওলী বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন-সুন্নাতের আনুগত্য যত বেশি সে তত বেশি কামিল ওলী বলে বিশ্বাস করেন। তবে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কাউকে সুনিশ্চিত 'ওলী' বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না। বরং তাদের বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের জান্নাতের আশা করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

وأفضل الناس بعد النبين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضي رضوان الله تعالي أجمعين، عابدين ثابتين علي الحق ومع الحق، نتولاهم جميعا ولا نذكر أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ إلا بخير.

"নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক, তাঁর পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তাঁর পরে যুন্নুরাইন উসমান ইবনু আফফান, তাঁর পরে আলী ইবনু আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁর আজীবন আল্লাহর ইবাদতের থেকেছেন এবং সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।"[১০০৫]

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

نحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكر هم إلا بخير. ... وإن العشرة الذين سماهم رسول الله ﷺ وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله ﷺ وقوله الحق ... ومَنْ أحسن القولَ في أصحاب رسول الله ﷺ، وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير الأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على السبيل.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাদের উল্লেখ করে আমারা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। ... রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। ... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পুত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নেফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের সালফে সালেহীন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবর্তীকালের আলেমগণ যারা হলেন কল্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্ম জ্ঞানে পারদর্শী চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।"[১০০৬]

চতুর্থ অধ্যায়ে কারামাতুল আউলিয়া প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, উম্মাতের ওলীগণের পরিচয়ে ইমাম তাহাবী বলেছেন: "সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত।" আমরা আরো দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও মা'রিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান, কাজেই বেলায়াতের কমবেশি তাকওয়া ও আনুগত্য অনুসরণের ভিত্তিতেই হয়, কোনো ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক, বংশ, ইত্যাদির কারণে নয়।

মুমিনদের বিষয়ে ও ওলীগণের বিষয়ে এ হলো আহলুস সুন্নাতের সাধারণ আকীদা। শীয়া বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মত তাঁরা ওলীগণের মর্যাদা বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে পুঁজি করে নির্দিষ্ট কাউকে ওলী বলে নিশ্চিত করেন না বা তাকে অভ্রান্ত বলে দাবি করে তার মতামতকে কুরআন বা হাদীসের একমাত্র ব্যাখ্যা বা আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র কুরআন বা হাদীসে যাদেরর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাঁদেরকেই জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেন। আর তাঁদের জান্নাত ও বিলায়াতের সাক্ষ্যকে তাঁরা অভ্রান্ততার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেন না। বরং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কাউকে মা'সূম বা নিষ্পাপ, নিভুল বা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন না। ইমাম তাহাবী বলেন:

ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم

"নেককার বা ইহসান অর্জনকারী মুমিনদের বিষয়ে আমরা আশা পোষণ করি যে, মহান আল্লাহ দয়া করে তাদের ক্ষমা

করবেন এবং জান্নাত প্রদান করবেন, তবে আমরা তাদের বিষয়ে নিশ্চিত নিরাপত্তা অনুভব করি না এবং তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি না। আর আমার পাপী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতি অনুভব করি। তবে তাদেরকে নিরাশ করি না।"[১০০৭]

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "বিষয়টি যেহেতু এরূপ সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া উম্মাতের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে তাকে জান্নাতী বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, বরং আমরা নেককার বা ইহসানের পর্যায়ে পৌঁছানো মুমিনদের জন্য আশাবোধ করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতিও বোধ করি।"[১০০৮]

ইমাম তাহাবী অন্যত্র বলেন:

وَلا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلا نَارًا

"আমরা মুমিনদের কাউকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ কারই না।"[১০০৯]

এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "ইমাম তাহাবী বলছেন যে, আমরা আহলূ কিবলার মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতী বলে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকেই আমরা জান্নাতী বলি, যেমন আশারায়ে মুবাশ্শারা। আমরা যদিও বলি যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিনদের যাকে চান আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এবং এরপর শাফা'আতকারীদের শাফা'আতে তাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন, তবে আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিষয়ে নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি। ওহীর জ্ঞান ছাড়া আমরা তার জান্নাতের সাক্ষ্য দেই না, জাহান্নামের সাক্ষ্যও দেই না। কারণ প্রকৃত বিষয় তো গুপ্ত রয়েছে। কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তার কি অবস্থা ছিল তা আমরা কেউ জানি না। তবে আমরা নেককার বা ইহসান অর্জনকারীদের সম্পর্কে ভাল আশা করি এবং পাপীদের বিষয়ে ভয় পোষণ করি।"[১০১০]

৬. ৫. ৪. ২. ৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাকফীর বিষয়ক মূলনীতি আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, পাপী মুসলিমের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদেরকে সুনিশ্চিত জাহান্নামী বা জান্নাতী বলেন নি। বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তি পূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে ইমামগণের বক্তব্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি।

৬. ৫. ৪. ২. ৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মুলনীতি

ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা: শীয়া ও খারিজী ফিরকার উদ্ভব ও উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। বিশেষত খারিজীগণ এ বিষয়ে দুটি আকীদার উদ্ভাবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির ইমামতের অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা। তাদের দাবি ছিল যে, পাপী ব্যক্তি কাফির, আর কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না। বরং মুমিনের জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অংশ হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে একে অপসারণ করবে।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে আলিমগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে সে নিপতিত হয়। পাপী শাসক-প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমানি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নষ্ট বা বিদ্রোহ করা যাবে না। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (وفي لفظ: خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ) شِبْرًا فَمَاتَ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্টের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের) বাইরে, দ্বিতীয় বর্ণনায়: রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[১০১১]

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের

অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১০১২]

আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হয় এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[১০১৩]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة.

"এবং সকল নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ।"[১০১৪]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ... ولا نري الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة... ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. .... والحج والجهاد ما ضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.

"আমরা কিবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত কায়েম করা ... বৈধ মনে করি। ... আমাদের ইমাম বা শাসকবর্গ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি। আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্ববান-আমানত আদায়কারী শাসকদের ভালবাসি এবং জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি। মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।"[১০১৫]

৬. ৫. ৪. ২. ৬. ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মুলনীতি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি 'ঐক্য ও সংহতি'। বিভ্রান্ত দলগুলির সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, আকীদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণের আভ্যন্তরীন মতভেদ সীমিত এবং ব্যাখ্যা বা পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলির আকীদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুবই বেশি। মানবীয় বুদ্ধি, আকল, যুক্তি ইত্যাদির মতপার্থক্যই স্বাভাবিক। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কাউকে 'মা'সূম' 'অভ্রান্ত' বা কারো মতকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করলেও এরূপ অভ্রান্তদের একজনের মতের সাথে অন্যজনের মতের মিল হয় না। আর এ সকল বিষয় যেহেতু তাদের মতে আকীদার মূল সেহেতু তারা একে অপরকে কাফির বা বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ সকল মুমিনকে যথাসম্ভব মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। এমনকি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ফিরকাগুলিকেও তাঁরা কাফির বলে গণ্য না করে বিভ্রান্ত মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলি একমাত্র নিজেদেরকে ছাড়া অন্য সকলকেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি কুরআন বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলেছে বা বিশ্বাস পোষণ করেছে তার কথার ওযর খোঁজার চেষ্টা করা। আর আহলুল বিদ'আতের মূলনীতি হলো তাদের মতের বিরোধী ব্যক্তি যা বলেছে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী না হলেও তার মধ্যে বিরোধিতা সন্ধান করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বক্তব্যকে আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা এবং এরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকে কাফির বা বিভ্রান্ত বলা।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন, তবে এ দেখার অর্থ কোনো মাখলুকের দেখার মত নয়, সৃষ্টির সাথে সকল তুলনার উর্দ্ধে এ দর্শনের প্রকৃতি মহান আল্লাহই জানেন। এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো বক্তব্যেরই সরাসরি বিপরীত নয়। তবে মুতাযিলী ও সমমনা ফিরকাগুলি আহলুস সুন্নাতের এ আকীদাকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন 'কোনো কিছুই তাঁর সাথে

তুলনীয় নয়'। আহলুস সুন্নাতের আকীদা এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ আল্লাহকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কাজেই কুরআন অস্বীকার করার কারণে 'আহলুস সুন্নাত' কাফির!!

পক্ষান্তরে মুতাযিলীদের আকীদা সুস্পষ্টভাবেই কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ মু'তাযিলীদের এ আকীদার কঠিন প্রতিবাদ করলেও এজন্য তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি; কারণ তারা সরাসরি আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করে না, বরং ব্যাখ্যা করে।

শীয়াগণ নবী-বংশের ভালবাসার নামে সাহাবীগণকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে গণ্য করে। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের অনেক আয়াত ও অগণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তা সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ তাদের এ বিশ্বাসের যথাসাধ্য ওজর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ সাহাবীগণ ও নবী-বংশকে সমানভাবে ভালবাসেন। তাদের এ আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও শীয়াগণ প্রায়শ তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন এ যুক্তিতে যে তাঁরা নবী-বংশকে ভালবাসেন না।

এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে ও তাকফীর অধ্যায়ে দেখেছি। ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

"আমরা দলাদলিমুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে বিভ্রান্তি ও শাস্তি বলে মনে করি।"[১০১৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলু কিতাব বা ইহূদী-নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে, শুধু তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে ছাড়া।[১০১৭] তাহলে আহলু কিবলার সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে? আহলু কিবলা তো অন্তত আহলু কিতাবের চেয়ে উত্তম। কাজেই তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তারা ছাড়া কারো সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করা যাবে না। এরূপ কেউ ভুল করলে বলা যাবে না যে, সে কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে বিধান প্রদান করেছেন তা সে পরিত্যাগ করেছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার পরে তার কুফরীর বিধান দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন।"[১০১৮]

৬. ৫. ৫. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ

উপরে আমরা মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা দলাদলি ও ফিরকা-বিভক্তির কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি জানতে পেরেছি। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলিম ও ইমামগণ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে এবং সঠিক আকীদা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট থাকেন। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার প্রসিদ্ধ ৪ মুজতাহিদ ইমাম বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, আকীদার মূলনীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) তাঁর ফিকহুল আকবারে যে আকীদা লিখেছেন এবং ইমাম আবূহানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ)-এর আকীদা বর্ণনা করে ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (রাহ) যা লিখেছেন তাই ৪ ইমামের আকীদা। আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু-একটি বিষয়ে খুটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া তাদের আকীদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খগড়হস্ত। বিশেষত আকীদাগত বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। তাঁদের গ্রন্থাবালিতে বিভিন্নভাবে আকীদার বিষয় আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, ৪ ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রাহ) আকীদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিক্‌হ-এর বিষয়ে নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তাঁর ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পরি। কিন্তু তিনি আকীদার বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

চতুর্থত, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও ব্যাপক খিদমাত ও প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত' পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত ও পঠিত বই। এ পুস্তকের প্রথমে তিনি বলেন:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة آبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين

"এ হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার বর্ণনা, যা মিল্লাতের ফকীহগণ: ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন সাবিত

কূফী (১৫০হি), আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আল-আনসারী (১৮২হি) ও আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি)-এর মাযহাবের ভিত্তিতে রচিত। তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন। তাঁরা দীনের উসূল বা মূলনীতির বিষয়ে যে আকীদা পোষণ করতেন এবং যে নীতিতে তাঁরা রাব্বুল আ'লামীনের আনুগত্য করে গেলেন তারই অনুসরণে রচিত।"[১০১৯]

হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) রচিত 'শরাহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ' পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।

পঞ্চমত, আকীদার বিষয়ে ৪ মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ আকীদার উৎসের বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য। আমরা দেখেছি যে, আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকীদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা আকীদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়গণের ইজমা বা জামা'আতকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শাব্দিক বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ছাড়া কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল উৎস এক এবং তা বহুমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যারা ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মতভেদ ব্যাপক এবং মতভেদের সমাধান অসম্ভব। কারণ উৎস বহুমুখি এবং সেগুলির একমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মানবীয় ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্য জনের অমিল হবেই। যুগ, দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তির কারণে এগুলি ভিন্নতা দেখ দেবেই। কাজেই আকীদার ক্ষেত্রেও বিভাজন, বিভক্তি ও দলাদলি আবশ্যম্ভাবী।

ইজতিহাদ, বুদ্ধি, আকল বা কিয়াস-এর প্রয়োজন হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কারণ যুগের পরিবর্তনে কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ অনেক নতুন বিষয় মুসলিমের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সে বিষয়ে বিধান দিতে হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয় তা নয়। কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ কোনো বিষয় মুসলিমের আকীদার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আকীদার সম্পর্ক গাইবী জগতের সাথে এবং আল্লাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদির সাথে। এসকল বিষয়ে কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না কিন্তু পরে মুমিনের আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে সংযোজিত না হলে তার আকীদার ত্রুটি হতে পারে এরূপ বাতুল চিন্তা কোনো মুসলিম করেন না। এ বিষয়ে ৫ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু আব্দল বার্র ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন:

لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة ، وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام

"সকল দেশের ফকীহগণ এবং আহলুস সুন্নাতের সকল ইমাম, যারা হাদীস ও ফিকহের ইমাম তাঁরা সকলেই একমত যে, ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস নিষিদ্ধ এবং ফিকহী আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য।"[১০২০]

এভাবে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার মুসলিম উম্মাহ বা আহলূস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত যে, বিশ্বাসের একমাত্র উৎস ওহীর জ্ঞান এবং ওহীর জ্ঞান অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্য অর্থাৎ তাঁদের ইজমা বা জামা'আতের উপর নির্ভর করতে হবে।

এজন্য ৪ ইমাম একমত যে, আকীদার উৎস মূলত দুটি: (১) কুরআন কারীম এবং (২) সহীহ হাদীস। আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ইজমা বা জামা'আত হলো তাঁদের মানদণ্ড। তাঁরা একমত যে, কুরআন-হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকীদর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না এবং সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সকল বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণ করার জন্য সমন্বয় মূলক কিছু কথা বলা যেতে পারে। এরূপ কথাও ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য এবং আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেওয়া হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপারে, এবং বিশেষত গাইবী বিষয়ে ইজতিহাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং ওহীর কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখের বক্তব্য দেখেছি।

৬. ৫. ৬. শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নসীহত

আহলুস সুন্নাত ও আহলুল বিদ'আত বিষয়ে শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী রাহ. (৪৭১-৫৬১ হি) তাঁর গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থে নিম্নরূপ নসীহত করেছেন: "সতর্ক ও জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর বাণী আর রাসুলে খোদা (সা)-এর হাদিস সমুহের সাধারণ ও বাহ্যিক অর্থ অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমল অর্থাৎ কাজ করা ও অনুগত থাকা। এ ব্যাপারে নতুন কথা প্রচার করা, মনগড়া কোন কিছু বলা, কথা কমবেশী করা ও নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ব্যাখ্যা দেয়া নিতান্তই অনুচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, শরীআতে বেদআতের প্রচলন ও পথভ্রষ্টতার কোন অবকাশ না থাকে; কারণ এ পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে। ...

সুন্নাত ও জমাত: মূলত প্রত্যেক মু'মিন লোকের উপরে সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ ওয়াজিব। সুন্নাত বলতে সেই পথ বুঝায়, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) যে পথে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। আর জামা'ত বলতে চার খলিফা (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথ;

তাদের খেলাফত কালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তবলী। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই ছিলেন সরল সঠিক পথের সন্ধানদাতা, এ কাজে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত; কারণ তাঁদের পথের সন্ধান দেয়া হয়েছিল, (আল্লাহ্ তায়া'লা দিয়েছিলেন)।

আহলে বেদাত: ভাল হয় বেদাতী লোকজনের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া; তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া; তাদের সালাম না করা। আমাদের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, বেদাতবকারীকে সালাম করলে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। কেননা রাসুল (ﷺ) এরশাদ করেন, 'তোমরা পরস্পর সালাম দেয়ার প্রথা চালু কর, যাতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় তোমাদের মধ্যে।' ....

বেদাতীদের চিহ্ন ও পরিচয়: কতিপয় চিহ্ন ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান, যা দ্বারা আহলে বিদাতী মানুষকে চেনা সহজ। বেদাতী মানুষ হাদিসকে অবজ্ঞা করে। বেদাতী জেন্দিক গোত্র আহলে হাদিস (আহলুস সুন্নাহ) অর্থাৎ হাদিস অনুসারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়। ক্বাদরিয়া ফেরকা আখ্যা দেয় মুজাব্বিরাহ। হাদিস অনুসারীদের মুশাব্বিহাহ বলে জাহমিয়্যাহ গোত্র আর রাফেজিরা বলে নাসেবাহ। এ ধরণের অবজ্ঞা-সূচক নামকরণের কারণ হল, ঐ সকল বেদাতী দল হাদীস অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে থাকে। মূলত আহলে সুন্নাত তথা হাদিস অনুগামী ব্যক্তিদের পরিচয় একটা মাত্র নামেই, তা হল, আহলে হাদিস (অর্থাৎ আহলু সুন্নাহ)। এ ছাড়া অন্য নামে তারা আখ্যায়িত নন। বস্তুত বেদাতী মানুষ নিজেদের জন্য যে উপাধী (আহলে সুন্নাত) গ্রহণ করে থাকে তা ভিত্তিহীন, কেননা তাদের জীবন এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।...

মুক্তিপ্রাপ্ত দল: উল্লেখিত তেহাত্তর শ্রেণীর কথা রাসুলে মাকবুল (ﷺ) বলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র একটা শ্রেণী নাজাত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করবে। এবং সেই দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত। এ দলকে ক্বাদরিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোক মুজাব্বিরা নামে অভিহিত করে থাকে। কারণ হিসেবে বলে, এ দল মনে করে সমগ্র সৃষ্ট জগত আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারাই উদ্ভূত। মুরজিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে শাককিয়া নাম দেয়; কারণ তারা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলে, ইনশা'ল্লাহ আমি একজন মু'মিন। রাফেজী শ্রেনী বলে, এ দল নাছাবিয়া, কেননা এ দলের নিয়ম দলের সমস্ত লোকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তারা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মনোনীত করে থাকে। .... বাতেনিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে বলে হাশাবিয়া। কারণ উক্ত দলের লোকজন রাসুলে করিম (ﷺ)-এর হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবন অনুসরন করে থাকে। এ ভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী দলকে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা যেমন খুশী তেমন নাম দিয়েছে, অথচ তাদের প্রদত্ত কোন নামই এ দলের উপযুক্ত নয়, প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এ দলের যথার্থ ও সঠিক নাম আহলে সুন্নাত এবং আসহাবে হাদিস। তারা হাদিসের অনুসারী, রাসুলের অনুসারী হিসেবেই এ নাম পাওয়ার যোগ্য।[১০২১]

৬. ৬. বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ

আমরা উপরে দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলুল বিদ'আত উল্লেখ করছেন। আর জামা'আতের বিপরীতে রয়েছে 'ইফতিরাক বা 'তাফার্‌রুক' যার অর্থ বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি। এজন্য আহলুল বিদ'আতকে আহলুল বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয়। এছাড়া সাহাবী-তাবিয়ীগণ এদেরকে আহলুল আহওয়া (**أهل الأهواء**) বা প্রবৃত্তির অনুসারীগণ বলে আখ্যায়িত করতেন। বিদ'আত (**البدعة**) ও হাওয়া (**الهوى**) শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। এখানে আমরা এ সকল ফিরকার পরিচয়, ইতিহাস ও মতাদর্শ আলোচনা করব।

৬. ৬. ১. ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা

উপরের কোনো কোনো হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই অনেক আলিম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফিরকার নাম নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আলিম ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (১৮০হি) বলেন: "মুসলিম উম্মাহর ফিরকাগুলির মূল ৪টি ফিরকা: শীয়া, হারূরীয়্যাহ (খরিজী), কাদারিয়্যাহ ও মুরজিয়্যাহ। শিয়াগণ ২২ ফিরকায় বিভক্ত হয়, খারিজীগণ ২১ ফিরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়্যাহ ফিরকা ১৬ ফিরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়াগণ ১৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়।"[১০২২]

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ হাতিম রাযী (২৭৭ হি) বলেন: "আলিমগণ বলেছেন যে, এ উম্মাতের ইফতিরাক বা বিভক্তির শুরু হয়েছি যিনদীকগণ, কাদারিয়্যাহ, মুরজিয়্যাহ, রাফিযী (শীয়া) ও হারূরিয়্যাহ (খারিজী) এ দলগুলির মাধ্যমে। এরাই হলো সকল ফিরকার মূল। এরপর প্রত্যেক ফিরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তারা একে অপরকে কাফির বলেছে এবং একে অপরকে জাহিল বলেছে। যিনদীকগণ ১১ ফিরকা, খারিজীগণ ১৮ ফিরকা, রাফিযীগণ (শীয়াগণ) ১৩ ফিরকা, কাদারিয়্যাহগণ ১৬ ফিরকা, মুরজিয়্যাহগণ ১৪ ফিরকায় বিভক্ত। মোট ৭২ ফিরকা।"[১০২৩]

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) (৫৬১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩ ফিরকা মূলত ১০ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। এ দশ দল হল আহলু সুন্নাত, খারিজী, শিয়া, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, মোশাব্বিয়া, জাহ্‌মিয়া, জাবারিয়া, নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফিরকা এ দশ ফিরকার মধ্যে শামিল।[১০২৪]

অনেক আলিম মনে করেন যে, ৭৩ ফিরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতের বিষয়ে এ

ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কাজেই কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফিরকার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন, এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করেন বলে দাবি না করেন, ইসলামের সর্বজন-পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন না অথচ তাদের নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা কুরআন-হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফিরকা বলে গণ্য করতে হবে।

আর যারা তাদের বিশ্বাস- আকীদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন, তাঁরা যা বলেছেন তা বলেন এবং তাঁরা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে গণ্য করতে হবে।

৬. ৬. ২. প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ

আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মূল প্রসিদ্ধ ফিরকা ছিল ৪টি: (১) শীয়া, (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ ও (৪) মুরজিয়্যাহ। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ফিরকা ৯টিতে পরিণত হয়: (১) খারিজী (২) মুতাযিলা (৩) মুরজিয়া (৪) শিয়া (৫) জাহ্মিয়্যাহ (৬) নাজারিয়া (৭) জাবারিয়া (৮) কালাবিয়া (৯) মুশাব্বিহা।

এদের অধিকাংশ ফিরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক নতুন ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে। এ সকল প্রাচীন ফিরকার মধ্যে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় এখনো বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফিরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকীদা বর্তমান যুগে পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে মূল ফিরকাগুলির বর্ণনা প্রদান করছি।

৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা[১০২৫]

৬. ৬. ৩. ১.উৎপত্তি ও মূলনীতি

শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এদুটি ফিরকার উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। শীয়া (**الشيعة**) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী (**شيعة علي**) বা আলীর (রা) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা) তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময় আরবে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। যদিও গ্রীসে এক সময় 'ডেমোক্রাসী' বা 'গণতন্ত্র' বলে কিছু চালু হয়েছিল তবে তা টিকে থাকে নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময়ে বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক বা রক্তসম্পর্ক ভিত্তিক। রাষ্ট্রের মালিক রাজা। তার অন্যান্য সম্পদের মতই রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে তার সন্তানগণ বা বংশের মানুষেরা। রাজ্যের সকল সম্পদ-এর মত জনগণও রাজার মালিকানাধীন। রাজা নির্বাচন বা রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে তাদের কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার নেই। রাজা তার রাজ্যের সম্পদ ও জনগণকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া অধিকাংশ ধর্মও ছিল বংশতান্ত্রিক। ইহূদী ধর্ম, পারস্যের মাজূস ধর্ম, মিসরের প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য অনেক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই রক্তসম্পর্কের বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও অলৌকিকত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এ সময়ে আরবে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি সাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে নিজের মতের বাইরে অন্যের মত গ্রহণ করতে বাধা দিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক জগগণতান্ত্রিক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ দিক ছিল: (১) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয়, বরং মালিক ও ম্যানেজারের। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি বা ম্যানেজার হিসেবে তা পরিচালনা করবেন। জনগণই তাকে মনোনিত করবেন এবং জনগণ তাকে সংশোধন বা অপসারন করবেন। (২) রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। পরামর্শের ধরন নির্ধারিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতি অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি রক্তসম্পর্ক নয়, বরং তাকওয়া। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে এভাবেই বুঝেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন, তবে বিভক্ত হন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, হয়ত আলীকেই (রা) নির্বাচন করা হবে। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষপর্যন্ত আবূ বাক্র (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং আলী (রা)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আগ্রহে উসমান (রা)-এর সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয়, বরং বংশতান্ত্রিক। ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা। তাঁদের বাদে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিম ও ওহী অমান্যকারী। সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলী-বংশের

রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রুকন হলো আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়া।

এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যেমন আলী (রা) তাঁর বংশধরদের নিষ্পাপত্ব, নির্ভুলত্ব, উলূহিয়্যাত, গাইবী জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আলী (রা)-এর পুনারাগমন, সাহাবীগণের বিচ্যুতি ইত্যাদি। ইতোপূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি।

ইমামতের এ 'আকীদা' কুরআন কারীমে কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রা)ও তা কখনো দাবি করেন নি। কোনো হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে:

প্রথমত, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিজের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করত। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অগণিত মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তারা পেশ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বিষয়ের সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যুক্তির পথ। আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আ) স্থলাভিষিক্ত রেখে গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অনেক যুক্তি পেশ করেন। এসকল উদ্ভট যুক্তির মাধ্যমে ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে তারা আকীদার অংশ বানিয়ে নেন।

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবি। শীয়াগন যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে কুরআন কারীমে কোথাও তা নেই। বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে। এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী (রা) তার বংশধরের ইমামতের বিষয়টি ছিল। তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ তা বিকৃত করেছেন। কুরআন মুখস্থ করা, খতম করা, নিয়মিত তাহাজ্জুদে ও তারাবীহের সালাতে খতম করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনিও অনুভব করেন যে, একান্তই মুর্খ না হলে কেউ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না।

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবন সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণকে কুরআন কারীমে নাজাত ও সফলতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ সকল উদ্ভট আকীদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত, সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার। যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা তাঁদের মাধ্যমে বর্নিত কোনো হাদীস সঠিক বলে স্বীকার করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের ইমামগণের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাদের সংকলিত এ সকল 'হাদীসের' সনদের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যা যাচাই তাদের মধ্যে খুবই নগণ্য।

ষষ্ঠত, 'তাকিয়্যা' বা 'আত্মরক্ষার' তত্ত্ব আবিষ্কার। শীয়াগণ যাদেরকে ঈমাম বলে দাবি করেন তারা মুসলিম সমাজের মূলধারার সাথে বাস করেছেন। আলী (রা) তিন খালীফার খিলাফত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরগণ। এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়াগণ 'তাকিয়্যা' বা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারা দাবি করেন যে, আলী (রা) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন।

সপ্তমত, ব্যক্তির নিভুলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ। শীয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে অন্য অনেক মানুষের নির্ভুলত্ব এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করে। তারা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে সবকিছু নেই। এছাড়া কুরআন-হাদীসে যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। আর এরূপ জ্ঞান রয়েছে শীয়া ইমামগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই ওহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া 'আকীদা'গুলি প্রমাণ করা শীয়াগণের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট্য।

৬. ৬. ৩. ২. দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীয়াগণ

শীয়া সম্প্রদায় অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে যান। বর্তমানে বিদ্যমান শীয়াগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল দ্বাদশ ইমামপন্থী বা ইমামী শীয়াগণ। ইরান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শীয়া এ দলের। এদের আকীদাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) ইমামতের বিশ্বাস। তাদের মতে আলী (রা) ও তাঁর বংশের বার জনের ইমামতে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে ইমামত নস্স বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, এখানে ইজতিহাদ, শূরা বা পরামর্শের কোনো সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ১২ ইমাম:

(১) আলী (২৩-৪০ হি),

(২) হাসান ইবনু আলী (৩-৫০ হি),

(৩) হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি),

(৪) যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন (৩৮-৯৫হি),

(৫) মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু যাইনুল আবিদীন (৫৭-১১৪ হি),
(৬) জা'ফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির (৮৩-১৪৮ হি)
(৭) মুসা কাযিম ইবনু জাফর সাদিক (১২৮-১৮৩ হি)
(৮) আলী রিযা ইবনু মূসা কাযিম (১৪৮-২০৩হি)
(৯) মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিযা (১৯৫-২২০ হি)
(১০) আলী হাদী ইবনু মুাহম্মাদ জাওয়াদ (২১২-২৫৪ হি)
(১১) হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী (২৩২-২৬০)
(১২) মুহাম্মাদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (২৫৬-???)

(২) ইসমাতের বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম সকল পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষিত।

(৩) ইলম-এর বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে 'ছিনায় ছিনায়' ইমাম-পরম্পরায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলম লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গাইবী জ্ঞান প্রাপ্ত।

(৪) ইমামগণের মুজিযায় বিশ্বাস। তার বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত। তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন এবং করেন। এগুলিকে তারা মুজিযা বলে।

(৫) গাইবাহ (الغيبة) বা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

(৬) রাজ'আত (الرجعة) বা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যামানায় ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, শীয়াগণের ১১শ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে নিঃসন্তান ভাবে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইনতেকালের পরে তাঁর এক দাসী দাবী করেন যে, তিনি তাঁর সন্তান ধারণ করেছেন। হাসানের ভাই জা'ফর এ নিয়ে তৎকালীন সরকারের কাছে কেস করেন এবং প্রমাণিত করেন যে, তাঁর ভাইয়ের কোন সন্তান নেই। কেসে জয়লাভ করে তিনি ভাইয়ের সম্পতির অধিকার লাভ করেন।[১০২৬]

কিন্তু শীয়াগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ দাবী করেন যে, হাসান আসকারীর একটি ছেলে ছিল যাকে তিনি গোপন রেখেছিলেন। তার নাম ছিল মুহাম্মাদ। তিনি ২৫৬ হিজরীতে, পিতার মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বয়সে তিনি তার বাড়ীর নীচের ছোট কুঠুরীতে (cellar/ basement) প্রবেশ করেন। তাঁর আম্মা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি আর বের হন নি।

কত বৎসর বয়সে এই ঘটনা ঘটে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ৯ বৎসর বয়সে ২৬৫ হিজরীতে। কেউ বলেন: ১৭ বৎসর বয়সে। কেউ বলেন ২৭৫ হিজরীতে ১৯ বৎসর বয়সে।

সর্বাবস্থায় শীয়াগণ গত প্রায় ১২০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বাস করে আসছেন যে, এই মুহাম্মাদই হলেন যামানার ইমাম। তিনিই মাহদী। তিনি গোপনে আছেন। গোপনে থেকেই জগত পরিচালনা করছেন। তিনি অচিরেই মাহদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। গত অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের অভ্যাস ছিল যে, তারা প্রতিদিন দলধরে বাগদাদের একটি কাল্পনিক ঘরের কাছে যেয়ে তাকে ডাকতেন এবং বেরিয়ে এসে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতেন।[১০২৭]

(৭) তাকিয়্যাহ (التقية)-র বিশ্বাস। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাস। তাকিয়্যাহকে তারা দীনের দশভাগের নয়ভাগ বলে মনে করেন। তাকিয়্যাহ পরিত্যাগ করা সালাত পরিত্যাগ করার মতই কঠিনতম পাপ। যে তাকিয়্যাহর নামে মিথ্যা না বলে সত্য বলে সে তাকিয়্যাহ ত্যাগ করার কারণে কঠিন পাপে পাপী বলে বিবেচিত।

(৮) কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাস। অধিকাংশ ইমামী শীয়া বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত কুরআন বিকৃত। অবিকৃত মূল কুরআন আলীর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের ইমামদের নিকট তা গোপন রয়েছে।

(৯) সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিশ্বাস। বার-ইমামপন্থী ইমামী শীয়াগণ অন্যান্য অধিকাংশ শীয়া ফিরকার ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তিন খলীফা সহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ ও জালিম ছিলেন।

(১০) বারা'আতের (البراءة) বা সম্পর্কছিন্নতা ঘোষণার বিশ্বাস। তারা সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়াকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে।

(১১) সুন্নাত ও হাদীস অস্বীকার। ইমামী শীয়াগণ সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করেন। বরং তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে গণ্য করেন (নাঊযু বিল্লাহ!)।

(১২) ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্বাস। ইমামী শিয়াগণ অন্য শীয়াদের মতই একমাত্র আলী (রা)-এর খিলাফত ও পরবর্তী যুগে শীয়াগণের রাজত্ব ছাড়া খিলাফতে রাশিদা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলমী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগূতি রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করেন।

৬. ৬. ৩. ৩. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাঈলিয়্যাহ সম্প্রদায়। আমরা দেখেছি যে, ১২ ইমাম পন্থী ইমামী শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী-বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। কিন্তু ইসমাঈলিয়্যা শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, জাফর সাদিকের পরে ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এই ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ (২৫৯-৩২২হি) নামক এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে, তিনিই ৭ম ইমাম ইসমাঈলের বংশধর ও ইমাম মাহদী। এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনূসের কাইরোয়ানে ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার সন্তানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।[১০২৮] এরাই মূলত ইসামঈলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা।

বাতিনীয়া শীয়াগণও অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত, গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশেষ বিশ্বাসের মধ্যে দুটি দিক রয়েছেঃ

(১) ইমামগণ এবং ইমামগণের মনোনীত বলে দাবিদারদের উলূহিয়্যাত-এ বিশ্বাস। তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহর দেহধারী রূপ বা আল্লাহর বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। কুরআন, হাদীস ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন। ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি বলে দাবিকারীর বক্তব্যই একামত্র দীন।

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেওয়া।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে ইসলামের নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন। আর এই গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুঝে সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের 'ইলম লাদুন্নী', 'বাতিনী ইলম' ও হাকীকতের জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ 'কারামিতা', ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীর অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় 'আল-মাওত' নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।[১০২৯]

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া ইত্যাদি দল বাতিনী শীয়াগণের উত্তরপুরুষ। এছাড়া বর্তমান সিরিয়ার শাসক নুসাইরী বা আলাবী শীয়াগণ এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দুরয্ সম্প্রদায়ও বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা। এদের

প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ পৃথক আকীদা রয়েছে। তবে বাতিনী সম্প্রদায়ের মুল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের 'উলূহিয়্যাত' ও ইসলামী আহকামের অকার্যকারতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী।

৬. ৬. ৩. ৪. যাইদিয়্যাহ (الزيدية) শীয়াগণ

শীয়াগণের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবচেয়ে নিকটবর্তী ফিরকা যাইদী শীয়াগণ (**الزيدية**)। বর্তমান ইয়ামানের সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী।

যাইদী শীয়াগণ নিজদেরকে ইমাম যাইদের (৭৯-১২২ হি) অনুসারী বলে দাবি করেন। যাইদ ছিলেন ১২ ইমামপন্থী শীয়াগণের তৃতীয় ইমাম যাইনুল আবিদীনের পুত্র ও ৪র্থ ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের ভাই। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং বিশ্বাসে ও কর্মে আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী তাকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ১২২ হিজরীতে তিনি শহীদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। তবে তার অনুসারিগণ তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ইয়ামানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যাইদী শীয়াগণের আকীদার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার ফাতিমার (রা) বংশধরদের।

(২) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য ওহীর বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন নেই। বরং ফাতিমার (রা) বংশের যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং জনগণ তাকে নির্বাচিত করে তবে তিনিই ইমাম।

(৩) ফাতিমার বংশের যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলে তা বৈধ হবে।

(৪) প্রথম দু খলীফা আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাস।

(৩) তৃতীয় খলীফা উসামন ইবনু আফ্‌ফানের (রা) খিলাফতে বিশ্বাস। তবে তাদের অনেকে তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তির কথা বলে।

(৪) সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা ও তদের গালি না দেওয়া। বিশেষত আলী (রা) যাদের হাতে বাইয়াত হয়েছেন তাদেরকে ভালবাসা।

(৫) তারা তাকিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করেন না।

(৬) তাদের মতে ইমাম গুপ্ত বা লুক্কয়িত থাকতে পারেন না।

(৭) তারা ইমামগণের ইসমাত বিশ্বাস করেন না। তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা) এ চারজনের ইসমাতে বিশ্বাস করেন।

(৮) ফিকহী বিষয়ে যাইদী ফিকহ হানাফী ফিকহের সাথে মিল রাখে।

৬. ৬. ৪. খারিজী ফিরকা[১০৩০]

৬. ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তে কালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্‌র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্‌রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ হলো অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালজ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[১০৩১]

এখানে সীমালজ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালানর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না

আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

'কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই।"[১০৩২]

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[১০৩৩]

তারা দাবি করে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মু'আবিয়া ও তাঁদের অনুগামিগণ সকলেই কাফির। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[১০৩৪]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিস্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[১০৩৫]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।[১০৩৬] এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[১০৩৭] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।[১০৩৮]

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১০৩৯]

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউরিটান' ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই

মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় এবং এইরূপ "কাফিরদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' করা এবং পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দীনের সবচেয়ে বড় ফরয।[১০৪০]

এদের বিদ্রোহের পরে আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![১০৪১]

আলীকে (রা) এভাবে হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন: "কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।"[১০৪২]

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[১০৪৩]

৬. ৬. ৪. ২. আকীদা ও মূলনীতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খারিজীগণের আকীদা বুঝতে পেরেছি। বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত। এতে কিছু দিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সকল উপদল মোটামুটিভাবে নিম্নের বিষয়গুলিতে একমত ছিল:

(১) কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির।

(২) উসমান, আলী, উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দুই সালিস আমর ইবনু আস, আবূ মূসা আশ'আরী (ﷺ) এবং তাদের দুজনের বা একজনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করে তার সকলেই কাফির।

(৩) জালিম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং জিহাদ করা ফরয, উপরন্তু জিহাদ আরকানে ইসলামের মতই ফরয আইন এবং সবচেয়ে বড় ফরয।

এছাড়া তাদের অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে।

৬. ৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ

(১) ইবাযী সম্প্রদায়

খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, মোরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবাযিয়্যাহ (**الإباضية**) নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের বিদ্যমান। এরা আব্দুল্লাহ ইবনু ইবায (**عبد الله بن إباض**) নামক এক ব্যক্তির অনুসারী। মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। মুল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তার মু'তাযিলীদের আকীদা পোষণ করে।

(২) আধুনিক খারিজীগণ

উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষত মিসরে আধুনিক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংগঠন প্রাচীন খারিজী সম্প্রদায়ের আকীদা গ্রহণ করেছে। গবেষকগণ এদেরকে নব্য-খারিজী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অনেকেই খারিজীগণের উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতি সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুসলিমীন' বা জামা'আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ।

শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭

বৎসর কারাভোগের পর **১৯৭১** সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক 'বৈপ্লবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এই বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি দল গঠন করেন। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে।

এদের কর্মকাণ্ডের ওজুহাতে মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ধার্মিক যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলি এদের কর্মকাণ্ডকে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক মানুষ ও ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। **১৯৭৮** সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বাকি অনেককে দীর্ঘ মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এরপর এ দলের ব্যাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড দাবি করে। এছাড়া তাদের চিন্তাচেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।[১০৪৪]

তাদের মূলনীতিগুলি মধ্যে ছিল:

(১) কুরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ঠ বলে দাবি করা

এদের নেতা শুকরী দাবি করেন যে, কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কুফরী; কারণ এতে মানুষের কথাকে আল্লাহর কথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এই যুক্তিতে তারা কুরআনের আয়াতগুলি নিজেদের বুঝ ও আবেগ অনুসারে ব্যাখ্যা করত। সাহাবীগণ বা অন্য কারো মতের এক্ষেত্রে কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করত না।

(২) সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা

সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করত। কারণ তারা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতি রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করে চলেছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করত না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল ও বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।[১০৪৫]

(৩) অতীত-বর্তমান সকল আলিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

শুকরী ও তার অনুসারিগণ অতীত ও বর্তমান সকল যুগের সকল আলিমের প্রতি কঠিন অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপর, আপোসকামি, 'তাগুত'-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।[১০৪৬]

(৪) অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফির বলা

খারিজীদের মতই এরা দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুসাশন লঙ্ঘন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকেই কাফির বলেন। তারা নিজেরাই ছোট ফরয ও বড় ফরয তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেক প্রকার পাপে লিপ্ত হন, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় চাকরী করা, রাষ্টের আনুগত্য করা, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, 'তাদের কথিত জিহাদ সমর্থন না করা', 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'গণতান্ত্রিক' কোনো দলকে সমর্থন করা ইত্যাদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির ঘোষণা করে তাদের হত্যা করেছে।

(৫) 'আনুগত্যের' কারণে সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফির বলা

খারিজীগণ যেমন মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার প্রদান ইত্যাদি 'মানব রচিত' আইন প্রচলনের কারণে আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী শাসকরদেরকে কাফির বলেছে, তেমনিভাবে এরা উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলির, এবং বিশেষত মিসরের শাসকদেরকে 'ইসলাম-বিরোধী' আইন প্রচলনের জন্য কাফির বলে ঘোষণা করে। তারা দাবি করে যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু 'ইসলামী' আইনে বিচার করেন না বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। আর এ সকল সরকাররে আনুগত্যের কারণে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাফির বলা।

(৬) জামা'আত ও বাই'আতের তত্ত্ব প্রদান করা

তারা দাবি করে যে, শুধুমাত্র 'জামা'আত' ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। এই

দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা'আত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এই দাবি মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা'আতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। সর্বোপরি তারা এই পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি।

(৭) বড় ফরয ও ছোট ফরযের তত্ত্ব প্রদান

খারিজীগণের মত তার পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয আইন বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা। এই ফরয পালন করতে যেয়ে যদি অন্যান্য ফরয ইবাদত বাদ দিতে হয় তবে তা দিতে হবে। যেমন এজন্য প্রয়োজনে সালাত বাদ দেওয়া যাবে বা সালাতের মধ্যকার ফরয কর্ম বাদ দেওয়া যাবে।

এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল। কোনো ফরযকে বড় বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ফরয ইবাদত বটে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরয বলা হয় নি। বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরয হওয়া তো দূরের কথা ফরয আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরয কিফায়া। কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযর ছাড়াও যারা জিহাদ না করে বসে থাকেন তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না। হাদীস শরীফে পিতামাতার খেদমতের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে।

৬. ৬. ৫. অন্যান্য ফিরকা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাচীন ফিরকাগুলির মধ্য থেকে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় বাহ্যত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে তাদের মতামতের কিছু দিক বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

৬. ৬. ৫. ১. মুরজিয়্যাহ[১০৪৭]

মুরজিয়্যাহ (**المرجئة**) আরবী 'আরজাআ' (**أرجأ**) ফিল থেকে গৃহীত 'ইসমু ফাইল'। মূল শব্দ বা ধাতুমূল রা, জীম ও হামযা: 'রাজাআ (**رجأ**)। আরজাআ (**أرجأ**) অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা (To postpone, adjourn, defer, put off) ইত্যাদি। মুরজিউন (**مرجئ**) অর্থ বিলম্বিতকারী বা স্থগিতকারী। বহুবচন বা ফিরকা অথে মুরজিয়্যাহ বলা হয়, অর্থাৎ বিলম্বিতকারীগণ বা স্থগিতকারীগণ।

আমরা দেখেছি যে, খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মের ঘাটতি মানেই ঈমানের ঘাটতি। আর ঈমানের ঘাটতি অর্থই কুফ্র। এর বিপরীতে আরেক দলের উদ্ভব হয়। তারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান বা বিশ্বাস থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে। এদের মূলনীতি হলো,

لا يَضُرُّ مع الإيمان معصيةٌ كما أنه لا يَنْفع مع الكُفر طاعةٌ

"ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না, যেমন কুফ্র থাকলে কোনো পুন্যই কাজে লাগে না।"

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। এদেরকে মুরজিয়া কেন বলা হলো সে বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইবনুল আসীর বলেন, এরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন সেহেতু তাদেরকে মুরজিয়্যাহ বলা হয়। আর আব্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, এরা যেহেতু আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।[১০৪৮]

খারিজীগণ যেরূপ কুরআন ও হাদীসে কিছু বক্তব্য নিজেদের মতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এর বিপরীতে অন্য বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করেছে, বা বাতিল করেছে, অনুরূপভাবে মুরজিয়াগণও তাদের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের ক্ষমা বিষয়ক ও তাওহীদের ফযীলত বিষয়ক বক্তব্যগুলিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকি আয়াত ও হাদীসগুলি ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করেছে। সমন্বয় বা উভয় প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সচেষ্ট হয় নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, খারিজী, মুতাযিলী এবং তাদের সংগে একমত বিভিন্ন ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকেও মুরজিয়াহ বলে আখ্যায়িত করে। কারণ এ সকল ফিরকা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে অনন্ত কাল জাহান্নামে বাস করবে। আর আহলুস সুন্নাত কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। এভাবে তাঁরা পাপী মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন।

৬. ৬. ৫. ২. কাদারিয়্যাহ[১০৪৯]

কাদারিয়্যাহ (**القدرية**) শব্দটি 'কাদার' (**القدر**) শব্দ থেকে গৃহীত। 'কাদার' অর্থ নির্ধারণ। ইসলামের পরিভাষায় 'কাদার' অর্থ আল্লাহর নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর। 'কাদারী' অর্থ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত। দল বা ফিরকা অর্থে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দল বা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ। যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করেন তাদেরকে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে এ মতের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে।

আমরা দেখেছি যে, তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর অনাদি-অনন্ত সর্বব্যাপী ইলম বা জ্ঞানে বিশ্বাস। অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, অনাদি কাল থেকে মহান আল্লাহ বিশ্বের কে, কখন, কোথায়, কিভাবে কি করবে, কি ঘটবে সবই জানেন। তাকদীরে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞানেও অবিশ্বাস করতে হয়। এজন্য কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ পূর্ব থেকে কিছু জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন।

উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাগণ কাদারিয়্যাহ ফিরকার সকল মূলনীতি গ্রহণ করে। এজন্য অনেকেই মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহ এক ফিরকা বলেই গণ্য করেছেন। পরে আমরা মু'তাযিলাদের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ৬. ৫. ৩. জাবারিয়াহ[১০৫০]

জাবার (**الجبر**) শব্দের অর্থ 'জবরদস্তি', বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি। জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই। মানুষ যা করে তা করতে সে বাধ্য। মানুষ চাবি দেওয়া কলের পুতুলের মতই। কাদারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বলে কিছুই নেই, কর্মই সব। আর জাবারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, কর্ম বলে কিছু নেই ভাগ্যই সব। আমরা দেখেছি যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ভাগ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্ম। আল্লাহ যেহেতু দুটি বিষয়ই উল্লেখ করেছেন সেহেতু দুটি বিষয়ই সত্য। এদুটির সমন্বয়ে আশা ও ভয়ের মধ্যে ঈমান। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের গুরু জাহমই জাবারিয়্যা আকীদার প্রথম প্রবক্ত বলে গণ্য।

৬. ৬. ৫. ৪. জাহমিয়্যাহ[১০৫১]

জাহমিয়্যাহ অর্থ 'জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহ্ম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮ হি.) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে একদিকে 'জাবারিয়া' মতে প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল। সে প্রচার করত যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মত চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল। সে বলত যে, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফ্র। সে আরো প্রচার করত যে, জান্নাত ও জাহান্নম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া সে আল্লাহর বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। সে বলত, যে বিশেষণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রাযি নই। কাজেই আল্লাহকে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি কিছুই বলা যাবে না। তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা... ইত্যাদি। সে আল্লাহর কালাম বা কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করত। সে দাবি করত যে, আল্লাহর কালাম আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে আল্লাহ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন। এরূপ সকল প্রকারের বিভ্রান্তি সে একত্রিত করে। সে এত বেশি সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, তেমন কোনো ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য অনেক ইমাম জাহম ও তার অনুসারীদেরকে সুস্পষ্টরূপে কাফির বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা জাহমিয়াদেরকে 'মুসলিম ফিরকা' বলে গণ্য না করে 'অমুসলিম' বলে গণ্য করেছেন।[১০৫২]

পরবর্তীকালে আল্লাহর বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে 'জাহমিয়্যা' মতবাদ বলে গণ্য করা হয়।[১০৫৩] উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী।

৬. ৬. ৫. ৫. মু'তাযিলা[১০৫৪]

মু'তাযিলা (**المعتزلة**) শব্দটি 'ই'তাযালা' (**اعتزل**) ফি'ল থেকে গৃহীত। ই'তিযাল (**الاعتزال**) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম হিজরীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয়।

এদেরকে মু'তাযিলা বলা হলো কেন সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত এই যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বাসরীর (১১০ হি) একজন ছাত্র ছিলেন ওয়াসিল ইবনু আতা (৮০-১৩১ হি)। তৎকালীন একটি বিশেষ বিতর্কিত বিষয় ছিল পাপী মুসলিমের বিষয়। আমরা দেখেছি খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করত। মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায় তাকে পরিপূর্ণ মুমিন এবং অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করত। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূল ধারার তাবিয়ীগণ এরূপ মুসলিমকে পাপী মুমিন ও আখিরাতে শাস্তিভোগের পর নাজাত লাভ করবে বলে বিশ্বাস করতেন। ওয়াসিল ইবনু আতা দাবি করেন যে,

এরূপ ব্যক্তিকে মুমিনও বলা যাবে না এবং কাফিরও বলা যাবে না। বরং সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান রত। এ অবস্থায় মৃত্যবরণ করলে সে অনন্ত জাহান্নামী হবে, কারণ সে ঈমানহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। হাসান বসরী (রাহ) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তার মাজলিসে আসতে নিষেধ করেন। ওয়াসিল হাসান বসরীর মাজলিস ত্যাগ করে বসরার মসজিদের অন্য কোণে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসতে শুরু করে। এজন্য তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে 'মু'তাযিলা' বলা হয়।

সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় হিজরী শতকে এ মতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। এ মতের অনুসারীগণ গ্রীক, মিসরীয়, পারসীয় ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখাপড়া করার ফলে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষদের আকর্ষিত করেন। কয়েকজন আব্বাসী খলীফা, বিশেষত খলীফ মামুন (খিলাফাত: ১৯৮-২১৮ হি/৮১৪-৮৩৩খৃ) ও খলীফা মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি/৮৩৩-৮৪২খৃ) তাদের যুক্তি, তর্ক, দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের মত গ্রহণ করেন এবং এ মতটিকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ করে সকল আলিমকে এমত গ্রহণে বাধ্য করতে শুর করেন। তবে মূলধারার আলিমগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রমান্বয়ে এ মতের অনুসারী কমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যা।

আহলূস সুন্নাতের সাথে মুতাযিলী সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল বিশ্বাসের বিষয়ে মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেক (sense, reason, rationality, intellect, intelligence) ও ওহী (Scripture)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান। মু'তাযিলী আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেককে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। আকল বা মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা গেলে বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে। কুরআনের বক্তব্যকে তারা 'রূপক', অস্পষ্ট ইত্যাদি যুক্তিতে বাতিল করত এবং হাদীসের বক্তব্যকে তারা 'খাবারে ওয়াহিদ' বা মুতাওয়াতির নয়, কাজেই অর্থগত বর্ণনার সম্ভাবনা আছে যুক্তিতে বাতিল করত। এ বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণে মূলধারার তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণ বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের আকীদার মূলনীতি আমরা ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা করেছি।

মু'তাযিলাগণ তাদের মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক আকীদার উদ্ভাবন করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কাদারিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহ ফিরকাদ্বয়ের মূলনীতি সমূহ সবই মু'তাযিলাগণ গ্রহণ করে। তারা নিজদেরকে আহলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ (**أهل العدل والتوحيد**) অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও একত্বের অনুসারী বলতেন। তাদের দাবি মত তাদের মূলনীতি পাঁচটি (১) আদল (**العدل**) বা ন্যায়বিচার, (২) তাওহীদ (**التوحيد**) বা একত্ব, (৩) ইনফাযুল ওঈদ (**إنفاذ الوعيد**) বা শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন, (৪) আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইনি (**المنزلة بين المنزلتين**) বা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং (৫) আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহউ আনিল মুনকার (**الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ**) বা সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ।[১০৫৫]

এগুলির ভিত্তিতে তাদের উদ্ভাবিত আকীদার মধ্যে রয়েছে:

(১) আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা। তাদের মতে, মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। এতে আল্লাহর একত্ব নষ্ট হয়। একারণে তারা নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে দাবি করত। এ ছাড়া সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে তারা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মগুলি অস্বীকার করত এবং সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত।

(২) মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে না।

(৩) আল্লাহর কথা তাঁর অনাদি বিশেষণ নয় বরং তা তাঁর সৃষ্ট বস্তু মাত্র।

(৪) তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন, মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে। তাকদীরের অস্বীকারকেই তারা 'ন্যায়বিচারের বিশ্বাস' বলে আখ্যায়িত করত।

(৫) পাপী মুসলিম কাফিরও নয় মুমিনও নয়। আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী। এ বিশ্বাসকে তারা 'শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন' বলে আখ্যায়িত করত। কারণ আল্লাহ পাপীদের শাস্তির অঙ্গিকার করেছেন। এরপর যদি তিনি ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায়বিচার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয়। আল্লাহর ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা 'শাফা'আত' বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা অস্বীকার করত।

(৬) অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরী ও ফারয আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। এমতের ভিত্তিতে তারা নিজেদের এ সকল আকীদা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালান।

মু'তাযিলাগণের মধ্যে অনেক উপদলের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব আকীদা ও মতামত রয়েছে।

৬. ৬. ৫. ৬. মুশাব্বিহা[১০৫৬]

মুশাব্বিহা (**المشَبِّهة**) শব্দটি 'তাশবীহ' (**التشبيه**) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। তাশবীহ অর্থ তুলনা করা, উপমা দেওয়া, সমান বানানো (To make equal or similar, to compare) ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে 'মুশাব্বিহা' বা তুলনাকারী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কোনো তুলনা দিও না এবং কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহকে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে, অথবা আল্লাহর সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মত তুলনীয় বলে মনে করেছে।

শেষ কথা

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদা বিষয়ক আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। আলোচ্য বিষয়গুলি পাঠককে কতটুকু বুঝাতে পেরেছি তা জানি না। নিজের দুর্বলতার কারণেই মনে হয়, মূল কথাটি হয়ত বুঝাতে পারলাম না। এজন্য পুরাতন কথাটি শেষবারের মত পাঠককে বলতে চাই। মুমিন জীবনের সকল বিষয়ের ন্যায় বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়েও সুন্নাতের হুবহু অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। মুমিন নিজের ঈমানকে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিশুদ্ধতম রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, কারণ তাঁর সফলতা ও নাজাতের এটিই একমাত্র ভিত্তি। শিরক, কুফ্র, নিফাক, বিদ্'আত ও বিভক্তির প্রতি হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক, তবে এগুলিতে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের কুফরী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুমিন বলে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাতের মধ্যকার বিভ্রান্ত দের জন্য আমাদের দায়িত্ব দ'আ ও নসীহত; হিংসা ও গালি নয়। হিংসার ওজুহাত না খুঁজে ভালবাসার ওজুহাত খুঁজুন, যার মধ্যে যতটুকু ঈমান, ইসলাম ও সুন্নাত আছে ততটুকুকেই ভালবাসার ওজুহাত বানিয়ে তাঁকে ভালবাসুন এবং তার হেদায়াতের জন্য দু'আ করুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আকীদা ও আমলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার এবং জামা'আত বা ঐক্যের পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমার মত একজন নগণ্য মানুষকে মহান আল্লাহ আকীদার বিষয়ে কিছু লেখার তাওফীক দিয়েছেন বলে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর মধ্যে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর বিষয় রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের কারণে। আর যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি আল্লাহর দরবারে সকল ভুল ও অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর মহান দরবারে দু'আ করি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন এবং পাঠক-পাঠিকাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য এবং তাঁর সাহাবী ও পরিজনদের জন্য সালাত ও সালাম। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর ইমাম, আলিম ও গ্রন্থাকারগণকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি।

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. আবু হানীফা, ইমাম, নুমান ইবনু সাবিত (১৫০ হি), আল-ফিকহুল আকবার, মুহাম্মদ খুমাইয়িসের-এর শারহ-সহ, (রিয়াদ, দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৩. আবূ হানীফা, ইমাম, নু'মান ইবনু সাবিত, আল-ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারীর শারহ-সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
৪. মা'মার ইবনু রাশিদ (১৫১ হি), আল-জামিয় (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৫. খালীল ইবনু আহমাদ ফারাহীদী (১৭০ হি), কিতাবুল আইন (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com)
৬. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (মিশর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী)
৭. ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৮. আবু দাউদ তায়ালিসী, সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
৯. আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
১০. ইবনে হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮)
১১. ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি) আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু সাদির)
১২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল মুতাম্মিম (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮)
১৩. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)
১৪. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮)
১৫. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৬. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭হি)
১৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
১৯. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২০. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২১. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)
২২. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আল-শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (মক্কা মুকাররামাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ৪র্থ মুদ্রন, ১৯৯৬)
২৩. মুবার্‌রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)।
২৪. ইবনু আবি আসিম, আবূ বাকর আমর (২৮৭ হি), কিতাবুস সুন্নাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৩)
২৫. ইবনে ওয়াদ্দাহ (মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াদ্দাহ) আল-কুরতুবী (২৮৬হি.), আল-বিদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা (বৈরুত, দারুর রায়েদ আল-আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.)
২৬. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪হি:), তা'যীমু কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি:)
২৭. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি), আস-সুন্নাহ বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি)

২৮. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
২৯. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শুআইব, আস-সুনান (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
৩০. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামেশক, দারুল মামূন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৩১. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি.) আল-মুনতাকা, বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮।
৩২. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীরঃ জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
৩৩. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখ তাবারীঃ তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৩৪. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৩৫. খাল্লাল, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি), আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
৩৬. তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
৩৭. তাহাবী, ইমাম, আবূ জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহঃ মুহাম্মাদ খুমাইয়িসের শারহ-সহ, (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি)
৩৮. আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৩৯. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি.) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫ হি.)
৪০. ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৪১. ইবনু হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭)
৪২. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫)
৪৩. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৪৪. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়্যীন (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৪৫. আজুর্রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২)
৪৬. ইবনু বাত্তাহ, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩৮৭হি), আল-ইবানাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১৯৯৪-১৯৯৭)
৪৭. আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৪৮. ইবনু মানদাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি), আত-তাওহীদ ও ইসবাতু সিফাতির রাব্ব (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়্যাহ, মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪০৯ হি)
৪৯. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লূগাহ (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)
৫০. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৫১. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
৫২. আবু নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি)
৫৩. আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৫৪. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু'আবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
৫৫. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
৫৬. বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, (কাইরো, দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হি)
৫৭. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ)
৫৮. ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩হি.) আল-ইনতিকা' ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৫৯. ইবনু আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (কাইরো, মাতবাআ ফান্নিয়্যাহ, ১৪০৩ হি)
৬০. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
৬১. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৬২. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭), আল-মুফরাদাত (বৈরুত. দারুল মারিফাহ, তা. বি.)
৬৩. দায়লামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৬৪. শাহরাস্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম (৫৪৮ হি), আল-মিলালু ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৮০)
৬৫. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)
৬৬. কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৬৭. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউযূআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৬৮. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ, তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪)
৬৯. আবূ মুহাম্মাদ ইয়ামানী (আনু ৬৯৯ হি), আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)
৭০. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
৭১. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৯)
৭২. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হি)
৭৩. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আবুদল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি)
৭৪. যাইনুদ্দীন রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাক্‌র (আনু ৬৬৬ হি), মুখতারুস সিহাহ (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com)
৭৫. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি) তাফসীরঃ আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শু'আব, ১৩৭২ হি)
৭৬. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.)
৭৭. নববী, আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com)

৭৮. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরীকী (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭৯. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮হি), মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
৮০. আলাউদ্দীন বুখারী (৭৩০হি.) কাশফুল আসরার আন উসূলিল বাযদাবী (বৈরুত, দারুল কিতাবলি আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.)
৮১. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি)
৮২. যাইলায়ী, উসমান ইবনু আলী (৭৪৩ হি) তাবয়ীনুল হাকায়িক শারহু কানযিদ দাকাইক (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.al-islam.com)
৮৩. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০),
৮৪. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, যাদুল মা'আদ (সিরিয়া ও বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮৫. ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মুআইয়িদ)
৮৬. ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন)
৮৭.ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১)
৮৮. ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৮৯. শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৫)
৯০. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১ হি), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ঢাকা, ইমদাদিয়া লাইব্রেরি)
৯১. ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৯২. ইবনে রাজাব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৩. ইবনে রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি)
৯৪. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৫. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০)
৯৬. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৯৭. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর, মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৯৮. জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৮১৬হি) আত-তা'রীফাত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
৯৯. ফাইরোযআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব (৮১৭হি.), আল-কামূসুল মুহীত (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১০০. সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি)
১০১. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি)
১০২. ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান (বৈরুত, মুআসসাসাতুল আ'লামী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৬)
১০৩. ৯০২ সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
১০৪. সাখাবী, আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি)
১০৫. সুয়ূতী, জালালূদ্দীন, আল-লাআলী আল-মাসনূআহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১০৬. সুয়ূতী আল-আমরু বিল ইত্তিবা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.)
১০৭. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১০৮. ৯১১ সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)
১০৯. আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১১০. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আশ শামী (৯৪২হি.), সীরাহ শামীয়াহঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.)
১১১. কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১১২. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শারীয়াহ আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮১)
১১৩. ইবনু নুজাইম (৯৭০হি.), আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রি.)
১১৪. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১১৫. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.) শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
১১৬. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১১৭. মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
১১৮. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১১৯. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি) শারহুল মুআত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১)
১২০. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১২১. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন তূরী (১১৩৮ হি), তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২২. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িল উলূম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯২)
১২৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (ঢাকা, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯)
১২৪. শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১২৫. যাবীদী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবিদী (১২০৫), তাজুল আরূস (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, (http://www.alwarraq.com, http://www.ahlalhdeeth.com)

১২৬. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫০ হি), নাইলুল আউতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১২৭. শাওকানী, আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুআ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু মুসতাফা নিযার আল-বায)
১২৮. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনিল হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির)
১২৯. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
১৩০. আলূসী, শিহাব উদ্দীন মাহমূদ ইবনু আব্দুল্লাহ (১২৭০ হি), রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানী (আল-মাকতাবাতুল শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.altafsir.com)
১৩১. দরবেশ হূত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (সিরিয়া, হালাব, আল-মাকতাবা আল-আদাবিয়্যাহ)
১৩২. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফূয়া ফীল আখবারিল মাউযূয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪ খ্রি.)
১৩৩. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশারাতিল কামিলা (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ৯৯৮৪ খ্রি.)
১৩৪. সিদ্দীক হাসান কান্নুজী (১৩০৭ হি), আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১৩৫. রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হক্ক (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ: দারুল ইফতা, ১৯৮৯)
১৩৬. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৩৭. আযীমআবাদী, শামসুল হক, আউনুল মা'বূদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫হি)
১৩৮. মুহিব্বুদ্দীন আল-খাতীব, আল-খুতুতুল আরীযাহ লিল উসুসিল লাতি কামা আলাইহা দীনুশ শী'আতিল ইমামিয়্যাহ (১০ মুদ্রণ, ১৪১০ হি, প্রকাশকের তথ্য বিহীন)
১৩৯. আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ (মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫)
১৪০. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০)
১৪১. আলবানী, মুখতাসারুশ শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (জর্ডান, আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় মুদ্রন, ১৪০৬)
১৪২. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
১৪৩. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১৪৪. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৪৫. আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) ৩/১৯৮।
১৪৬. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১৪৭. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১৪৮. উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (দাম্মাম, সৌদি আরব, দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭)
১৪৯. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৫০. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১৫১. ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৫২. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি)
১৫৩. ড. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩)
১৫৪. ড. মাহদী রিযকুল্লাহ আহমদ, সীরাতুন নাবাবীয়াহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্র. ১৯৯২)
১৫৫. মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫)
১৫৬. ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান আ'যামী, মু'জামু মুসতালাহাতিল হাদীস, (রিয়াদ, মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯)
১৫৭. আহমদ আল-ফওযান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরযিয়্যাহ (প্রকাশকের তথ্য বিহীন ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩)
১৫৮. আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়্যাস্সারাহ, (রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯)
১৫৯. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬০. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখিল ইসলাম (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬১. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬২. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ: আওআলুল ফিরাকি ফী তারীখিল ইসলাম (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬৩. ড. মূসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ, (লস এঞ্জেলস, ১৯৮৭)
১৬৪. ড. মুহাম্মাদ আল-খুমাইস, উসূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ (রিয়াদ, দারুস সুমাইয়ী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
১৬৫. ড. যাকারিয়া, আবু বাকর মুহাম্মাদ, আশ-শিরক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
১৬৬. মুহাম্মাদ আল-বুনদারী, আত-তাশাইউ' বাইনা মাফহূমিল আয়িম্মাহ ওয়াল মাফহূমিল ফারিসী, (জর্ডান, আম্মান, দারু আম্মার, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১৬৭. মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার আত-তোনসাবী, বুতলানু আকায়িদিশ শীয়াহ (মাক্কা মুকার্‌রামা, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, ১৪০৮)
১৬৮. মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)
১৬৯. মুতয়িব ইবনু মুকবিল আশ-শাস্সান, খাতমুন নুবুওয়াত ওয়ার রাদ্দি আলাল বাহায়িয়্যতি ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ (রিয়াদ, দারু আতলাস আল-খাদরা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬)
১৭০. মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু, (যুক্তরাজ্য, বামিংহাম, দারুল আরকাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৭১. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬)
১৭২. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২ সংস্করণ, ২০০৩)

১৭৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৬)
১৭৪. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬)
১৭৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত; রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্‌র-ওযীফা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬)
176. The Holy Bible, authorized Version/King James Version, (reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988) & Bangla Cary Version
177. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
178. Ahmed Deedat, The Choice, Volume 2 (Jeddah, Abul Qasim Publications, 1st print, 1994)
179. C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Historia Religionum: Handbook For The History Of Religions, Leiden 1969.
180. Encyclopedia of Religion and Ethics, Edition by James Hestings, New York.
181. Geoffrey Parrinder, Jesus in the Quran, (London, Sheldon Press, 1965)
182. The New Encyclopedia Britannica (knowledge in depth) 15th edition